তৃতীয় সংখ্যা
২০২৩ ঈসায়ী

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর-এর
বার্ষিক মুখপত্র

আল হিলাল

الجامعة المدنية أنغورا محمدفور

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

বিয়ানীবাজার, সিলেট

الجامعة المدنية أنغورا محمدفور

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

ডাক : আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর৩১৭০-, বিয়ানীবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ

www.jamiamadania.com jamiamadanlaangura@gmail.com 01819 653719, 01715 356209

জামিয়ার বৈশিষ্ট্য

- হিফজুল কুরআনসহ শিশুশ্রেণী থেকে তাকমীল ফিল হাদীস পর্যন্ত পাঠদান।
- সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে কম সময়ে বিশুদ্ধ হিফজ শিক্ষা।
- প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত প্রাণবন্ত কিন্ডাগার্ডেন বিভাগ।
- কিতাব বিভাগে ত্যাগী ও মেধাবী শিক্ষকদের পাঠদানে নিরলস প্রচেষ্টা।
- ক্লাসভিত্তিক আলাদা জিম্মাদারের মাধ্যমে নিয়মিত তামরীন।
- নৈতিক চরিত্রগঠনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি তাবলীগের মেহনত করার সুযোগ।
- রুটিন মাফিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
- বাংলা ও আরবি সাহিত্য চর্চার অবারিত সুযোগ।
- হস্তলিপি প্রশিক্ষণ।
- শক্তিশালী ছাত্রসংসদ।
- সমৃদ্ধ পাঠাগার।
- আরবি-বাংলা লেখালেখি, বক্তৃতা ও বিতর্কের নিয়মিত বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাপনা।
- বাংলা-আরবি নিয়মিত দেয়ালিকা প্রকাশনা।
- বার্ষিক সাময়িকী 'আল হিলাল' স্মারক ও বুলেটিন প্রকাশ।
- শিক্ষার্থীদের যুগসচেতন করতে বিভিন্ন সময় সেমিনার-সেম্পোজিয়ামের আয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ।
- ঝামেলামুক্ত পৃথক ছাত্রবাস।
- ছাত্রাবাসে সর্বক্ষণ বিশেষ নেগরানী।
- সবমিলিয়ে শিক্ষাপোযোগী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাঙ্গন।

আল হিলাল ছাত্র সংসদ

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর -এর
বার্ষিক মুখপত্র

আল হিলাল

সাইত্রিশতম সংখ্যা। ২০২৩ ঈসায়ি

সম্পাদক
জফির উদ্দীন

সহকারী সম্পাদক
ফরহাদ আহমাদ

অর্থায়নে
আশ-শিহাব পরিষদ ইউ. কে.

প্রকাশকাল
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঈসায়ী
২৪ মাঘ ১৪২৯ বাংলা
১৫ রজব ১৪৪৪ হিজরি

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
জায়েদ আল হাফিজ

অলঙ্করণ সহযোগী
মাজেদুল হক

মুদ্রণে
সুচারু মিডিয়া
বশির কমপ্লেক্স, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১৪-৭০৫৭০৯

প্রকাশনায়
আল-হিলাল ছাত্র সংসদ
জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট

জামেয়ার ব্যাংক একাউন্ট

রূপালী ব্যাংক
কুড়ার বাজার শাখা
চলতি হিসাব নং- 80

ট্রাস্ট ব্যাংক
যাকাত, ফিতরা, সদকা
হিসাব নং- 70170322001317
বিয়ানীবাজার শাখা
সিলেট, বাংলাদেশ।

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর-এর স্বনামধন্য মুহতামিম
ও নাযিমে তা'লীমাত, মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা

শায়খ জিয়া উদ্দিন দা.বা.-এর বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। জামিয়া মাদানিয়া কেবল দারস ও তাদরীস সর্বস্ব একটি প্রতিষ্ঠান নয়; বরং দ্বীনের বহুমুখী খেদমতেও যথাসাধ্য অবদান রাখার চেষ্টা করে।

দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে লেখনীর ভূমিকা অসামান্য। জামিয়া তার ছাত্রদের এবিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে সারা বছর নানা কর্মসূচী পালন করে। লেখালেখি চর্চার অংশ হিসেবে দেয়ালিকা, বুলেটিন ও স্মারকগ্রন্থ বের করে। আল হিলালের প্রকাশনা এই প্রচেষ্টারই ফসল। আমরা চাই– উলামায়ে কেরামের হাতে কলম ওঠে আসুক। ইসলাম, দেশ ও জাতির খেদমতে তাদের কলম অবদান রাখুক।

এবার আল-হিলালের সাঁইত্রিশতম সংখ্যা বের হচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দবোধ করছি। দোয়া করি- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন এটিকে আমাদের নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন!

জিয়া উদ্দিন
০১/০২/২০২৩ ঈসায়ি

জামিয়ার নির্বাহী মুহতামিম, প্রবীণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা

ফারুক আহমদ দা. বা.-এর বাণী

ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বাতিলের জবাব প্রদানে সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করা আমাদের খুবই জরুরি।

আল্লাহর শোকর! জামিয়ার শিক্ষার্থীরা আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করে আসছে। আল হিলালের মত সুদৃঢ় ছাত্র সংসদ রয়েছে তাদের। রয়েছে বিপুল পরিমাণ বইয়ের সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার। অধ্যয়নের পাশাপাশি বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি তারা চর্চা করে।

এ বছর আল হিলালের সাঁইত্রিশতম সংখ্যা বের হচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আল্লাহ এতে বরকত দান করুন। আমীন!

ফারুক আহমদ
০২/০২/২০২৩ ঈসায়ি

আল হিলাল ছাত্রসংসদের মাননীয় সভাপতি
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা

আব্দুল হাফিয শমশেরনগরি দা. বা. এর বাণী

আল হিলাল ছাত্র সংসদ'র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও আশ শিহাব পরিষদ ইউকে এর অর্থায়নে জামিয়ার বার্ষিক মুখপত্র 'আল হিলাল' অতি শিগগির আলোর মুখ দেখবে শুনে আনন্দবোধ করছি।

ভাষা মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার একটি বড় নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের মাঝে সব ধরনের ভাবের লেনদেন করে। মানুষের তাহযীব তামাদ্দুন ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সেজন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারী তার ধর্মীয় পরিভাষাগুলোকে ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলতে চায় না। কিন্তু, রহস্যজনকভাবে বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় পরিভাষাগুলোকে বাংলা ভাষার সাহিত্যাঙ্গন থেকে একেবারে মুছে ফেলা হচ্ছে। তাই উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন মনে করি।

পরিশেষে আল হিলালের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মোবারকবাদ রইলো।

আব্দুল হাফিয
০৩/০২/২০২৩ ঈসায়ি

সম্পাদকীয়

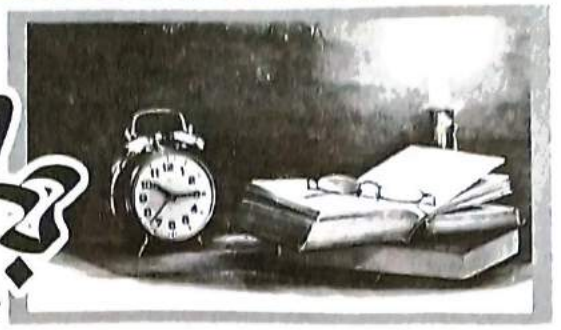

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের তরে। লাখো দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাজদারে মাদীনা, নবিয়ে দু'জাহা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র রওজায়ে আতহারে; যার আগমন বয়ে এনেছিল স্বর্গীয় শান্তির বার্তা। তাঁর সমুদয় আল ও আসহাবের ওপর– যারা ছিলেন মানবসমাজের আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম কাফেলা।

ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল দুটি। কিছু কর্মচারী তৈরি করা আর রক্ত মাংসের ভারতীয়কে তাদের মানসিক দাসে পরিণত করা। সেই কবে বৃটিশ চলে গেছে, কিন্তু আজও আমরা তাদের ওই বৃত্ত-বলয় থেকে বের হতে পারিনি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা মানুষগুলো কেবল চাকুরিই খুঁজে; উদ্দোক্তা হতে চায় না। বিলেতি কালচারেই কেবল প্রগতি খুঁজে; সভ্য হতে চায় না। এভাবেই আমরা একটি মেরুদণ্ডহীন জাতি হিসাবে বেঁচে আছি। কিন্তু এবারের ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস আমাদেরকে একেবারে হতাশ করেছে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়– কিছুই এখানে অক্ষুণ্ন থাকেনি। নতুন সিলেবাসের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ঘৃণ্য ও উদ্ভট অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। কুফরি বিবর্তনবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোমলমতি শিশুদেরকে এই বিশ্বাস গিলানোর অপচেষ্টা হয়েছে যে, তোমরা বানরের সন্তান; আদম সন্তান নও। আশ্চর্য! বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষ যেখানে মানুষ হওয়ার কথা, সেখানে হচ্ছে বানর। ডারউইনের বিতর্কিত ওই বানরতত্ত্ব শুধু মুসলমানদের বিশ্বাসবিরোধীই নয়; বরং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথেও সাংঘর্ষিক। বৈজ্ঞানিকদের যৌথ ও সমন্বিত গবেষণায় বিবর্তনবাদ-তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আমেরিকা-ইজরাইলসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ তাদের ওই ছুড়েফেলা-পরিত্যক্ত মতবাদকে বিজ্ঞানের নামে আমাদের দেশে আমদানি করা হচ্ছে। মানুষের আদি উৎস নিয়ে লেটেস্ট অসংখ্য গবেষণা বাদ দিয়ে ডারউইনের ওই বাসী মতবাদকে সিলেবাসে সংযোজনের পেছনে আসলে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? বিজ্ঞানের নামে জাতিকে প্রজ্ঞাহীন করার কোনো ষড়যন্ত্র না কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো?– বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আমাদের মা-বোন পর্দানশিন। পর্দা আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের ফরজ বিধান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে মিথ্যা ও অসাড় কল্পকাহিনীর মাধ্যমে পর্দার পবিত্র বিধানকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে কয়েকটি জায়গায় বোরকা পরাকে পশ্চাদপদতা ও প্রগতির অন্তরায় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসূলের সুন্নত দাড়ি নিয়ে রচিত রুচিহীন ব্যঙাত্মক গল্পও স্থান পেয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। সমকামিতার মত ঘৃণ্য ও বিধঘুটে অপরাধকে গল্পের মাধ্যমে প্রমোট করা হয়েছে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে মুসলিম-ঐতিহ্য। মুসলিম শাসকদের সন্ত্রাসী ও খলনায়করূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আমরা এই তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বিতর্কিত এই বিষয়গুলো কারিকুলাম থেকে সরিয়ে মার্জিত ও সৃজনশীল পাঠ্যপুস্তক কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবী জানাই।

জামিয়ার আবনা-ফুযালা-সংগঠন 'আশ-শিহাব পরিষদ ইউকে' –এর আর্থিক সহযোগিতায় এবারের সংখ্যাটিও প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

আপনাদের হাতে এটি আল হিলালের সাইত্রিশতম সংখ্যা। কাঁচাহাতের লেখাগুলোই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল হিলাল-কর্তৃপক্ষ, লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের শুকরিয়া আদায় করছি।

যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে

ভুল সংশোধন (তাহকীক)
মহিলাদের নামাজ (ফিক্বহি মাকালাহ)
দারুল ইসলাম ও দারুল হারব (তাহকীক)
শাতিমে রাসূলর বিধান (মাকালাহ)
ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়; একটি পর্যালোচনা (ফিক্বহী মাকালাহ)
প্রাচ্যবাদ: ইসলাম বিকৃতির নোংরা উপাখ্যান (তারদীদ)
বর্ষবরণ নাকি বিধর্মীদের মনস্তাত্তিক দাসত্ব (সংস্কৃতি)
বাংলা সাহিত্যে আলেম সমাজ (প্রবন্ধ)
ইলমুল হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা রাহ. (মুনাকাশা)
দাজ্জালের ফিতনা (প্রবন্ধ)
দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে নবিজি সা. (মাহাসিনে ইসলাম)
শরীয়তে হাদিসের প্রামাণিকতা (তারদীদ)
অপরাধ দমনে ইসলাম (মাহাসিনে ইসলাম)
এখতেলাফ ও খেলাফ; স্বরূপ ও সমাধান (মাকালাহ)
মওদুদিবাদ বনাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত (তারদীদ)
মুমিনের ভালোবাসা (সীরাত)
তাকলীদ শান্তি ও সমৃদ্ধির অনন্য সোপান (মুনাকাশা)
সুবাসিত ফুল বিশ্ব রাসূল (সীরাত)
তাঁর মতো বটবৃক্ষ হবো; হবো কবিতা (আকাবির)
প্রেমময় রিহলাহ্ (সীরাত)
নবিজির দাওয়াতী জীবন (সীরাত)
তাবিজ-ঝাড়ফুঁক: বৈধ না নিষিদ্ধ (তাহকীক)
খেদমতে খালক; আকাবির ও আমরা (মাহাসিনে ইসলাম)
প্রতিটি সন্তানই হোক মাতা-পিতার নিরলস খেদমতগার (মাহাসিনে ইসলাম)
জামিয়া ও অন্যান্য

(তাহকীক)

ভুল সংশোধন

মুফতী ইকবাল হুসাইন নগরি

৫ম কিস্তি

৪১. সালামকে পরিচিতদের জন্য খাস করা :
মুসলমানদের পরস্পরে সাধারণ সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম সালামকে বিধিবদ্ধ করেছে। নবি করীম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ইরশাদ করেন– أفشوا السلام بينكم তোমরা পরস্পরে সালামকে বিস্তার করো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫৩)
তদ্রূপ ইরশাদ হয়েছে–تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف সালাম দাও সবাইকে; পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত। (বুখারি, হাদীস : ১২) মোটকথা যেকারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করা সুন্নাত; সে পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত। অথচ আমাদের সমাজের কালচার এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা কেবল পরিচিতদেরকেই সালাম দিতে অভ্যস্থ। অপরিচিত কাউকে সালাম দিতে চাই না। হযরত ইবনে মাসউদ- রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- কিয়ামতের একটি আলামত হচ্ছে, ব্যক্তি কেবল তার পরিচিতকে সালাম করবে। (সহীহ ইবনে খুজাইমা)

৪২. তাকবীরে তাহরীমার সময়ে মাথা ঝোঁকানো :
কোনো কোনো মুসল্লীকে দেখা যায়, তিনি যখন আল্লাহু আকবার বলে হাত তোলেন, তখন মাথাকে একটু ঝোঁকান। এরূপ মাথা ঝোঁকানো ঠিক নয়। তদ্রূপ দেখা যায়, কেউ কেউ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে প্রথমে ছাড়েন, তারপর হাত বাঁধেন। এমন করাও অনুচিৎ। কারণ নিয়ম হল, হাত তুলে তারপর বেঁধে ফেলা; মাঝখানে আবার হাত ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখলে إرسال এর উপর আমল হয়ে যায়। আর আমাদের মাযহাবে إرسال মাসনুন নয়। প্রমাণাদি:
ولا يطأطأ رأسه عند التكبير (فتاوى النوازل : ٦٩) فإذا كبّر يأخذ يديه ولا يرسلها إرسالا (السابق : ٦٩)

৪৩. মুসহাফ বা কোনো দ্বীনি বইয়ে চুমো খাওয়া :
দেখা যায়, কেউ কেউ কুরআন তিলাওয়াত শেষে মুসহাফে চুমো খান। এভাবে চুমো খাওয়াতে কোন সওয়াব আছে মনে করা ঠিক নয়। তদ্রূপ কোনো বইয়ে পা লাগলে কিংবা নিচে পড়ে গেলে অনেকে তাতে চুমো খাওয়াকেই যথেষ্ট ভাবেন। মৌখিক ইস্তেগফার করার কথা বেমালুম এড়িয়ে যান। অথচ এক্ষেত্রে চুমো খাওয়ার পরিবর্তে মৌখিক ইস্তেগফার করাটাই উচিৎ ছিল।
عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر بن الخطّاب يقبّل الحجر الأسود " إنّي لأعلم أنّك حجر لاتضرّ ولا تنفع فلولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك (رواه البخاري :٧٩٥١ ومسلم :٧٢١)

৪৪. কুরআন ছুঁয়ে বা মসজিদে ঢুকে শপথ করা :
আমাদের সমাজে কোরআন ছুঁয়ে কিংবা মসজিদে ঢুকে শপথ করার একটা প্রচলন দেখা যায়। অথচ শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। কারণ শরীয়তে শপথ হচ্ছে আল্লাহর কোন নাম বা গুণ উল্লেখ করে নিজের কথাকে দৃঢ় করা। এর সঙ্গে কোনো পবিত্র বস্তু ছুঁয়া কিংবা পবিত্র স্থানে ঢুকার কোনো সম্পর্ক নেই।
اليمين بالله أو باسم آخر من أسماء الله كالرحمن والرحيم وجميع أسامي الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به أولم يتعارفوا هوالظاهر من مذهبنا وهو الصحيح. (الفتاوى العالمغيرية : ٢ / ٥٨)

৪৫. আত্মহত্যা করলেই কি কেউ কাফের হয়ে যায়?:
বর্তমান যুগে অনেক মুসলিমকেও আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। কিছু লোকের ধারণা যে, কোন মুসলিম আত্মহত্যা করলে সে কাফের হয়ে যায়। এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ শরীয়তে আত্মহত্যা মহাপাপ হলেও কুফরি নয়। তবে হ্যাঁ; আত্মহত্যাকারীর জানাজায় সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ

উপস্থিত না থাকার কথা বলা হয়, যাতে এই পাপকাজের প্রতি জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যদি আত্মহত্যাকারী কাফের হয়ে যেত তাহলে তার জানাজার নামায মোটেও পড়ার সুযোগ থাকতো না।

الانتحار حرام بالاتفاق، ويعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق. (الموسوعة الفقهية :٦-٢٨٣)

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس (رواه البخاري : ٦٦٧٥)

৪৬. سمع الله لمن حمده উচ্চারণে তিনটি গলতি :

নামাজে রুকু থেকে ওঠার সময় سمع الله لمن حمده বলতে বহু রকমের ভুল উচ্চারণ শুনা যায়। যেমন: কেউ উচ্চারণ করেন سمي الله لمن حمده আইনের স্থলে ইয়া দিয়ে। আর কেউ বলেন سمع الله لمن همده হা (ح) এর স্থলে হা (ه) পড়ে। আবার কেউ পড়েন سمع الله لمن حمد হা যমীরকে তার মাখরাযে নিয়ে উচ্চারণ না করে দালের ফাতহা উচ্চারণ করে ক্ষান্ত হয়ে যান। এই সব রকম উচ্চারণ ভুল। তাই সবাইকে খুব সচেতনতার সঙ্গে উচ্চরণ করা চাই– سمع الله لمن حمده

ولو قرأ : سمع الله لمن حمده بالهاء لا يبدل بحده فلم يقدره تجوز صلاته لأنه عاجز وان ترك بحده في صحيحه فسدت صلاته (فتاوى النوازل : ٩١)

৪৭. তাকবীরে ইনতেকালিয়া উচ্চারণের স্থান :

তাকবীরাতে ইনতেকালিয়া তথা রুকু-সাজদায় ওঠানামার সময় যে তাকবীর বলা হয়, তার শুরু ও শেষ ওঠানামাতেই সম্পন্ন হওয়া চাই। দেখা যায় কেউ কেউ এই তাকবীরগুলো রুকু বা সাজদায় গিয়েও উচ্চারণ করছেন, তা নিতান্তই ভুল। কারণ রুকু-সাজদারতো আলাদা তাসবীহ রয়েছে।

وإذا فرغ من القراءة ينحط للركوع ويكبّر مع الانحطاط (بدائع الصنائع: ٢ \ ٥٢) بيان ذلك أن الذكر يقارن الانتقال، فإذا قال الإمام مقارنا للانتقال: سمع الله لمن حمده يقول المقتدي مقارنا له: ربنا لك الحمد. (بدائع الصنائع : ٢ / ٥٩)

৪৮. নামাজে বসা অবস্থায় কোলের দিকে নযর রাখা আদব– এর মর্ম কী?:

আমরা জানি যে, নামাজে বসা অবস্থায় কোলের দিকে নযর রাখা আদব। কিন্তু এই কোল দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা অনেকে জানি না। বেশীর ভাগ লোক মনে করেন যে, কোল মানে উভয় রান বা তার মাঝখান। বসা অবস্থায় তারা এর উপরই নযর রাখাকে আদব মনে করে থাকেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এখানে কোল মানে নিজের পেটের সামন ভাগ যেখানে মানুষ লুঙ্গি বাঁধে। সাধারণত মায়েরা বাচ্চাদেরকে এপর্যন্তই তুলে রাখে; রানের উপর রাখেন না। এবিষয়ে আল্লামা শামি রহ. এর নিম্নোক্ত আলোচনাটি গভীর মনোযোগে পড়লে আশা করি কোন দ্বিধা থাকবে না।

وإلى حجره حال قعوده والحجر: ما بين يديك من ثوبك "قاموس" وقال أيضا: الحجر مثلثة المنع وحضن الإنسان والمناسب هنا الأول لأنه فسرالحضن بما دون الإبط إلىالكشح أوالصدر والعضدان، وفسرالكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع والجنب واستظهر في العزمية ضبطه بضمّ فتح فزاي معجمة: جمع حجزة وهي معقد الإزار ولا يخفى بعده. (ردالمحتار: ٢ / ١٥٥)

৪৯. طلب العلم فريضة على مسلم হাদীসে ومسلمة বাড়ানো:

এই হাদীসটি পাঠের সময় অনেকে ومسلمة শব্দটি বাড়িয়ে বলেন। অথচ এটি হাদীসের অংশ নয়। কারণ কোন রেওয়ায়েতে এই অংশটি আসে নি। অতএব একে রাসূলের প্রতি সম্বন্ধ করা যাবে না। তবে হ্যাঁ; হাদীসের মর্মে মুসলিম নারীগণও শামিল আছেন। কারণ শরীয়তের প্রায় বিধিবিধানে পুংলিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করলেও সবখানে নারীরাও উদ্দেশ্য হন। তাই বলে নারীগণকে এর অর্ন্তভুক্ত করার জন্যে ومسلمة বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। এবিষয়ে হাফিয সাখাবির নিম্নোক্ত ভাষ্যটি খুবই স্পষ্ট।

وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيئ من طرقه وإن كان معناها صحيحا. (المقاصد الحسنة: ٢٧٧)

৫০. আব্দুস সুবহান নাম রাখা :

কোনো কোনো ব্যক্তির নাম আব্দুসসুবহান রাখা হয়। ধারণা করা হয় যে, সুবহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তাই নামটির অর্থ হবে আল্লাহর বান্দা। মূলত সুবহান বলে আল্লার কোন গুণবাচক নাম নেই। বরং আরবি লুগাত হিসাবে এটি একটি মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে تنزيه বা পবিত্রতা বর্ণনা করা। তবে এই মাসদার থেকে سبّوح আল্লাহর একটি সিফতি নাম পাওয়া যায়। তাই আব্দুসসুবহান না রেখে عبد السبّوح রাখা যেতে পাবে।

ومن صفات الله عز وجل- : السبوح والقدّوس وقال ابن سيده: سبوح قدوس من صفة الله عزّ وجلّ لأنه يسبّح ويقدّس. (لسان العرب: ٦ / ١٤٥ دار إحياء التراث العربي)

وسبحان: أصله مصدر نحو غفران قال فسبحان الله حين تمسون وسبحانك لا علملنا والسبوح والقدوس من أسماء الله تعالى (المفردات: ٢٢١ المكتبة المرتضوية)

৫১. ওয়াজ-বক্তৃতা, ঘোষণা-প্রচারণা ইত্যাদির শুরুতে সালাম:

ওয়াজ-বক্তৃতা, খবর প্রচার কিংবা কোন প্রকার ঘোষণার শুরুতে সালাম দেওয়ার প্রচলন আমাদের মাঝে আছে। অথচ এগুলোর শুরুতে সালাম জানানো হুজুর পাক সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা কিরাম তথা সালাফে সালেহীন কারো থেকে প্রমাণিত নয়। হুজুর আকরাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা আজমাঈনের অনেক বয়ান ও খুতবা হাদীসের কিতাবে বর্ণীত হয়েছে কিন্তু কোথাও সালামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব এসব স্থানে সালাম দেওয়া মুনাসিব নয়। আর বেমওকা সালাম হলে তার জাওয়াবও দেওয়া ওয়াজিব নয়।

৫২. সমস্ত মাথা মাসেহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা:

আমরা জানি, ইমাম মালেক রাহ. এর মতে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরজ। আর আমাদের মাযহাবে তা ফরজ না হলেও সুন্নতে মুয়াক্কাদা নিশ্চয়। দেখা যায়, আমাদের অনেকে এই সুন্নত আদায়ে গাফলতি করে থাকেন। তারা সর্বদা মাথার সম্মুখ অংশ মাসেহ করাকে যথেষ্ট ভাবেন।

অথচ সর্বদা এমন করা মকরূহ। তাই এরূপ আদত না করা আমাদের কর্তব্য।

ومسح كل رأسه مرة مستوعبة فلو تركه وداوم عليه أثم (الدر المختار: ١ ٢٦٢ ، مكتبة الأزهر)

৫৩. টিকটিকি মারা মুস্তাহাব:

হাদীসে وزغ বা টিকটিকিকে মারার উৎসাহ এসেছে এবং এর উপর সওয়াবও বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে - যে টিকটিকিকে প্রথম আঘাতে মেরে ফেলল তার জন্যে একশত সওয়াব। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম। আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়েও কম। (মুসলিম:/২ ২৩৬) অথচ বেশির ভাগ মানুষ ঘরে থাকা টিকটিকিকে মারতে দ্বিধা করেন এবং মনে করেন যে, মারার হুকম করা হয়েছে মূলত গিরগিটিকে, টিকটিকিকে নয়। এমন ধারণা ভুল। কারণ আযাইবুল মাখলুকাত গ্রন্থে وزغ কে سام أبرص বলা হয়েছে। আর سام أبرص মানেই টিকটিকি। অন্যদিকে এই প্রাণীটিকে নিরীহ মনে হলেও এটি মানুষের ক্ষতি সাধন করে। তদ্রূপ টিকটিকি যে ঘরে থাকে তাতে সাপ-বিচ্ছু ঢুকার আশঙ্কাও থাকে। (আযাইবুল মাখলুকাত ফি যায়লি হায়াতিল হায়াওয়ান: ২/৪৪০) তাই অমাদেরকে এব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত জরুরি।

৫৪. জানের বদলে জান দেওয়া:

দেখা যায় আমাদের সমাজের কোন লোক বড় ধরনের অসুস্থ হলে তার জন্য জন্তু জবাই করে বাটানো হয়। এই বিশ্বাস নিয়ে যে, জানের বদলা জান দেওয়া দরকার। এমন করা মোটেও জায়েজ নয়। কারণ শরীয়তে কুরবানি ও আকীকা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে জন্তু জবাই করা প্রমাণিত নয়। তাই সুস্থতা কিংবা বড় কোন বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে শুধু সদকা করা যেতে পারে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : /৫ ৩০৭)

৫৫. মেশকে আনবর কী?:

স্বাধারণত মনে করা হয়, মেশকে আনবর এক প্রকার সুগন্ধির যৌগিক নাম। মূলত এগুলো আলাদা আলাদা দুই প্রকার সুগন্ধি। একটির নাম মেশক। আরেকটির নাম আনবর। মেশকের হকিকত হচ্ছে – বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ অঞ্চলের হরিণের নাভিতে ফোড়াঁর মত রক্ত জমাট বাঁধে এবং আল্লাহর হুকমে তাতে সুগন্ধির সৃষ্টি হয়। অবশেষে তা মুরগের ডিমের মত জঙ্গলে খসে পড়ে। (হায়াতুল হায়াওয়ান : ৪৫১ /১) আর আমবর হচ্ছে – যা সমুদ্রের গভীর তলদেশে উদ্গত হয়। একে সমুদ্রের কোনো জন্তু প্রথমে ভক্ষণ করে তারপর বিষ্টা বানিয়ে ফেলে দেয়। পরে তা বড় পাথরের আকৃতিতে পানির উপর ভাসে। এরপর বাতাস সমুদ্রের তীরে পৌঁছে দেয়। কেউ কেউ বলেন, অনেক সময় আনবর ঐ মাছের পেটে পাওয়া যায়, যে তা ভক্ষণ করে মারা যায়। একারণে যে মাছ এটি ভক্ষণ করে তাকেও আনবর বলা হয়। (হায়াতুল হায়ওয়ান : ৫০০/১, দারু ইহয়ায়িততুরাসিল আরাবি)

৫৬. হাত উত্তোলনের সময় হাত ও আঙ্গুলসমূহের পেট কিবলামুখী হওয়া:

আমরা জানি যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নত। কিন্তু হাত তোলাতে অনেকে অনেক রকম ভুল করে থাকি। কেউ তুলি কানের মুখোমুখি করে, কেউ আঙ্গুলকে বাকাঁ করি। শুদ্ধ কাইফিয়ত হচ্ছে – হাতের আঙ্গুলসমূহকে স্বাভাবিক খুলা রেখে হাতের পেটকে কিবলামুখী করে হাত তোলা। দলিল:

وأما كيفيته فلم يذكر في ظاهر الرواية وذكر الطحاوي: أنه يرفع يديه ناشرا اصابعه مستقبلا بهما القبلة فمنهم من قال: اراد بالنشر تفريج الاصابع وليس كذلك بل اراد أن يرفعهما مفتوحتين لا مضمومتين حين تكون الأصابع نحو القبلة. (بدائع الصنائع : ٢-٢٦)

৬৭. দাঁড়িয়ে জামাতের অপেক্ষা করা মাকরুহ :

যখন জামাত দাঁড়ানোর মিনিট আধ-মিনিট বাকি থাকে তখন আমাদের অনেকের আদত হচ্ছে – আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামাতের অপেক্ষা করি; বসি না। এরূপ করা মাকরুহ।

روي عن على – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد فرآى الناس قياما ينتظرون، فقال ما لي أراكم سامدين أي واقفين متحيّرين (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ١١ ٣٥٦)

লেখক : মুহাদ্দিস ও ইফতা বিভাগীয় মুশরিফ,
জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

মহিলাদের নামাজ

মাওলানা ইয়াহইয়া বিন আসআদ

ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব রাহ. বলেন- একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন-যখন সেজদা করবে, তখন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন– মহিলারা যখন নামাজের মধ্যে বসবে, তখন যেন ডান উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সেজদা করবে, তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ পাক তাকে দেখে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলেন- ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর বলেন- আমি নবিজির খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাকে অনেক কথার সাথে একথাও বললেন- হে ওয়াইল ইবনে হুজর, যখন তুমি নামাজ শুরু করবে, তখন কান বরাবর হাত উঠাবে আর মহিলারা বুক বরাবর হাত উঠাবে।

হযরত আলি রা. বলেছেন- মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন খুব জড়োসড়ো হয়ে সেজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মহিলারা কীভাবে নামাজ আদায় করবে? তিনি বললেন- খুব জড়োসড়ো হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামাজ আদায় করবে।

বিশিষ্ট তাবিয়ি, মক্কাবাসীদের ইমাম- হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহকে জিজ্ঞেস করা হলো- নামাজে মহিলা হাত কতটুকু উঠাবে? তিনি বললেন- বুক বরাবর।

মক্কাবাসীদের আরেক ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহ.- তিনি পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সেজদা করাকে অপছন্দ করতেন।

মদীনাবাসীদের ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি রাহ. বলেন- মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।

ইরাকের বসরাবাসীদের দুই ইমাম হযরত হাসান বসরি ও হযরত কাতাদা রাহ.বলেন, মহিলা যখন সেজদা করবে, তখন সে যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে।

কুফাবাসীদের ইমাম ইবরাহীম নাখায়ি বলেন- মহিলা যখন সেজদা করবে, তখন সে যেন উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট যেন উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে।

ইবরাহীম নাখায়ি আরো বলেন- মহিলাদেরকে বলা হত সেজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখতে, পুরুষের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখতে, যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে।

(১১) সিরিয়াবাসীদের ইমাম হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রাহ. বলেন- মহিলাদেরকে হুকুম করা হত যেন তারা নামাজে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে, পুরুষদের মতো যেন না বসে। অবশ্য ঢেকে রাখা জরুরি এমন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।

(১২) রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও তাবেয়িগণের ফাতাওয়া সম্বলিত ১২টি দলিল থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে,মহিলাদের নামাজের ধরন সবক্ষেত্রে পুরুষের নামাজের মতো নয়। যা স্বতঃসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত বিষয়

ওপর দিকে ফিকহে ইসলামি, যা কুরআনসুন্নাহর ব্যাখ্যা এবং ইসলামি শরীয়তের আমলি নমুনার সংরক্ষণকারী। কুরআনসুন্নাহর স্পষ্ট বা সরীহ আহকামের সংকলন ও বিন্যাস এবং মুজমাল বা অস্পষ্ট আহকামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইসলামি ফিকহ এর মূল আলোচ্য বিষয়। ফিকহে ইসলামির চারটি বিশ্লেষণ ও সংকলন উম্মতের মধ্যে সংরক্ষিত ও প্রচলিত। হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি এ চার মাযহাবের পরস্পরে বিভিন্ন মাসআলায় দলিলের আলোকে মতভিন্নতা আছে। কিন্তু 'মহিলাদের নামাজের ধরন পুরুষের নামাজের ধরন থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন- এ ব্যাপারে চারটি মাযহাব একমত।

তথ্যসূত্র- (ফাতাওয়ায়ে শামি ২৫৯/২ দারুল মারেফাহ, কিতাবুল উম:-৯০ বায়তুল আফকার আদদুয়ালিয়্যাহ, আল মুগনী- ১/৬৩৫-৬৩৬, আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ : ১৫১- আল মাকতাবাতুল আসাসিয়্যাহ- সায়দা, বৈরুত)

ইসলামি শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ এ মাসআলা আবহমান কাল থেকে চলমান। উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা হল মহিলাদের নামাজের কিছু বিষয় পুরুষের নামাজ থেকে ভিন্ন। যেমন ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে (২৫৯/২) তাকবীরে তাহরিমার সময় মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং হাত আস্তিন থেকে বের করবে না। একহাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর নিয়ে স্তনের নিচে রাখবে। রুকুতে সামান্য ঝুঁকবে। হাত দিয়ে হাঁটু আকড়ে ধরবে না। হাতের আঙ্গুলগুলো জমিয়ে রাখবে, ফাঁকা রাখবে না। হাত রাখবে হাঁটুর উপর এবং হাঁটু ঝুঁকাবে। রুকু ও সেজদায় জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। সেজদায় উভয় হাতের কনুই বিছিয়ে রাখবে। তাশাহহুদের অবস্থায় নিতম্বের উপর বসবে, যাতে হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু পর্যন্ত পৌছে। এখানেও হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে। নামাযে কোনো অসুবিধা হলে হাতের তালুর উপর অন্য হাতের তালু দ্বারা আঘাত করবে, তাসবীহ পড়বে না। পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না, শুধু মহিলাদের জামাত পড়া মাকরুহ-ইত্যাদি অনেক বিষয়; যেগুলোতে মহিলাদের নামাজ পুরুষের নামাজ থেকে ভিন্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সা. এর হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়া, মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণালব্ধ সম্মিলিত ফাতাওয়া- বিশেষত চার মাযহাবের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে মহিলাদের নামাজের ধরন পুরুষের নামাজের ধরন থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। যেমন ইমাম আব্দুল জব্বার গজনবি রাহ. বলেন- মহিলারা নামাজে জড়োসড়ো ও আঁটোসাঁটো হয়ে থাকার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, চার মাযহাবের ইমামদের ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যারা এটাকে মানতে চায় না, তারা রাসূলের হাদীস ও উম্মতের আহলে ইলমদের কর্মধারা সম্পর্কে বেখবর।

(তাজাল্লিয়াতে সফদর এর সূত্রে ফতয়ায়ে গাজনাওয়িয়্যাহ ৩৫৫/৩)

পরিতাপের বিষয় হল, উম্মতে মুসলিমার মাঝে কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এ মাসআলায় যথাযথ আমল চলে আসছে। যা দলিল প্রমাণের দিক থেকেও যথেষ্ট শক্তিশালী। আজ-কাল কিছু বন্ধুরা কোনো রকমের প্রমাণ ছাড়াই এ মাসআলা নিয়ে সমাজে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তারা বলতে চান, পুরুষ-মহিলার নামাজের ধরন এক; কোনো পার্থক্য নেই। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহ. তাদের অন্যতম। শায়খ এখানে জুমহুর উলামায়ে কেরামের পেশ করা মারাসিলে আবু দাউদের হাদীসটিকে মুরসাল হওয়ার কারণে গ্রহণ করেন নি।

(১৩) হাদীস মুরসাল হলেই যে গ্রহণযোগ্য হবে না এমনটি নয়। বিশেষত এই মুরসাল হাদীসটি নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান গ্রহণ করেছেন, দলিলযোগ্য বলেছেন এবং মহিলাদের নামাজের ধরন কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে ভিন্ন- এই ফাতাওয়া দিয়েছেন উক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে।

(১৪) শায়খ আলবানি রাহ. এর পেশ করা আরেকটি দলিল হলো- তিনি মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবরাহীম নাখায়ি রাহ. এর একটি ফাতাওয়া উল্লেখ করেছেন " মহিলা পুরুষের মতই নামাজ আদায় করবে"। অথচ উপরিউক্ত গ্রন্থের কোথাও এই কথাটি পাওয়া যায় নি। তাই শায়খের এই কথাটিও ভুল। শায়খ আলবানি রাহ. ইমাম বুখারির "তারিখে সগীর" থেকে হযরত উম্মুদদারদা এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন-

انها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل

তিনি নামাজে পুরুষদের মতো বসতেন।

(১৫) আমাদের কথা হলো, শায়খ আলবানি রাহ. খেয়াল করেন নি যে, এখানে তার পেশ করা দলিল থেকেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে- নামাজে পুরুষ- মহিলার বসার ধরন এক নয়। যদি সে যুগে অর্থাৎ ৮০ হিজরি বা তাবিয়িগণের যুগে পুরুষ-মহিলার নামাজে বসারধরন এক হত- তাহলে এখানে جلسة الرجل তথা "পুরুষের বসার মতো" কথাটির মর্ম থাকে না। এখানে বরং যে বিষয়টি স্পষ্ট,তা হলো- পুরুষরা পুরুষদের মতই বসত, নারীরা নারীদের মতই। ব্যতিক্রম করতেন উম্মুদদারদা। তিনি (হতে পারে কোনো অসুবিধার কারণে) পুরুষদের বসার ন্যায় বসতেন। আর এ কাজটি সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হওয়ায় ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেছে।

শায়খ আলবানি রাহ. ও তার অনুসারীগণ পুরুষ-মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই বলে, এ কথার পক্ষে দলিল পেশ করেন ৮০ হিজরিতে ইন্তেকাল হওয়া মহিলা তাবিয়ি হযরত উম্মুদদারদা এর আমল। তাবিয়িগণের আমলকে যদি দলিল হিসেবে মেনে থাকেন আমাদের বন্ধুরা, তাহলে আর কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। কারণ আমাদের এ লেখায় বেশ ক'জন বুজুর্গ তাবিয়ি ইমামগণের ফাতাওয়া থেকে আমরা দেখিয়েছি, মহিলাদের নামায সর্বদিক দিয়ে

পুরুষের নামাজের মতো নয়। যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

আরেকটি হাদীস পেশ করে আমাদের বন্ধুরা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকেন। তাদের কথা হল হাদীস শরীফে নামাজে কুকুরের মতো সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অতএব হানাফি মাযহাব মুতাবিক মহিলারা যেভাবে জমিনে হাত বিছিয়ে সেজদা করে, সেটা ভুল পদ্ধতি।

যত অভিমান বন্ধুদের হানাফি মাযহাবের প্রতি। নতুবা সংক্ষেপে হলেও আমরা উল্লেখ করেছি- মহিলাদের নামাজের পদ্ধতিগত ভিন্নতা শুধু হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি চার মাযহাবসহ জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফতোওয়া। এবার আসি- হাদীসের আলোচনায়, হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে এভাবে এসেছে- হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন- রাসূলে করীম সা. আমাকে (নামাজের মধ্যে) মোরগের মতো ঠোকর দিতে (অর্থাৎ কওমা, রুকু, সিজদা ও জলসা ইত্যাদি ধীর-স্থিরভাবে আদায় না করে তাড়াহুড়ো করা থেকে), কুকুরের মতো বসতে এবং শিয়ালের মতো এদিকে-সেদিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। একই কিতাবের অন্য জায়গায় কুকুরের মতো এর স্থলে বানরের মতো শব্দ এসেছে।

কুকুর ও বানর কীভাবে বসে তা তো অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়। অভিধান, হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ এবং ফিকহের কিতাবাদী তো আছেই। নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে হাদীসে নিষিদ্ধ যে اقعاء যাকে اقعاء الكلب বলা হয়েছে, সেটা হলো উভয় হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই হাত দুই পাশে জমীনের উপরে রাখা। প্রসিদ্ধ গায়র মুকাল্লিদ আলেম ওয়াহিদুজ্জামান খান লুগাতুল হাদীস গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আল্লামা শাওকানি নাইলুল আওতার গ্রন্থে এবং শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি সিফাতুস সালাত গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। (নবিজির নামায ৩৯৪)

এবার ভেবে দেখুন, এই হাদীসে মহিলাদের সিজদার পদ্ধতির আলোচনা কোথায়? এখানে তো বসার নিষিদ্ধ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পুরুষ হোক বা মহিলা, যে কেউই নামাজে কুকুর বা বানরের মতো বসবে না। শিয়ালের মতো এদিক-সেদিক তাকাবে না।

পরিশেষে বিনয়ের সাথে আবেদন করব-সুন্নাহসম্মত, দলিলসমৃদ্ধ যে পন্থায় আমাদের মুসলিম মা-বোনেরা নামায আদায় করেন এবং নামাযে পুরুষের নামায থেকে পদ্ধতিগত কিছুটা ভিন্নতা অবলম্বন করেন- এটা সঠিক পন্থা। মহিলাদের পর্দা রক্ষা ও সুরের হেফাজতের জন্য এটা উপযোগীও বটে। তাই আমার কোনো নতুন গবেষণা ও অভিনব দাওয়াত যেন তাদের জন্য দ্বীন পালনে হতাশার কারণ না হয়।

লেখক: শিক্ষক- জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর।

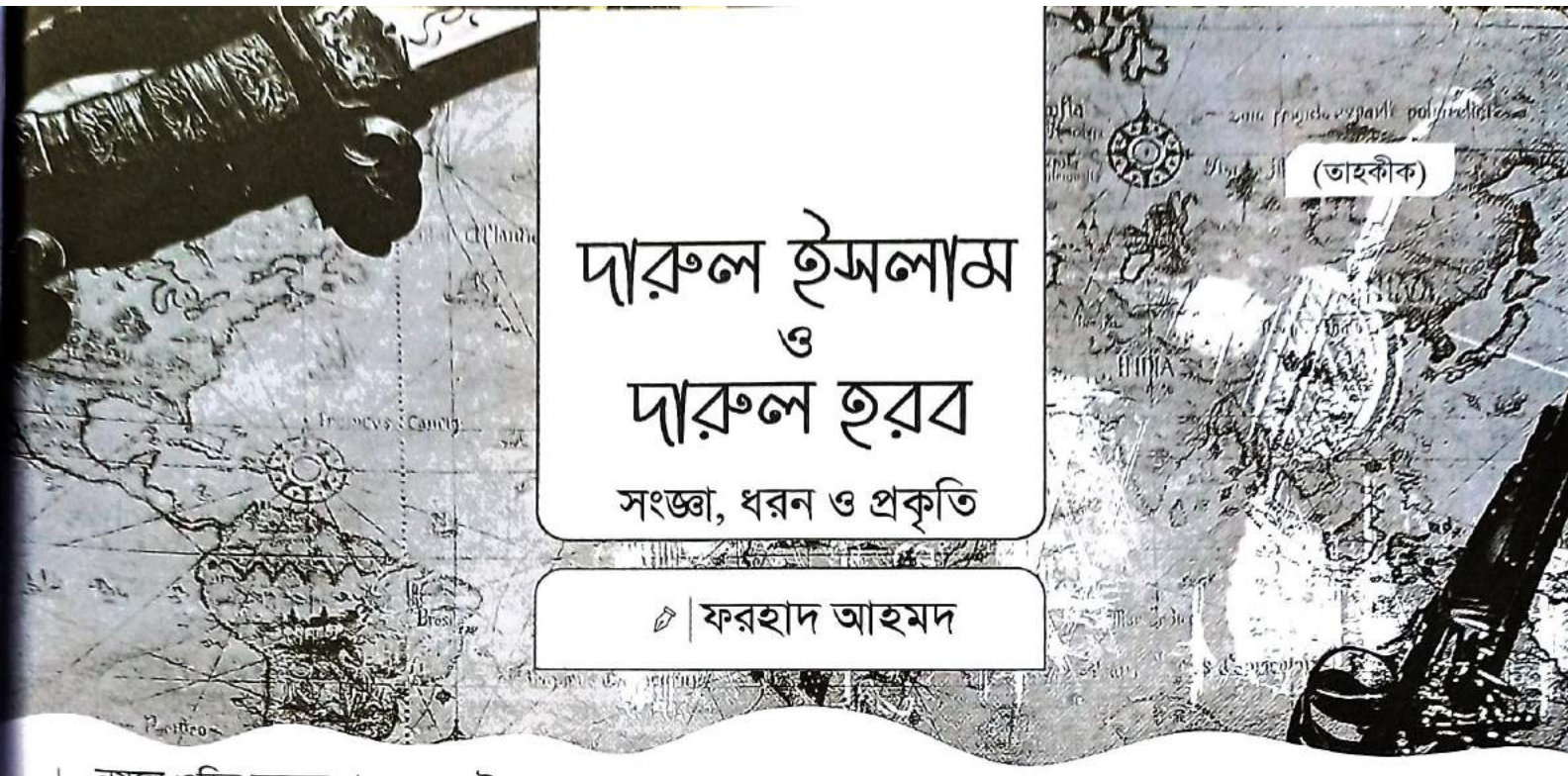

(তাহকীক)

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব

সংজ্ঞা, ধরন ও প্রকৃতি

ফরহাদ আহমদ

নুযূলে ওহির অনেক পরের সময়টাতে আমাদের অবস্থান। যাপিত জীবনে প্রতিদিন আমরা নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এবং প্রতিনিয়ত এগুলোর সমাধান খুঁজছি। একদিকে নতুন-নতুন সমস্যা আবর্তিত হচ্ছে, অপরদিকে পুরাতন অনেক বিষয় চেহারা পালটে নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। সময়ের তাকাযায় কিছু বিধান নতুনভাবে প্রবর্তিত হচ্ছে আবার কিছু বিধানে পরিবর্তন আসছে। দারুল ইসলাম আর দারুল কুফরের মাসআলাটাও এমন। খেলাফত-ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর এ মাসআলাটি নতুনরূপে আমাদের সামনে এসেছে। এটি বর্তমানের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বটে। কারণ, এর সাথে জড়িয়ে আছে শরীয়ার অনেক বিধিবিধান।

বর্তমানে পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা এক জটিল রূপ ধারণ করেছে। একদিকে স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের গান গাওয়া হচ্ছে, অপরদিকে সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম বৈরি আচরণ করা হচ্ছে। অমুসলিমরা তো বটেই, মুসলিম শাসকরাও বৈষম্যের এই নীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করছে।

এজন্য প্রশ্ন উঠছে, বর্তমানে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের সংজ্ঞা এবং এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র কী হবে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবো।

দার (دار) এর সংজ্ঞা:

দার ঐ ভূখণ্ডকে বলে, যা তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। (ক) إقليم (country)- অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা, (খ) سكان (population)- অর্থাৎ জনসংখ্যা (গ) سلطنت (Kingdom)- বা শাসনব্যবস্থা।

ইমাম ইবনুল আবিদীন বলেন- المراد بالدار الاقليم المختص بقهر ملك اسلام وكفر-

আম্মার ইবনে আমির এর ব্যাখ্যায় বলেন-

ظهر من التعريف انه شرط فى الدار. الاقليم والسكان و السلطة. (الهجرة إلى بلاد غير المسلمين: ص ٧٩)

দার (دار) এর প্রকার :

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে দার দুই প্রকার। (ক) দারুল ইসলাম, (খ) দারুল কুফর।

দারুল ইসলাম আবার দুই প্রকার : দারুল ইসলাম হাকীকি, দারুল ইসলাম হুকমি।

দারুল ইসলাম হাকীকি:

ঐ দেশ, যাতে সাংবিধানিকভাবে ইসলামের নীতি ও বিধি প্রণিত ও বাস্তবায়িত হয় এবং দেশের শাসক ও বিচারকগণ মুসলমান হয়। ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাউযিয়্যা বলেন-

دارالاسلام هى التى نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام. (احكام اهل الذمة:ج٢،ص ٧٢٨)

ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন-

تعبر الدار دارالاسلام بظهور احكام الاسلام فيها وان كان جل اهلها من الكفار. (المبسوط:ج١٠، ص ١٤٤)

দারুল ইসলাম হুকমি :

ওই দেশ, যাতে মুসলমানদের কিছু শিআর ও বিধান যেমন- নামাজ, আযান, জুমুআহ ইত্যাদি- পালনের অনুমতি থাকে, যদিও সেখানে মানবপ্রণিত আইন প্রচলিত। তবে সেখানকার শাসক ও আইনপ্রণেতারা মুসলমান। ইবনে আবিদীন শামী বলেন-

لو اجريت احكام المسلمين فى بلد واحكام اهل الشرك فلاتكون دار حرب ما دامت تحت سلطة ولاتنا. (شامى:ج٤،ص١٧٥) ان دارالفسق هى دار الاسلام. (نيل الاوطار:ج٨، ص ٢٧)

বলা বাহুল্য, বর্তমানের প্রায় সবক'টি মুসলিম দেশ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এসব দেশে ইসলামি আইন প্রচলিত নেই, তারপরও এগুলোকে দারুল ইসলাম বলা হয় কেনো? এর কারণ হচ্ছে এগুলোকে দারুল ইসলাম না বললে হারাজ (একটি শরঈ পরিভাষা) বা চরম সঙ্কট দেখা দিবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যদি কোনো দেশকে দারুল

কুফর বলা হয়, তাহলে শত্রুরা সহজে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর দখল নিয়ে নেবে। কেননা, দারুল কুফর হওয়ায় অন্য কোনো কুফরি রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রে আক্রমণ করলেও এর অধিবাসী মুসলমানদের জন্য নফীরে আম (শত্রুর মুকাবেলায় আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া) লাজিম হবে না। আর এভাবে এক এক করে সব মুসলিম দেশ কাফেরদের করায়ত্তে চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, এগুলোকে দারুল ইসলাম আল ফাসিকা (دارالاسلام الفاسق) বা দারুল ফিসক (دارالفسق)বলা যেতে পারে।

ফিক্বহুল আক্বাল্লিয়াতে উল্লেখ আছে-

لواعتبرنا هذه الديار من دارالكفر او الحرب فهذا يعنى ان المسلمين على كثرتهم سيغدون من غير اوطان ولا ديار وفى هذا تمكين لاعداء الله منا اضافة الى ا نه لايجب على المسلمين الدفاع عنها فى حال الاعتداء عليها من الكفار. (فقه الاقليات:ص٩٧)

দারুল কুফর ও দুই প্রকার :

দারুল ইসলামের মতো দারুল কুফরকেও দুইভাগে ভাগ করা হয়। (ক) দারুল কুফর হাকীকি (খ) দারুল কুফর হুকমি।

দারুল কুফর হাকীকি :

যেখানে ক্ষমতার বাগডোর কাফেরদের হাতে থাকবে এবং শাসননীতিও তাদের থিওরী ও বিশ্বাস মোতাবিক হবে। যেখানে মুসলমানদের ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে না; বরং রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁদেরকে নির্মূলে সচেষ্ট থাকবে। যেমন, ১৯৯২ সালের সোভিয়েত রাশিয়া ও বর্তমানের ইসরাঈল।

دارالكفر حقيقةً: وهى التى تصدها الفقهاء فى تعريفهم لدار الكفر وهى التى تظهر فيها احكام الكفر و يحكمها الكفار و انعدمت فيها مظاهر الدين تمامًا بحيث لم يعد لها وجود متميز و لا يوجد فيها مسلمون يؤدون واجباتهم الدينية. (تقسيم العالم:ص٢٥)

দারুল কুফর হুকমি :

যেখানে শাসনক্ষমতা ও শাসননীতি কাফেরদের, কিন্তু মুসলমানদের ধর্মপালনের অধিকার আছে। যেমন বর্তমানের ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশ। এসব দেশকে দারুল আ'হদ বা দারুল আমন বলা যেতে পারে।

والعلة فى الذهاب الى الحبشة ان بنجاشى ملكا لا يظلم عنده احد و كان العدل فى ذاته وسامًا لذالك الملك و سماها المسلمون دار امن و ان لم تكن دار ايمان.

(تفسير الشعراوى: ٢٥٨/٤)

দার -এর আরেকটি প্রকারভেদ :

মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকা না থাকা হিসেবে দার এর আরেকটি প্রকারভেদ আছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দার দুই প্রকার।

(ক) দারুল হরব

যেখানকার পরিবেশ মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল হয়, মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা থাকে না, তাঁরা নির্বিঘ্নে ধর্মপালন করতে পারে না, ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এসব দেশকে দারুল হরব, দারুল কুফর, দারুল মুখালিফীন- ইত্যাদি বলা হয়।

(খ) দারুল আমন ওয়াল আ'হদ (دارالامن والعهد):

যেখানে শাসনক্ষমতা কাফেরদের হাতে থাকলেও তাঁরা মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি মেনে চলে এবং তাঁদের ধর্মপালন ও প্রচারে কোনো বাধা দেয় না।

কেউ কেউ دار حياد নামে আরেক প্রকার দার এর কথা বলেন। دار حياد হচ্ছে এমন দেশ, যা মুসলমানদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়- মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে নিজেরা জড়াবে না এবং অন্যদেরকে সহায়তাও করবে না।

(العلاقات الدولية فى الاسلام: ص٨٤ ، آثار الحرب :ص١٩٧)

এই হলো দার সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত- দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের সংজ্ঞা কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই বিষয়টা 'তাউক্বীফি' (আল্লাহ বা রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত) নয়; বরং এটি মুজতাহাদ ফীহি একটি বিষয়। এতে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ আছে। মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহার মধ্যেও ভিন্নমত ছিলো। তাঁদের বেশিরভাগই দার দুই প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেছেন, দার তিন প্রকার। (ক) দারুল ইসলাম (খ) দারুল কুফর (গ) দারুল আহদ বা দারুস সুলহ। দেখুন-

روضة الطالبين ج:٥، ص٤٣٢

এভাবে কালের বিবর্তনে দার এর সংজ্ঞা ও প্রকারে সংশোধনী এসেছে। যেমন- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ 'দারুল ফিসক' নামে আরও একটি প্রকার সংযোজন করেছেন।

(مجموع الفتاوى ج: ١٨ص: ٢٨٢)

বর্তমান জামানায় কিছু ফুক্বাহা دار حياد নামেও একটি প্রকারের প্রবর্তন করেছেন। মোটকথা, দার -এর বিষয়টি 'মানসূস' না হওয়ায় এতে ইজতিহাদের সুযোগ এখনো আছে। তবে এর অর্থ এটা নয়- যদু মধু যে কেউ এ বিষয়ে কলম ধরে ফেলবে এবং অহেতুক জবানদরাযী করবে। কেবল আবেগ ও জযবার ওপর ভিত্তি করে কোনো দেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়ে এর বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠানো কোনোমতেই জায়েয হবে না।

লেখক: শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

(লেখাটি মাহনামা দারুল উলূমে প্রকাশিত মাওলানা হুযাইফা বাস্তানুবীর دارالاسلام و دارالكفر اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق এর ছায়া অনুবাদ)

(প্রবন্ধ)

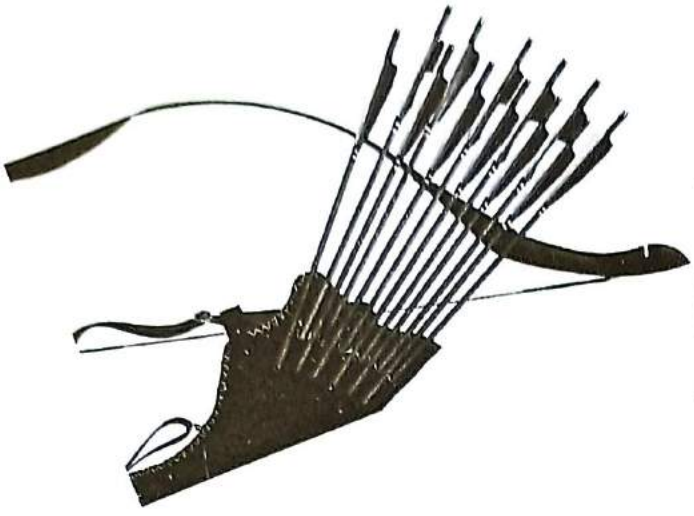

শাতিমে রাসূলের বিধান

একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ইসমাইল আলী

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে নবি রাসূলগণ হলেন মাসুম (নিষ্পাপ), ত্রুটিমুক্ত, নির্মল চরিত্রের অধিকারী। মর্যাদার বিবেচনায় ফিরিশতাদের চেয়েও উর্ধ্বে। মোল্লা আলি ক্বারী রাহ. বলেন-

خواص الملائكة أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عموم الأولياء والعلماء

বিশেষ বিশেষ ফেরেশতাগণ নবিগণ ব্যতীত অন্যান্য ওলি আউলিয়া এবং উলামায়ে কেরাম থেকে উত্তম। (শরহে ফিক্বহে আকবর পৃ. ২০৪)।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. বলেন-

أنا خير الناس يوم القيامة و في رواية أنا سيد ولد ادم

আমি কিয়ামতের দিন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, মানবকুলের সরদার হবো (সহীহ বুখারি)

যেহেতু নবিগণ ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, সুমহান ছিল তাদের জীবনযাপন। তাই কেউ যদি তাদেরকে গালি দেয় অথবা তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করে তাহলে সেটি হবে মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তি হবে দৃষ্টান্তমূলক। শরীয়তের দৃষ্টিতে শাতিমে রাসূল এর বিধি-বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট বিবরণ ফিকহের কিতাব সমূহে রয়েছে। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। আমি সংক্ষেপে এ বিষয়ের মৌলিক আলোচনা গুলো তুলে ধরার প্রয়াস চালাবো ইনশাআল্লাহ। আলোচনা গুলো বুঝার সুবিধার্থে পাঁচটি পয়েন্টে বিন্যস্ত করা হলো:

১. শাতিমে রাসূল এর সংজ্ঞা
২. শাতিমে রাসূল এর শাস্তি
৩. শাতিমে রাসূলের তওবার বিধান
৪. শাতিমে রাসূল যদি নরী হয়
৫. শাতিমে রাসূলকে শাস্তি দেওয়া কার দায়িত্ব?

শাতিমে রাসূল এর সংজ্ঞা : শাতিমে রাসূল বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝায় যে নবি-রাসূলগণের ব্যাপারে মন্দ কথা বলে। তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করে অথবা তার কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

قال الدسوقي: السب هو كلام قبيح وحينئذ فالقذف و الاستخفاف والحاق النقص كل ذلك داخل في السب

বা গালি বলা হয়- প্রত্যেক মন্দ কথাকে, সুতরাং নবি রাসূলগণের ব্যাপারে অপবাদ রটানো এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করণ এবং তাদের চরিত্রে ত্রুটিযুক্ত কালিমা লেপন সবই سب বা গালির অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ আল কুয়াতিয়্যাহ)

ইমাম আবু উউসুফ রহ. বলেন-

و أيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله و بانت منه زوجته فإن تاب وإلا قتل و كذا المرأة

যে মুসলিম পুরুষ আল্লাহর রাসূল সা. কে গালি দিবে অথবা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে অথবা তাঁর দুর্নাম করবে অথবা তাঁর দোষ বের করবে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এমনি ভাবে কোন মহিলা যদি এ অপরাধ করে তারও শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। (আল খারাজ: ১৮২)। মহিলাদের ব্যাপারেও এ হুকুম ছিলো ইমাম আবু ইউসুফের ব্যক্তিগত মতামত। তবে পরবর্তীতে তিনি এটি থেকে রুজু করেছেন। যার বিবরণ স্বস্থানে আসবে ইনশাল্লাহ।

শাতিমে রাসূলের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড:

কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি শাতিমে রাসূল হয় তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা (ঐক্যমত) হয়েছে।

আর জিম্মি যদি শাতিমে রাসূল হয় তাহলে ইমাম আহমদ, মালিক, শাফেয়ি রহ. এর মতে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে মৃত্যুদণ্ড নয়; বরং তাকে প্রহার করা হবে। তবে জিম্মি ব্যক্তি বারংবার এ অপরাধ করলে বিচারক চাইলে তাকে হত্যার আদেশ দিতে পারেন। জিম্মি ব্যতীত অন্যান্য কাফের যদি শাতিমে রাসূল হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে, যা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন-

قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على متنقصه من المسلمين و سابه وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره

অতঃপর বলেন-

و تحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم و قد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك اسحاق بن راهويه و غيره و إن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك و أهل المدينة و هو مذهب أحمد و فقهاء الحديث و قد نص أحمد على ذلك في مواضع معتدة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب و نقل منه أبو الصقراء في حق الذمي أيضا

উক্ত এবারত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রাহ. এর মতে যে কোন প্রকারের কাফের যদি শাতিমে রাসূল হয় তাহলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। অন্যত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ., ইমাম শাফেয়ি রাহ. এর এরকমই মত বলে উল্লেখ করেছেন। (আস সারিমুল মাসলুল পৃ. ১৫-১১)

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতে জিম্মি ব্যতীত অন্য যে কোন শাতিমে রাসূলের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কেননা জিম্মি ব্যক্তি যতক্ষণ চুক্তি ভঙ্গ করবে না, ততক্ষণ তাকে হত্যা করার বিধান ইসলামি শরীয়তে নেই। হ্যা যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি তাদের ধর্মমতেও মৃত্যুদণ্ড, এ জাতীয় অপরাধ করলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে। তবে বারংবার অপরাধ করলে তাকেও হত্যা করা যাবে। (আসসারিমুল মাসলুল ১৭, বিস্তারিত জানতে দেখুন (تنبيه الولاة والحكام في أحكام شاتم خير الأنام - لابن عابدين الشامي

কোনো মুসলমান যদি শাতিমে রাসূল হয় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং এ কারণে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম জাসসাস রাযি রাহ. লিখেন-

قال ابو جعفر ومن سب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تنقصه كان بذلك مرتدا و ذلك لقوله تعالى لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه

و قال تعالى : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم فإنما جعل الله تعالى تعظيم الرسول من شرائط الإيمان كان من لم يعظمه كافرا و أحبط عمل من جهر له بالقول فكيف من سبه!

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন- যে ব্যক্তি রাসূল সা. কে গালি দিবে অথবা তার দোষ বের করবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন– تعزروه وتوقروه "তোমরা রাসূলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে" তিনি আরো ইরশাদ করেন- তোমরা কখনো নিজের আওয়াজ নবির আওয়াজের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে ওপরের সাথে উঁচু গলায় আওয়াজ করো নবির সামনে কখনও সে ধরনের উঁচু আওয়াজে কথা বলো না, এমন যেনো কখনো না হয়। তোমাদের সব কাজকর্ম একারণেই বর্বাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্মান প্রদর্শন করাকে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। কেউ যদি শ্রদ্ধা না করে সে কাফির হয়ে যাবে এবং নবিজির সামনে উচ্চ স্বরে কথা বললে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে যে ব্যক্তি তাকে গালি দিবে তার কী অবস্থা হবে? (শরহু মুখতাসারিত তাহাবি)

আল্লাহ বলেন- إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিবে তাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর লানত এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

قل إن كان آباءكم و أبنائكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره

হে নবি! বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার-পরিজন, তোমাদের বংশগোত্র এবং তোমাদের ধন-সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যা অচল হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ি-ঘরসমূহ, যা তোমরা একান্তভাবে কামনা করো, যদি এ গুলো তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ও জিহাদ করার চাইতে বেশী ভালোবাসো, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার (পক্ষ থেকে) আযাবের ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। (সূরা তাওবা: ২৪) কোরআনে কারীমের এ আয়াত দ্বারা রাসূল সা. কে মহব্বত করার বিধানটি অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়। তাই কোন ব্যক্তি যদি রাসূল সা. কে গালি দেয় তাহলে সে কোরআনে বর্ণিত অকাট্য এ বিধানকে অস্বীকার করলো। সুতরাং ঐ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে। কেন সে মুরতাদ হবে না? সে তো কোরআনের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। যেমনি ভাবে কোন ব্যক্তি নামাজ অথবা জিহাদের সরাসরি বিপরীতে অবস্থান নিয়ে এর বিরুদ্ধে যদি বক্তব্য প্রদান করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কোন মুসলমান যদি কাফের হয় পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলে। আর মুরতাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তাই কেউ যদি আমাদের রাসূল সা. কে গালি দেয় অথবা তাঁর ব্যাপারে মন্দ কথা বলে তাহলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

হাদীসে আছে-

أن رجلا أغلظ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له أبو بردة رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فقال ما كان ذالك لأحد بعد رسو لله ﷺ

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাযি. কে কঠোর ভাষায় কথা বলল। তখন হযরত আবু বুরদাহ রাযি. বললেন- আমাকে অনুমতি দেন, আমি ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, এটা শুধু আল্লাহর রাসূলের সাথে নির্দিষ্ট। কেউ যদি রাসূল সা. এর সাথে এরকম কথা বলতো তাহলে তার গর্দান উড়ানো যেতো। (সুনানে আবি দাউদ: ৪৩৬৩, ৩৬১)

কাজী ইয়াজ রহ. বলেন, নবিজি সা. ইরশাদ করেন-

من سب نبيا فاقتلوه و من سب أصحابي فاضربوه.

যে ব্যক্তি কোন নবিকে গালি দিবে তাকে তোমরা হত্যা করো। আর যে ব্যক্তি আমার কোন সাহাবিকে গালি দিবে তাকে প্রহার করো।

হাদীসটি সনদের দৃষ্টিতে যদিও দুর্বল কিন্তু এর অর্থের উপর ইজমা সংঘটিত হওয়ার কারণে এটি দলিলযোগ্য হয়ে গেছে সুতরাং কেউ যদি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন নবিকে গালি দেয় অথবা তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলে তাহলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

তেমনিভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো ফেরেশতাকে যদি কেউ গালি দেয়, তাহলে তারও শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। (মাজমূয়াতু রাসায়িলি ইবনে আবিদীন -৩৫৭)

আল্লামা শামি রহ. ফাতওয়ায় শামিতে প্রায় হুবহু বক্তব্য নকল করে ফতোয়া প্রদান করেছেন। (ফাতাওয়ায় শামি ২৩৫/৪)

এতক্ষণ শাতিমে রাসূল মুসলিম হলে তার বিধান কী হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। জিম্মির বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। জিম্মি ব্যতীত অন্য কোন কাফের শাতিমে রাসূল হলে তাকেও হত্যা করা হবে। যা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত। বুখারি শরীফে কা'ব ইবনে আশরাফের ঘটনা, ইবনে খাতালের ঘটনা যার প্রমাণ বহন করে।

শাতিমে রাসূল তাওবা করলে তার বিধান :

হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়ত মতে শাতিমে রাসূলের তাওবা গ্রহণযোগ্য। যদি সে তাওবা করে নেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। যেমনি ভাবে মুরতাদ তাওবা করে পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হয় না। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও অভিমত। আমাদের মতে যেহেতু তার শাস্তি (ردة) রিদ্দত অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার কারণে হবে, তাই মুরতাদ এর সমস্ত বিধিবিধান তার ব্যাপারে সাব্যস্ত হবে। এমন কি তাকে তাওবা করার জন্য দাওয়াত দেওয়াও মুস্তাহাব। হানাফি মাযহাবের বিভিন্ন কিতাব যেমন ফাতহুল কাদীর, রদ্দুল মুহতার ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। বরং সঠিক হলো, যা পূর্বে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল খারাজ পৃ. ১৮২, তানবিহুল উলাতে ওয়াল হুক্কাম লি- ইবনে আবিদীন শামি রহ.)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন-

أقوال العلماء في توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم - و قد ذكرنا أن المشهور عن مالك و أحمد أنه لا يستتاب و لا تسقط القتل عنه التوبة و حكي عن مالك و أحمد أنه تقبل توبته و هو قول الإمام أبي حنيفة و أصحابه و هو المشهور من مذهب الشافعي- الصارم المسلول ص٢٤٠

ইমাম আহমদ ও মালিক রহ. এর প্রসিদ্ধ উক্তি মতে শাতিমে রাসূলের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইমাম আবু হানীফা ও তার সাথীদের মাযহাব হলো যে, শাতিমে রাসূলের তাওবা গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ি রহ. এরও প্রসিদ্ধ অভিমত। ইমাম তাজ উদ্দীন সুবকি রাহ. ও হানাফি মাযহাবের অভিমত এরকমই বর্ণনা করেছেন। খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি রহ. এটা হানাফি মাযহাবের ফতোয়া বলে অভিহিত করেছেন এবং হানাফি মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবে যে বিপরীত উক্তিটি এসেছে, তা অন্য মাযহাবের কিতাব থেকে ভুলবশত এসে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন। (তাম্বীহুল উলাত ওয়াল হুক্কাম, শরহু উকুদি রাসমিল মুফতী পৃ. ৫৮)

সুতরাং শাতিমে রাসূল যদি তাওবা করে ফেলে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না।

কোন নারী যদি এ অপরাধ করে তাহলে তাকে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত কেননা হানাফি মাযহাব মতে শাতিমে রাসূলের শাস্তি দেওয়ার কারণ হলো রিদ্দত অর্থাৎ মুরতাদ হওয়া।

قال الحنفية إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا كأي مرتد؛ لأنه بدل دينه فيستتاب و تقبل توبته- الموسوعة الفقهية ح٢٢ ص١٨٤

শাতিমে রাসূলকে অন্যান্য মুরতাদের মতো মুরতাদ হিসেবে গণ্য করা হবে।

সুতরাং শাতিমে রাসূল যেহেতু মুরতাদ, তাই কোন মহিলা যদি শাতিমা হয় তাহলে সে মুরতাদ্দার হুকুমে হবে। তাই তার শাস্তি হবে বন্দি করা। এই অপরাধে অপরাধী মহিলাকে তাওবা বা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ করে রাখতে হবে।

قال أبو جعفر: و من كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء أستتيب فإن تاب و إلا قتل و قال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي و أما المرأة فإنها تسترق من قبل أنها لا تقتل، و الحجة في أن المرتدة لا تقتل، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن قتل النساء و الصبان- صحيح مسلم- ثم قال فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال : من بدل دينه فاقتلوه و هو عام في المرأة والرجال، قيل له : ابن عباس راوي الخبر. و كان يقول المرتدة لا تقتل. فعلمنا أن قوله :" من بدل دينه فاقتلوه" في الرجال-

و قال أبو جعفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه كان بذالك مرتدا- شرح مختصر الطحاوي_كتاب المرتد-

এ সমস্ত এবারত থেকে বুঝা গেল শাতিমে রাসূল হলো মুরতাদ। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার শাস্তির কারণ কেবল মুরতাদ হওয়াই। তাই তার সমস্ত বিধান মুরতাদ এর বিধানের মতো।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে শাতিমে রাসূলের শাস্তির কারণ হলো মুরতাদ হওয়া এবং শাতিমে রাসূল হওয়ায় আরো অতিরিক্ত অপরাধ। আরবি ভাষায় তাকে إرتداد وزيادة দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। তাই সর্বক্ষেত্রে এটি হুবহু মুরতাদের হুকুমের মত নয়। (আল মাউসুআ খ.২২)

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রথমে মুরতাদ্দার হত্যার প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবু হানীফার দিকে রুজু করেন। (মাবসুতে সারাখসি ১০৮/১০)

বি. দ্র. তবে কেউ যদি মুরতাদ্দাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার কেসাস বা রক্তপণ দিতে হবে না। (মাবসুতে সারাখসি ১১৬/১০)

শাতিমে রাসূলেকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব কার :

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, মুরতাদের শাস্তির দায়িত হলো (ولي الأمر) সরকার বা তার প্রতিনিধির। তবে কোন সাধারণ ব্যক্তি যদি মুরতাদকে হত্যা করে ফেলে তাহলে সরকার বা তার প্রতিনিধি ঐ ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে কেসাস বা রক্তপণের শাস্তি দিতে পারবে না। হ্যাঁ, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার কারণে প্রহার করবে।

(الموسوعة الفقهية٢٢/١٩٠)

এটি হলো ইসলামি রাষ্ট্রের বিধান। অনৈসলামিক রাষ্ট্রে শাতিমে রাসূলকে হত্যা করা কারো উপর ফরয নয়। তবে কেউ যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তবে সে সওয়াব পাবে। (দেখুন: website of Darul ifta Darul ullom Dewbond & Darul ullom banuritown karachi)

লেখক : শিক্ষার্থী, তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা

ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়

একটি পর্যালোচনা

মনসুর মুস্তফা

ওয়াকফ হচ্ছে একটি কল্যাণময় কাজ। ইসলামি দৃষ্টিতে এতে অনেক সওয়াবও রয়েছে।

ওয়াকফ বলা হয়-

حبس العين على حكم الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث- (الفتاوى الهندية جـ:٢صـ:٣٤٦)

সাধারণত মুসলমানেরা মসজিদ মাদরাসা এতিমখানা ইত্যাদিতে নিজেদের জায়গা-জমি ইত্যাদি ওয়াকফ করে থাকেন।

যাতে তারা আজীবন এর মাধ্যমে সওয়াব পেতে পারেন এবং মৃত্যুর পরও তাদের সওয়াব লাভের একটি মাধ্যম যেনো বাকি থাকে। কিন্তু বর্তমানে অনেকের ওয়াকফ সম্পত্তি সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বড় ধরনের ভুল করে বসেন; যে ভুলের ক্ষতিপূরণ অনেক কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। এখানে এই ভুলের ব্যাপারে দু'একটি কথা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানরা সাধারণত মসজিদ বা মাদরাসায় এভাবে ওয়াকফ করে থাকেন যে, হুবহু এই ভূমিটি মসজিদের নামে থাকবে এবং তার উপকারিতা মসজিদ ভোগ করবে। যাতে সে মৃত্যুর পরও সর্বদা এর মাধ্যমে প্রতিদান পেতে থাকে এবং আখেরাতে তার দরজা বাড়তে থাকে।

কিন্তু অনেক সময় হুবহু সেই ভূমি থেকে উপকার অর্জন না করে তা বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর তা বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ বা অন্যান্য কাজে ব্যয় করা হয়। অথচ তা বিক্রি করা বৈধ- না অবৈধ- এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করা হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো, ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করা কি বৈধ ?

এর সমাধানের জন্য আমাদের জানতে হবে কোনো ভূমি ওয়াকফ করার পর তার দুই অবস্থা হয়।

১ম অবস্থা : এমন ভূমি যা থেকে কোনো ভাবেই উপকৃত হওয়া যাচ্ছে না। যদি অবস্থা বাস্তবে এমনই হয়, তাহলে এই প্রকার ভূমির ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, তা বিক্রি

করে তার টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা বা মসজিদের অন্যান্য কাজ করা জায়িয নয়। তবে ঐ ভূমি বিক্রি করে তার টাকা দিয়ে অন্য আরো একটি ভূমি ক্রয় করে মসজিদের মালিকানায় রেখে দিতে হবে। যাতে ওয়াকিফের মূল উদ্দেশ্য অক্ষত থাকে। فتح القدير এর ৬নং খণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي بيعها ويشتري بثمنها أخرى قال نعم.

এভাবে "الفتاوى الهندية" র ২নং খন্ডের ৩৮৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وإذاخربت أرض الوقف وأراد القيم ان يبيع بعضا منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك.

ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়াতে" (৫ নং খন্ড ৫০৯ পৃষ্ঠায়) এরকমই বলা হয়েছে। البحر الرائق গ্রন্থে আছে-

وفي المنتقى قال هشام سمعت محمدا يقول: الوقف إذا صار بحيث لاينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي.

(খন্ড:৫ পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

আর যদি ভূমির অবস্থা এমন হয় যে, তার দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়া যায় বা কিছু হলেও উপকৃত হওয়া যায়। তাহলে এরূপ ভূমি বিক্রি করে তার টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ বা অন্য কাজ করা জায়েয নয়। এভাবে যে ভূমি থেকে অল্প মুনাফা আসে তা বিক্রি করে তা দিয়ে বেশি মুনাফা ওয়ালা ভূমি ক্রয় করাও জায়েজ নয়। যেমন فتح القدير এর মধ্যে রয়েছে- (খন্ড ৬ পৃ:২২০)

إذا يبس بعض أشجار الأرض الموقوفة يبيعها ولا يبيع من الأرض لذلك.

الدر المختار নামক কিতাবে রয়েছে- (খন্ড:৬ পৃষ্ঠা:৫৪০)

فإذا تم ولزم لايملك ولايملك ولا يعار ولا يرهن وفي رد المحتار قوله ولايملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لإستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

البحر الرائق কিতাবের আরেক জায়গায় আছে-

بيع العقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بإمرالقاضي وإن كان خرابا قال صدر الشهيد والفتوى على أنه لايباع.

(খন্ড: ৫ পৃ: ৩৪৫)

فتح القدير এ বলা হয়েছে-

فاذا صح الوقف لم يجز بيعه أى إذا لزم الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه أما امتناع التمليك فلما بينا: يعني ماروى عن قوله-صلى الله عليه وسلم- تصدق بأصلها لاتباع ولا توهب.

(খন্ড:৬ পৃষ্ঠা: ২০৪)

ওয়াকফকৃত ভূমি বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো তা ওয়াকিফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া। ফুকাহায়ে কেরাম ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার বিষয়টিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। رد المختار এর ৬নং খন্ডের ৬৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

অতএব واقف যদি বলে যায় যে, আমার এই ভূমি যেনো এমনভাবে রাখা হয় যাতে সর্বদা মসজিদ ভূমি থেকে উপকৃত হতে পারে। তাহলে তা বিক্রি করা যেমন যাবে না তেমনি যদি কিছু নাও বলে যায়, তখনও বিক্রি করা যাবে না। কারণ, সাধারণ প্রচলন রয়েছে যে, লোকেরা ভূমি ওয়াকফ করে থাকে যাতে এর মূল অক্ষত রেখে তার উৎপাদন থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

আর নীতি রয়েছে যা সাধারণভাবে করা হবে তা প্রচলিত বিষয়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন رد المختار এ রয়েছে-

وصرح الأصوليون: بأن العرف يصلح مخصصا وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف.

তবে যদি ওয়াকিফ ওয়াকফ করার সময় একথা উল্লেখ করে যে, প্রয়োজনের সময় তা বিক্রি করতে পারবে। তাহলে তা বিক্রি করা যাবে। আর যদি ওয়াকফ করার সময় একথা উল্লেখ না করে। পরে স্বয়ং ওয়াকিফও আর তা বিক্রি করার অধিকার পাবেন না। যেমন উসূলে ফিকহের একটি কায়দা রয়েছে- نص الواقف كنص الشارع

ওয়াকফকারীর উক্তি শরীয়ত প্রণেতার উক্তির মত।

সুতরাং ওয়াকফ করার সময় বিক্রির কথা উল্লেখ থাকলে বিক্রি বৈধ হবে, আর উল্লেখ না থাকলে বৈধ হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম সঠিক ভাবে বুঝে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

শিক্ষার্থী : তাখাসসুস ফিল ফিকহ

প্রাচ্যবাদঃ ইসলাম বিকৃতির নোংরা উপাখ্যান

তাওহীদুল ইসলাম

অসত্যের কালোমেঘ হটিয়ে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম ভোগবাদী জনগোষ্ঠীর প্রবৃত্তির প্রাসাদে কুঠারাঘাত হেনেছে প্রচন্ডভাবে। যার ফলে নবি সা. এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে একদল লোক সদা সচেষ্ট। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ইসলাম তার পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে আজও পৃথিবীতে টিকে আছে। কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। বিধর্মীদের চক্রান্ত রুখে দিতে বদর থেকে ক্রুসেড পর্যন্ত বহু যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। মুসলমানরা সর্বদা বিজয়ী হয়েছে, কখনো পরাজিত হয়নি। হ্যাঁ, বিপর্যয় এসেছে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা নবিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের ক্ষতিসাধনে মরিয়া আছে। ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে বারবার পরাজিত হওয়ার পর খ্রিস্টানরা নিশ্চিত হয়ে গেল মুসলমানদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তারা বীরের জাতি। ঐক্যবদ্ধ। শাহাদাতের আকাঙ্খা তাঁদের ঘুমোতে দেয় না। যতোদিন মুসলমানরা তাদের কুরআন হাদীসকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরবে, ততোদিন কোনো জাতি তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। তাদেরকে পরাজিত করতে হলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করতে হবে। তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার- কুরআন হাদীসের উপর আক্রমণ করতে হবে। বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে যুক্তিতর্কে সাধারণ লোকদেরকে কাবু করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় 'প্রাচ্যবাদের' জন্ম। ৮০০ বছরের ইসলামি সাম্রাজ্য আন্দালুসের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে পশ্চিমা সন্ন্যাসীরা প্রাচ্যবাদের উদ্ভব ঘটায়। তারা আন্দালুসের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করে, যাতে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে এবং খ্রিস্টানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে পারে। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ফ্রান্সের জারবার্ট (jerbert); যিনি আন্দালুস থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রোম দেশের একটি গির্জায় পোপ নিযুক্ত হন। এছাড়াও পিটার (১১৫৬-১০৯২) ক্রেমনা'র জেরাড (১১৮৭-১১১৪) 'এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচ্যবাদ (Orientalism):

আরবিতে এর জন্য ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে "ইসতিশরাক"। সাধারণের বুঝার জন্য ইসতিশরাকের যে অর্থ করা যেতে পারে তা হল, প্রাচ্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা।

প্রাচ্যবাদকে ইংরেজিতে বলা হয় Orientalism। ল্যাটিন ভাষায় Orient শব্দটি কোনো কিছু খোঁজা বা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জার্মানি ভাষায় Sich Orientieren এর অর্থ, কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। একই ভাবে ফরাসি ভাষায় Orienter শব্দটি পথপ্রদর্শনের অর্থে ব্যবহৃ হয়।

আর ইংরেজিতে Orientate বলা হয় কোনো কিছুর প্রতি নিজের অনুভূতি ঝুকিয়ে নেওয়া। এটি হলো প্রাচ্যবাদের শাব্দিক অর্থ।

পারিভাষিক অর্থে প্রাচ্যবাদ বলা যায়- মুসলিমদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির নিমিত্তে ইসলাম সম্পর্কে ইহুদি-খ্রিস্টানদের জ্ঞানচর্চা।

আব্দুর রাজ্জাক নদভি বলেন- প্রাচ্যবাদ শব্দটি 'ব্যাপক' ও 'বিশেষ' দুই অর্থ দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে প্রাচ্যের যে কোন স্থান, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পশ্চিমা গবেষণা, বিশেষ অর্থে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গবেষণা ও ইসলামচর্চা।

প্রাচ্যবিদদের কর্মপদ্ধতি:

ইসলামি সাম্রাজ্য ভস্মীভূত করে কুফুরি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইহুদি-খ্রিস্টানরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের মগজ ধোলাই করতে সূক্ষ্ম পন্থায় কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে। এমনভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝা প্রায় অসম্ভব।

আবুল হাসান আলি নদভি বলেন- প্রাচ্যবিদরা তাদের লেখায় নির্দিষ্ট পরিমাণে বিষ মিশিয়ে থাকেন। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি বিশ মিশান না। যার ফলে তাদের লেখা পড়ে খুব কম মানুষই প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। মধ্যম ধরনের পাঠকের পক্ষে তো তাদের ধুম্রজাল থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। এরা ঐসব লেখকদের থেকে ভয়ঙ্কর যারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করেন এবং নিজেদের বইকে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী দিয়ে সাজিয়ে তোলেন।

প্রাচ্যবিদদের কিছু কর্ম:

প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মসূচি রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে রুটিন মাফিক তারা তাদের কর্মসূচি পালন করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করছি-

মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করা:

প্রাচ্যবিদদের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা।

ছোটো ছোটো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার প্রয়াস চালিয়েছে। তারা ভাষাগত বৈষম্য সৃষ্টি করে মুসলিম জাতির মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করেছে। নিজের আঞ্চলিক ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে অন্যের ভাষার উপর নিজের ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ভাষা সংশ্লিষ্ট বর্তমানে যত বিতর্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সবগুলোই প্রাচ্যবিদদের তৈরী ফাঁদের ফসল। বর্তমানে ভাষার মাধ্যমে জাতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা হচ্ছে। মনে রাখা উচিত, মুসলমানদের ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু জাতি হিসেবে তারা এক-অভিন্ন। ভাষাগত বৈষম্য সৃষ্টি করে প্রাচ্যবিদরা তাদের উদ্দেশ্য অনেকটাই হাসিল করতে পেরেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক ইণ্যাদি দেশে ভাষার কারণে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আরো নানাভাবে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টে পশ্চিমারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামি রাজনীতি ও জিহাদের অপব্যাখ্যা:

ইহুদি-খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ইসলাম। ইসলামকে রুখে দিতে তারা সর্বদা সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ইসলামি রাজনীতি ও জিহাদ সম্পর্কে বিষোদগার অব্যাহত রেখেছে। জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলে প্রচার করছে। এতো বেশি অপপ্রচার করছে যে, অনেক মুসলিমরাও এখন জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ মনে করে। কেউ শুধু আত্মরক্ষা মূলক জিহাদের প্রবক্তা। ইকদামি জিহাদকে অস্বীকার করেন। কেউ তো প্রত্যেক ভালো কাজকেই জিহাদ বলে থাকেন।

এমনও অনেক আছেন যারা নফসের জিহাদকে সবচেয়ে বড় জিহাদ বলে থাকেন। ইসলামি রাজনীতিকে এমনভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম ইসলামি রাজনীতি কী তা-ই জানে না। অনেকে তো আলেম-ওলামার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে দোষের চোখে দেখে।

ইসলামের ইতিহাস বিকৃতি:

প্রাচ্যবিদ বহু লেখক মুসলমানদের সোনালি ইতিহাস বিকৃত করে অনেক বই লিখেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে সফল লেখক হলেন জুরজি জায়দান। সাহিত্যিক ছিলেন। খুব সহজেই পাঠকের মন জয় করতে পারতেন। ইংরেজের অধীনে অনুবাদের কাজ করেছেন। ১৮৯৬ সালে 'আল-হেলাল' নামে পত্রিকা বের করা শুরু করেন। এই পত্রিকাকে ঘিরেই তার সাহিত্য সাধনা পুরোদমে শুরু হয়েছিল। জুরজি জায়দানের মতো সমকালীন আর কোনও লেখক ইসলামি ইতিহাসকে এতটা বিকৃত করতে পারেনি। জুরজির কাছ থেকেই অধিকাংশ 'প্রাচ্যবিদ' ইতিহাস গ্রহণ করেছেন। তার বিখ্যাত একটি বই হচ্ছে (تاريخ التمدن الإسلامي) ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস।

প্রাচ্যবিদদের আক্রমণ:

ইসলামের উপর প্রাচ্যবিদরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে আক্রমণ করছে।

প্রত্যক্ষ আক্রমণ যেমন-

ইসলামের বিধান বিকৃত করে বইপত্র লিখা এবং বিভ্রান্তিমূলক অনুবাদ করা। উদাহরণ স্বরূপ তাদের অনুবাদের একটা নমুনা পেশ করা হল- মার্গোলিউথ তার বই "Mohammed and the rise of Islam" এ লিখেছে, বদর যুদ্ধে যখন প্রথম রক্তের ফোঁটা পতিত হয়, তখন মুহাম্মদ সা. ঝুপড়িতে এসে বেহুশ হয়ে পড়েন। হুঁশ আশার পর দোয়ায় মশগুল হয়ে যান। যাতে লোকেরা বুঝতে না পারে, তিনি বেহুঁশ হয়েছিলেন। এ কথা দ্বারা সে নবি সা. কে ভীরু কাপুরুষ প্রমাণ করতে চেয়েছে। গাশিয়াতহুন নাওমের অর্থ তুলেছে 'বেহুঁশ হয়েছেন'। মূলত এই তরজমাটা wellhausen থেকে ধার করে নেওয়া। অথচ গাশিয়াতহুন ..নাওমু ...ফাস্তাইকাযা অর্থ হল, তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছেন অতঃপর জাগ্রত হলেন। গাশিয়া হলো সুলাছি মুজাররাদের ক্রিয়া যা ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া অর্থ দেয়।

এই ক্রিয়ামূল যদি সুলাসি মাযীদ ফিহির বাবুল ইফআলে নিয়ে মাজহুল করা হয় তখন অর্থ হয় বেহুঁশ হওয়া। আবার এই বর্ণনার সাথে সীরাতের অন্য কোনো বর্ণনার মিলও নেই।

এই জালিয়াতি কিন্তু সে জেনেশুনেই করেছে। কেননা সে আরবি সম্পর্কে খুব প্রাজ্ঞ ছিল।

এভাবে হাদীসের উপরও তারা বিভিন্ন ধরনের আপত্তি তুলেছে। ১৯২৯ সালে মিশরের বিখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ আমীন তার বিখ্যাত বই 'ফাজরুল ইসলাম' রচনা করেন। উক্ত বইয়ে তিনি হাদীসবিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি তুলেন। মূলত তার উত্থাপিত আপত্তিগুলো প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহার থেকে ধার করা। তার এই রচনা বহু মুসলিমের মনে হাদীসের ব্যাপারে সংশয় পয়দা করতে সক্ষম হয়েছিল। (আসারুল মুস্তাশরিকীন আলা আবনা-ইল মুসলিমীন)

হাদীসের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করতে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. র স্মৃতি শক্তি দুর্বল ছিল বলে অপপ্রচার চালানো হয়। অথচ বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। একদা মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর সেক্রেটারি আবুয যুবাইবাহর মাধ্যমে আবু হুরায়রা রাযি. কে ডেকে আনেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীস জানতে চান। খলীফা মারওয়ান যুবাইবাহকে পর্দার আড়ালে থেকে এগুলো লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। পূর্ববর্তী বছর আবারও আবু হুরায়রা রাযি. কে ডেকে এনে পূর্ববর্তী বছরের সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে জানার ইচ্ছা করেন এবং আবুয যুবাইবাহকে পর্দার আড়ালে থেকে হাদীসগুলো মিলিয়ে দেখতে বলেন।

আবুয যুবাইবাহ বলেন, আমি একটি হরফও হেরফের হতে দেখিনি। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রাযি. হুবহু সেই হাদীসগুলো উপস্থাপন করেছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল আবু হুরায়রা রাযি. প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তারা জেনেশুনেই এ মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে। কারণ তারা জানে আবু হুরায়রা রাযি. সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার স্মৃতিশক্তির উপর কালেমা লেপন করা গেলে অনেক হাদীসের উপর সংশয় সৃষ্টি করা যাবে।

ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা এবং জার্নালের মাধ্যমেও অপপ্রচার:
সিএনএন, বিবিসি, ফক্স নিউজসহ বিভিন্ন মিডিয়া প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্য সফল করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই মিডিয়াগুলোই ইরাক ধ্বংসের পূর্বে প্রচার করেছিল ইরাকের কাছে নাকি গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। এটা ছিল মূলত ইরাক আক্রমণ জায়েয করার প্রক্রিয়া। সাদ্দামের অপসারণ মধ্যপ্রাচ্যের জন্য কতোটা শান্তি বয়ে আনবে তা নিয়ে বিভিন্ন নিউজ প্রকাশ করা হয়। যার ফলে বিশ্ববাসীর নিকট অ্যামেরিকা কর্তৃক ইরাকে আক্রমণ বৈধ বলে স্বীকৃতি পায়। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল আফগানিস্তান আক্রমণের বেলায়ও। বিপরীতে ইহুদি কর্তৃক ফিলিস্তিনবাসীর উপর চালানো আগ্রাসনের ব্যাপারে তারা তেমন কোনো নিউজ প্রকাশ করে না। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ নিউজ পোর্টালই পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামকে বর্বর ও অসভ্য সাব্যস্ত করার জন্য তিলকে তাল বানিয়ে নিউজ প্রচার করা হচ্ছে। সভা,সেমিনার, কনভেনশন, বিশ্বকোষ ও এন্সাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমেও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

পরোক্ষ আক্রমণ:
বিভিন্ন দেশের মুসলিম মেধাবী ছাত্রদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে প্রাচ্যবিদদের ইনস্টিটিউটে নিয়ে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। ফলে মুসলিম মেধাবী ছাত্রগুলো নিজেদের অজান্তেই প্রাচ্যবিদদের দাসে পরিণত হচ্ছে। তারা নিজ দেশে গিয়ে প্রাচ্যবিদদের চর্বিত চর্বণের বিকাশ ঘটায়। আর সাধারণ জনতা সহজ বিধান পেয়ে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। প্রাচ্যবিদদের ইনস্টিটিউটে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে বর্তমান বিশ্বে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। তাদের জাঁকজমকপূর্ণ কথাগুলো সাধারণ জনগণের কাছে চাকচিক্যময় মনে হয়। অনেক মুসলিম দেশে তাদের খুব ভালো মূল্যায়ন করা হয়। বড় বড় পদে আসীন করা হয়। পশ্চিমারা মুসলিম যুবকদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করেছে যে, তারা এখন প্রাচ্যবিদদের প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড ইত্যাদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া স্কলারদেরকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করে। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কথায় কথায় ইংরেজি বলা স্কলারকে যতোটা মূল্যায়ন করে, আরবি বলা আলেমকে ততোটা মূল্যায়ন করে না। অথচ কোরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সতর্কতার দাবি হচ্ছে, যারা বেশি বেশি ইংরেজি বলে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। কেননা সম্ভাবনা আছে ঐ স্কলার প্রাচ্যবিদদের লেখা বই পড়তে ভালোবাসেন। কারণ, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা। এটা বাস্তবতাও বটে। কেননা এমন স্কলারদেরকে অনেক সময় প্রাচ্যবিদদের বই থেকে রেফারেন্স দিতেও দেখা যায়।

যারা প্রাচ্যবিদদের বই পড়তে ভালোবাসে, তাদের থেকে ইসলামের অপব্যাখ্যা হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেলিব্রেটিদের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন।

প্রাচ্যবিদদের সফলতার কারণ:
উপরিউক্ত লেখায় প্রাচ্যবিদদের অপব্যাখ্যার কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রাচ্যবিদদের দলিল প্রমাণ এবং আপত্তিগুলো এতো দুর্বল হওয়ার পরও তাদের সফলতার কারণ কী?

কয়েকটি কারণে তারা আজ সফল :
১. মুসলমানদের অজ্ঞতা: অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যার ফলে প্রাচ্যবিদদের অসার যুক্তির সামনে তারা অসহায় আত্মসমর্পণ করে।

২. ইংরেজি ভাষার প্রতি মুগ্ধতা: বর্তমানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মনে করা হয়- যে ইংরেজিতে বিজ্ঞ, সে ততো বড় পণ্ডিত। ফলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মীয় বিষয়াদি ইংরেজিতে পড়তেই ভালোবাসে। ইংরেজিতে লেখা অধিকাংশ বইপত্রই প্রাচ্যবিদদের। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে পাঠক বুঝতেই পারে না- কিভাবে

তাদের মগজ ধোলাই করা হল। বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় ফিতনার কারণ এটিই। কালক্রমে এই মুসলিম শিক্ষার্থীরা অজান্তেই প্রাচ্যবিদদের দাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

৩. আলেম সমাজের নীরবতা:

আফসোসের বিষয়- জাতির কর্ণধার অনেক আলেম প্রাচ্যবাদ কী তা-ই জানেন না! যার কারণ হচ্ছে- অধিকাংশ আলেম ইংরেজি ভাষা জানেন না এবং আরবিতে যে অনুবাদগুলো করা হয়েছে সেগুলো সহজলভ্য হয় না। যারা ইংরেজি জানেন বা আরবি বইগুলো পড়ে প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জেনেছেন, তারা পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, মেহরাব-মিম্বারের খেদমতে, তাবলিগের দায়িত্বসহ সমাজের আরও নানামাত্রিক বিষয়, শাসকদের চক্রান্ত থেকে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের হেফাজত এবং উদ্ভূত বিভিন্ন ফিতনার মোকাবিলা করার পর গ্রন্থাগারে লুকিয়ে থাকা এই ফিতনার মোকাবিলা করার সময় পান না।

যার ফলশ্রুতিতে দিন দিন এ ফিতনা মুসলিমদের মগজে পশ্চিমা বীজ বপন করে যাচ্ছে। তবে প্রাচ্যবাদ নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু লেখক মহোদয় বইপুস্তক লিখে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করার চেষ্টা করছেন। তবে এই লেখাগুলো সাবলীল হওয়া কাম্য। যেহেতু জনসাধারণের জন্য লেখা হচ্ছে, তাই অতিমাত্রায় সাহিত্য প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়।

৪. আরবি ভাষার প্রতি অবহেলা:

আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজীদ আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। মুসলিমদের অবস্থা তো এমন হওয়ার কথা ছিল- তারা শখের বশবর্তী হয়ে আরবি শিখবে। আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিদিন নামাজে যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা শেখাকে গর্বের বিষয় মনে করবে। যারা শিখতে পারেনি তারা আক্ষেপ করবে; হায় যদি শিখতে পারতাম! অথচ বর্তমানে অনারবিদের মধ্যে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া আরবিতে তাফসীর পড়ুয়া লোক পাওয়া ভার।

অনেক স্কলারও নিজ মাতৃভাষায় কুরআন হাদীসের তাফসীর পড়াকে শ্রেয় মনে করেন। অথচ তারাও জানেন- আরবি ভাষা পৃথিবীর সব ভাষা থেকে সমৃদ্ধ। অনেক শব্দ এমন আছে, অন্য ভাষায় যেগুলোর অর্থ পুরোপুরি তোলা যায় না। আবার এমন শব্দের সংখ্যাও কম নয়, যেগুলোর অর্থ তোলা তো সম্ভব, কিন্তু ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব।

প্রাচ্যবিদরা আরবি ভাষা থেকে মুসলমানদের সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে এমন একটা সময় আসবে, যখন কেউ আর আরবি ভাষায় কোরআন হাদীস পড়বে না। সকলেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীসের তাফসীর পড়বে। অনারব দেশ থেকে আরবি ভাষা বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আমরা জানি, আজ থেকে দেড় শতাব্দিকাল পূর্বে ভারত উপমহাদেশে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইংরেজরা হিন্দুস্তানকে মোঘল শাসনের প্রভাবমুক্ত করতে ফারসির ব্যবহার এমনভাবে বন্ধ করেছে যে, বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে দু-একজন ফারসিভাষী খুঁজে পাওয়া ভার।

প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যারা জানেন, তাদের দায়িত্ব হল- অন্যকে জানানো, সতর্ক করা। প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে না জানার ফলে অজান্তেই অনেক মুসলিম ভাই কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করছেন।

বর্তমানে প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদেরকে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছে। এখনই সময় শিকল ভাঙার। মুসলিম জাতি দাসত্বকে মেনে নিতে পারে না।

আমেরিকান প্রাচ্যবিদ তোমাস বিন বলেন- এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, মুসলিমরা আমাদের করায়ত্তে এসেছে। কিন্তু কী হবে যদি তারা পুনরায় জেগে ওঠে?

কেননা মুহাম্মদে আরাবি সা. তাঁর অনুসারীদের বুকে স্বাধীনতার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তা কখনো দাসত্বকে মেনে নেয় না।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে দ্বীন ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জানার এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী: তাকমীল ফিল হাদীস

বর্ষবরণ নাকি বিধর্মীদের মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব

সাইফুল ইসলাম

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির একটি উৎসব। এ দিনে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি এক প্রাণে, এক সুরে এক সাজে মেতে ওঠে উৎসবের আমেজে। কিন্তু নাগরিক জীবনে পহেলা বৈশাখ পালনের যে ধারা আমরা সৃষ্টি করেছি বা করছি, তা আমাদের সংস্কৃতি নয়, নববর্ষ পালনের হাজার বছরের ঐতিহ্য নয়। পহেলা বৈশাখকে তরুণ-তরুণীরা উৎসবের নামে, শোভাযাত্রার নামে যেভাবে অবাধ মেলামেশার উপলক্ষ্য বানিয়েছে, তা কোনোভাবেই মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না। বর্ষবরণের নামে ঐদিন যে শুভযাত্রা বের হয়, সেটা আদৌ শোভাযাত্রা হতে পারে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ যেন হিন্দুদের রথযাত্রা।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকটি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বাহন রয়েছে। যেমন- লক্ষীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস, গণেশের বাহন ইঁদুর, দুর্গার বাহন সিংহ, মনসার বাহন সাপ, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, মহাদেবের বাহন ষাড়, যমরাজের বাহন কুকুর, ইন্দ্রের বাহন হাতি, ব্রহ্মার বাহন পাতিহাঁস, বিশ্বকর্মার বাহন ঢেকি এবং শীতলার গাধা।

পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শুভযাত্রায় বাহারি সাঁজে এসব বাহন দেখা যায়। এটিকে ধর্মীয় কোন দেবতার যাত্রা বলে মনে হয়।

সৈয়দ আবুল কালাম একজন সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। ২০১৩ সালে দৈনিক সমকাল -এর ১লা বৈশাখের ক্রোড়পত্রে ছাপা হওয়া তার লেখার একটা অংশ উদ্ধৃত করছি---

'আমি আমার নিজের শৈশব ও কৈশোরের পহেলা বৈশাখকে যেভাবে দেখেছি, আজকের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সঙ্গে সেই নববর্ষ উৎসবের কোন মিলই নেই। তখনকার নববর্ষ উৎসবের মাঝে ছিল অকৃত্রিম আমেজ। তাতে ন্যূনতম কৃত্রিমতা ছিল না। যা কিছু করা হতো, তা হতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মনের আনন্দে ও অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী আবেগে।

আজ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? পহেলা বৈশাখের সকালে ঘটা করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব বিত্তবান ঘরের মানুষ মাটির শাকনিতে পান্তাভাত, খাট্টা ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, মুড়িঘন্ট, খেজুরগুড়ের ক্ষীর হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে। এই যে রেওয়াজ শুরু হয়েছে, এটা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রবর্তিত আয়োজন। এ জাতীয় বৈষম্যমূলক নোংরা আয়োজন পহেলা বৈশাখ তথা নববর্ষের চিরকালের চেতনাবিরোধী। কারণ এ সমাজের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ খুবই দরিদ্র। তারা ক্ষুধার জ্বালায় পান্তাভাত, পঁচা ডাল ও অখাদ্য জিনিস যা পায়, প্রতিদিন তা-ই খায়। বস্তুত এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকেরা একধরনের সাংস্কৃতিক অপরাধ করে। এসব আচরণের মাধ্যমে তারা আসলে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষকে নিয়ে পরিহাস করে।'

পহেলা বৈশাখের বর্তমান রেওয়াজ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য কোনো মাওলানা সাহেবের মুখ নিঃসৃত নয়। কথাগুলো যিনি লিখেছেন, তিনি কথিত বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করেন। তারপরও সত্য স্বীকার করে তিনি কথাগুলো লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

পাশ্চাত্য ও ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এভাবেই মুসলিম তরুণদের অবাধ নগ্নতার দিকে ঠেলে দিয়ে পথহারা মেষপাল বানিয়ে দিচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে। এই অবাধ মেলামেশার ফলে আমাদের সমাজে নানা প্রকার অবক্ষয়, অপরাধ বাড়ছে। বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতাও। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক আত্মহত্যার ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর প্রধান কারণ হিসেবে ধরা পড়বে নারী-পুরুষের অবাধ ও অবৈধ মেলামেশা।

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের মানুষ যা জানত না, নববর্ষের নামে তা এখন আমাদের সংস্কৃতির অংশ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে সংস্কৃতি কী? সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুঁজলে আমরা দেখতে পাই- একটা জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে, তাই হলো সংস্কৃতি। এ সংজ্ঞামতে বর্ষবরণের নামে প্রচলিত বেহায়াপনা আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না।

ইরানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল কাজে ফার্সি সন ব্যবহার করা হয়। তাদের নওরোজ বা নববর্ষ উৎসব পৃথিবী বিখ্যাত। ইতিহাস ও উৎযাপন সব বিচারেই তা বাংলা নববর্ষের থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু সেই নওরোজ উৎসব পুরোটাই পালিত হয় ইরানী সংস্কৃতিকে ধারণ করে।

এ উৎসবের যেকোনো একটি বিচ্ছিন্ন চিত্র দেখলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ তাকে ইরানের নওরোজ উৎসব বলে চিহ্নিত করতে পারবে।

কিন্তু বাংলা নববর্ষে মুসলিম ছেলেরা ধুতি পরে, ললাটে তিলক এঁকে যেভাবে নাচগান করে, তা দেখে বিশ্ববাসীর বুঝার উপায় থাকে না- এটা আসলে কোন দেশীয় উৎসব। এসব কারণেই বাংলা নববর্ষ পালনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক কর্মী ও অভিভাবকবৃন্দ। বাংলাদেশের বিরানব্বই শতাংশ জনগোষ্ঠি মুসলিম। কাজেই এদেশের নববর্ষ উৎযাপনের রীতি ও পদ্ধতিতে সেই জনগোষ্ঠির বিশ্বাস ও আচারের প্রতিফলন থাকা স্বাভাবিক।

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিতে রবিন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করার কোশেশ করা হচ্ছে সবসময়। ছায়ানট শুরু থেকেই রবীন্দ্র সংস্কৃতির রঙে বাংলাদেশকে সাজাতে চেয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক চেতনা আর বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও তার সাংস্কৃতিক চেতনা এক নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা 'এক মহাভারতের সাগরতীরে' বিলীন হবার। তাও আবার 'এক ধর্মরাজ্য' মহাভারতের রাষ্ট্রভাবনা। বাংলাদেশ বলে আলাদা কোনো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি নেই সেখানে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের ২৫ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আয়োজিত একটি জনসভায় তাঁর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি, সেই সঙ্কল্পটিকে শুদ্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপর স্থাপিত করিতে হইবে। ইহা দেশের পূঁজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।' (রবীন্দ্র রচনাবলী- ৩, অবস্থা ও ব্যবস্থা, ৬৭১ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গভঙ্গের সাতদিন আগে ৯ অক্টোবর ১৯০৫ সালে কোলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাসভবনে রবীন্দ্রনাথ বিজয়া সম্মিলন নামে এক ভাষণে বলেন- "হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলার সর্বত্র প্রেরণ করো। আজ বাংলার সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপর এতক্ষণ যে একাদশীয় চন্দ্রমা জোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ সূচী রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম' গীতধ্বনী একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক। একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হউক পূণ্য হউক
পূণ্য হউক হে ভগবান।

(প্রাগুক্ত, বিজয়া সম্মিলন- ৭৫৯ দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির মূল উপজীব্য হচ্ছে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ। তিনি বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের চেতনা, উপমা, রূপক ও কাহিনী যেভাবে ধারণ করেছেন- তা কোনো মুসলমানের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ইসলামের নির্দেশ। হাজার বছর ধরে এ দেশের হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে এই সহিষ্ণুতার বিরল নজির স্থাপন করেছে। চৈত্র সংক্রান্তি কিম্বা দুর্গাপূজার মেলায় কখনো কোন বাঙালি মুসলিমরা হিন্দুদের বাধা প্রদান করেনি, কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তি বা দুর্গাপূজাকে কোনোদিন মুসলিমরা তাদের সংস্কৃতি বলে মনে করেনি। একইভাবে মুসলমানদের ঈদের মাঠের রাস্তায় হিন্দুরা মিষ্টির দোকান দিয়ে থাকে, চকবাজার থেকে ইফতারীর স্বাদ তারাও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু ঈদ বা রমজানকে কেউ তাদের সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করেনি। আজও তারা শাখারী বাজার, ইসলামপুরের সাথে পহেলা বৈশাখ বা হালখাতা পালন না করে একদিন পর শত শত মাইল দূরের বাগবাজারের সাথে উদযাপন করে। এর মূল কারণ দুইটি পঞ্জিকা। মোহাম্মাদী পঞ্জিকা ও লোকনাথ পঞ্জিকা। আক্ষরিক অর্থে এ শুধু দুই পঞ্জিকার দ্বন্ধ নয়; এর পেছনে রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্ধ। বাঙালিত্বের রাখী বেঁধে তাকে এক করার চেষ্টা আজকের মতোই চলছে বহুকাল ধরে।

আমরা চাই বাংলাদেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির লোকেরা নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রেখেই একসাথে জাতীয় উৎসবগুলো উদযাপন করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠির বৈসাবি উদযাপনকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ তিনটি সম্প্রদায়ই পহেলা বৈশাখকে তাদের নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করে। চাকমারা 'বিজু', মারমারা 'সাংগ্রাই', ত্রিপুরারা 'বৈসু' নামে একইসাথে এ উৎসব উদযাপন করে থাকে। একইসাথে পালনের সুবিধার্থে তারা তিনটি উৎসবের নামের প্রথম বর্ণ নিয়ে 'বৈসাবি' উৎসব নামে একসাথে পালন করে। একই সময়ে সেখানে বসবাসরত বাঙালিরা নববর্ষ পালন করে থাকে। একই লাইনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রায় শামিল হয়। তবে একই সাথে পালন করলেও উদযাপনরীতি ও আচারে তারা নিজ নিজ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে থাকে।

ইসলাম ধর্মে শিরক ও পৌত্তলিকতা হারাম। নববর্ষ উদযাপনের নামে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে শিরকের অনুপ্রবেশ আমরা কখনো মেনে নেবো না। আমাদের জাতীয় দিবস ও উৎসবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও চেতনার প্রতিফলন ঘটুক- এটাই আমাদের চাওয়া।

লেখক: শিক্ষার্থী, তাকমীল ফিল হাদীস

ইমরান হাসিব

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। মানুষের চিন্তা বিশ্বাস সফলতা ব্যর্থতা আর সংস্কৃতির চিত্র ফুটে ওঠে সাহিত্যে। আমাদের প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন- আরবের সব চেয়ে বিশুদ্ধভাষী- সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য চৌদ্দশ' বছর থেকে আরবি সাহিত্যে দেদীপ্যমান। আলিম সমাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী। রাসূল সা. বলেন- নিশ্চয়ই আলিম সমাজ আম্বিয়া আ. 'র ওয়ারিস (সহীহুল বুখারি)। তাই, যুগে যুগে উম্মাহর বরিত আলেম সমাজ নবিজির পথরেখা অনুসরণ করে স্বজাতির ভাষা-সাহিত্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার প্রমাণ হল- আরবি উর্দু ফার্সি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভারের রচয়িতা আমাদের গর্বের ধন উলামায়ে কেরাম। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়ও আলেমগণ তাদের রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে অবদান রেখেছেন।

এক সময় বাংলাভাষী আলেম ছিলেন মুষ্টিমেয়। তারা মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে কর্মমুখর জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই, বাংলা সাহিত্যের ময়দানে আলেম সমাজের পদচারণার সুন্দর কোনো ইতিহাস আমাদের সামনে নেই।

১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশ। সে সময় ভাষা সংগ্রামের রাজপথে মুসলিমদের তাজা খুনে ইতিহাস রচিত হয়। সুখের কথা হলো- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রথম কথা বলেন একজন আলিম- মাওলানা আতহার আলি রাহ.। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের গর্ব ও গৌরবের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম একই দাবী জানায়-

'ঐতিহাসিক দলিল মতে, ১৯৫২ 'র ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ কিশোরগঞ্জের হজরত নগরে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সম্মেলন। এই সম্মেলনে সর্ব মহলের আলেমগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ মার্চ ছিল কাউন্সিল। সভাপতি মাওলানা আতহার আলি। এই কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাদির একটি ছিল- "চতুর্থ প্রস্তাব: খ. পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের এই সম্মেলন পাকিস্তান গণ পরিষদের নিকট দৃঢ়তার সহিত দাবি জানাইতেছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হোক।"(আমার ধর্ম আমার গর্ব- যাইনুল আবেদীন)

তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের ময়দানে আলেমদের বিচরণ বাড়তে থাকে ক্রমশ। তারা বাংলা ভাষাকে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন থেকে আলেমদের রচিত দ্বীনি বইপত্রে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। তাই আমরা দেখি- তাদের রচিত সাহিত্য বাংলা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছে দ্বীনের জ্যোতি আর কালের পর কাল বাংলাভাষী মুসলিমদের আলোকিত, আলোড়িত করেছে ইসলামের আদর্শ শিক্ষায় ও শির উঁচুকরা চেতনায়। উপমা হিসেবে কয়েকজন আলেমের নাম বলছি -যাঁদের কলম চর্চায় ধন্য-সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য- মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি, মাওলানা আতহার আলি, মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমি, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা আজীজুল হক, অধ্যাপক আখতার ফারুক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখ। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি অনূদিত বেহেশতি জেওর আর তাঁর শিষ্য শাইখুল হাদীস আজীজুল হক রাহ. 'র সহীহুল বুখারির বঙ্গানুবাদ বাংলা সাহিত্যের গৌরবের প্রতীক।

বাংলা সাহিত্যে বর্তমান আলেম সমাজের কীর্তি আরও প্রোজ্জ্বল। তাঁরা ঢেউ তোলা গদ্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন দ্বীনের প্রয়োজনীয় সব গ্রন্থ রচনা করে। তাদের রচিত সাহিত্যের পরশে ধন্য হচ্ছে মুসলিম-অমুসলিম। এই কাফেলার কয়েকজন হলেন- আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, আবু তাহের মিসবাহ, উবায়দুর রহমান খাঁন নদভি, ফয়সল আহমদ জালালি, মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, শরীফ মুহাম্মদ প্রমুখ।

বলতে দ্বিধা নেই– প্রচলিত ধারায় সাহিত্যের বাহন হচ্ছে নারী, প্রেম আর জীবনের খন্ড অংশ। প্রেম শিশুর কাছে সুঁড়সুঁড়ি, যুবকের কাছে উন্মত্ততা আর অতীতের স্মৃতি। আজকের সাহিত্য প্রেম, নারী আর টাকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। অথচ আলেম সমাজের সাহিত্যের বাহন আল্লাহর সাথে প্রেম-ভালোবাসা। কেননা, আল্লাহর প্রেম মানুষকে সত্য সুন্দরের পথ দেখায়। সুখী জীবনের সন্ধান দেয়। বড় কথা হলো- নারীর প্রেমের সাথে আল্লাহর প্রেম মুহাব্বাত ও ভালোবাসার তুলনা হতে পারে না।

আলেম সমাজের সাহিত্যের উপমা হিসেবে একটি গ্রন্থের কথা বলি– ফাজায়েলে আমল- গ্রন্থটি সচেতন মুসলিমদের সেলফের শোভা বর্ধন করে। বিশ্বের প্রায় সবকটি ভাষায়ই অনূদিত হয়েছে বরিত শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রাহ.'র এই গ্রন্থটি। দেখা গেছে, এই বই যে-ই পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বদলে যায়। যে দস্যি ছেলেটি পুরো মহল্লাকে আতঙ্কিত করে রাখত, সে-ই হয়ে ওঠে সকল আতঙ্কগ্রস্থের আশ্রয়স্থল। প্রতারক ফাঁকিবাজ এই বইয়ের ছোঁয়া পেতেই কেমন নিজের সম্পদের চাইতে অন্যের অধিকারের প্রতি হয়ে উঠে অধিক যত্নবান। এই হলো সম্মানিত আলেম সমাজের সাহিত্য কীর্তি। আর বিকৃত চিন্তার সাহিত্যিকদের সাহিত্য প্রেম, পরকীয়া, যৌনতা এবং স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসের রসদে পূর্ণ থাকে। যার পরিণতিতে সমাজ ধ্বংস হয়। যুবকেরা অসুস্থ চিন্তায় মজে থাকে।

আলেম সমাজের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে মাদরাসা পড়ুয়া তরুণদের সত্য সুন্দর সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য চাই- আস্থাভাজন আলেমের সান্নিধ্যে নিজেকে সমর্পণ আর নিরবচ্ছিন সাধনা। তাহলে বাংলা সাহিত্যে আলেম সমাজের ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল হবে।

শিক্ষার্থীঃ তাকমীল ফিল হাদীস

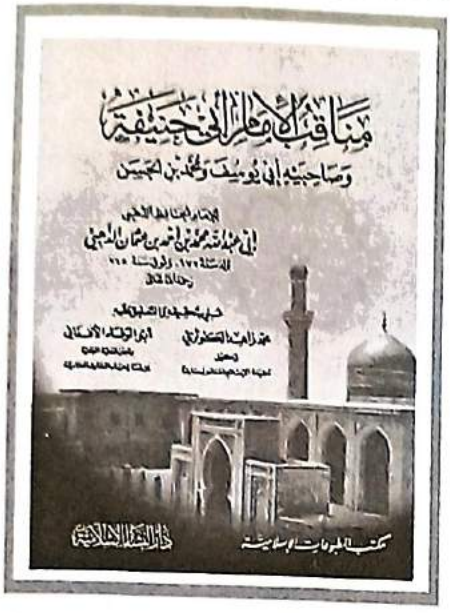

ইলমুল হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা রাহ.

|হাফিয জাহেদ আহমদ

সমাজের অধঃপতনের সময় আলোকবর্তিকা হয়ে যে সকল মনীষী পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও ক্ষমতার মোহ যাঁদেরকে ন্যায় ও সত্যের আদর্শ থেকে বিন্দু মাত্র টলাতে পারেনি, যারা অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেনি, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণে সারাটা জীবন যাঁরা বিলিয়ে দিয়েছেন, সত্যকে আঁকড়ে ধরার কারণে যাঁরা জালেম শাসক কর্তৃক অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছেন ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁদের অন্যতম।

জন্মঃ ইমাম আবু হানীফা রাহ. ৮০ হিজরি সনে ইলমের নগরী কুফা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

কুফা শহরের ইলমি অবস্থানঃ

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতকালে ১৭ হিজরি সনে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. কর্তৃক ক্বাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে এই কুফা শহর মুসলমানদের হাতে আসে। ইসলামের সুমহান আদর্শ দেখে সেখানকার মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত ওমর রাযি. সেখানকার নও মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মনোযোগি হন। সাহাবিদের বিরাট এক জামাতকে তিনি কুফায় স্থানান্তর করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে সেখানকার মুআল্লিম বানিয়ে প্রেরণ করে কুফাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وقد أثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي

আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ব্যাপারে নিজের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি। (ফিক্বহু আহলিল ইরাক পৃ.৩৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কুফায় শিক্ষকতা শুরু করলেন। সেখানকার লোকেরা তার কাছ থেকে কুরআন, হাদীস ও ফিক্বহ শিক্ষা করে। হাদীস, ফ্বিকহ ও কুরআনে ইবনে মাসউদ রাযি. এর পান্ডিত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাইতো ওমর রাযি. তাঁর সম্পর্কে বলেন-

كنيف ملئ فقها وفي رواية علما

ইলম- ফিক্বহে পরিপূর্ণ এক জ্ঞানের আধার। (ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ.৩৭)। এই মহান সাহাবি কুফা শহরকে কুরআন হাদীস ও ইলমে ফিক্বহ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটা বিরাট দল তৈরি করেন যারা সবসময় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আল্লামা যাহিদ কাওসারি রাহ. তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। (ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম পৃ.৩৮)

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. ছাড়া অন্য ফক্বীহ সাহাবিগণও কুফায় এসে বসবাস শুরু করেন। যেমন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু মুসা আশআরি, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাযি. প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছাড়াও হাজার হাজার সাহাবি কুফায় বসবাস করতেন। এমনকি কুফায় স্থায়ী বসবাসকারী সাহাবিদের সংখ্যা ইমাম ইজলি রহ. দেড় হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে ৭০ জন বদরি সাহাবি। এ সংখ্যায় সে সকল সাহাবি অর্ন্তভুক্ত নন, যাঁরা কুফায় সাময়িকভাবে আগমন করেছেন, অতঃপর অন্যত্র স্থানান্তর হয়েছেন। (ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ. ৪১)

স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সাহাবিদের এত বড়সংখ্যার উপস্থিতিতে ইলমের কী পরিমাণ চর্চা হয়ে থাকবে। অতঃপর যখন হযরত আলি রাযি. কুফাকে স্বীয় দারুল খেলাফত বানান, তখন ইলমের এ চর্চা প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হয়ে বলেন-

رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علما

আল্লাহ তাআলা উম্মে আবেদের ছেলের (আবাদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) উপর অনুগ্রহ করুন। তিনি এ শহরকে ইলম দ্বারা ভরে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন-

أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية

ইবনে মাসউদ রাযি. এর ছাত্ররা এই শহরের প্রদীপতূল্য (ফিক্বহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম পৃ. ৩৮)

হযরত আলি রাযি. কুফায় আগমন করার পর সেখানকার ইলমি উন্নতি ও প্রসিদ্ধি আরও বাড়তে লাগল। কেননা তিনি নিজেও একজন ফকীহ মুজতাহিদ সাহাবি। ইবনে মাসউদ রাযি. এর সাথে হযরত আলি রাযি. এর ইলম মিলিত হয়ে কুফার ইলমি অবস্থান অন্য সকল শহর থেকে আরও উর্ধ্বে উঠে যায়। কারণ, এই দুই ব্যক্তিত্ব সাহাবায়ে কেরামের সমস্ত ইলমের সারাংশ ছিলেন। মাসরুক ইবনুল আজদা রাহ. বলেন-

وجدت علم أصحاب محمد ص ينتهي إلى ستة: إلى علي، وعبد الله، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ابن كعب ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى علي، وعبدالله.

আমি সাহাবায়ে কেরামের ইলমের উপর অনুসন্ধান আরম্ভ করলে তাঁদের সকলের ইলম ছয় মনীষী- হযরত আলি, ইবনে মাসউদ, উমর, যায়েদ বিন সাবিত, আবু দারদা, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর নিকট পেলাম। তারপর উক্ত ছয়জনের ইলম আলি ও ইবনে মাসউদ রাযি. এর মাঝে সীমাবদ্ধ পেলাম। হযরত মাসরুক রহ. এর ভাষ্য অনুযায়ী হযরত আলি এবং ইবনে মাসউদ রাযি. উভয়ে মিলে সাহাবায়ে কেরামের ইলমের সমন্বয়কারী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে কুফায় অবস্থান করেছিলেন। তাই বলা যায়- কুফায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ইলম একত্রিত ছিলো। এর ফলাফল এই ছিলো যে, সেখানকার ঘরে ঘরে হাদীসের চর্চা হত এবং প্রতিটি মহল্লা ইলমে হাদীসের দরসগাহে রূপ নিয়ে ছিল। যেমন আবু মুহাম্মদ আর-রামা হুরমুযি الحد الفاصلনামক গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে সীরীন রাহ. এর বক্তব্য নকল করে বলেন-

عن أنس بن سيرين قال: أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث وأربع مائة قد فقهوا

আমি কুফায় আগমন করলাম। তথায় চার হাজার মানুষকে হাদীস অন্বেষণ করতে দেখলাম। চারশতকে দেখলাম তারা ফকীহ হয়ে গেছে। (ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ. ৪৯)

লক্ষ করে দেখুন, সেখানকার ইলম চর্চার কী অবস্থা ছিল? আমরা যদি শুধুমাত্র বুখারি শরীফের রিজালকে দেখি তাহলে দেখব- কুফার অধিবাসী তিনশত এর কাছাকাছি ছিলেন। ইমাম বুখারি রাহ. বারবার কুফায় সফরও করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা ও ইলমে হাদীস:

ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইলমের নগরী কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেন। যা ইলমের প্রাণ কেন্দ্র এবং কুফায় তিনি লালিত-পালিত হন এবং এখানকার শায়েখগণের নিকটেই তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। যেহেতু সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে তাঁর থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই, তাই কোনো কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি ইলমে হাদীসে দুর্বল ছিলেন। এটি চরম ভ্রান্তি, ভিত্তিহীন অপবাদ। বাস্তবতা এই যে, সিহাহ সিত্তায় ইমাম শাফিয়ি রাহ. এর কোন রেওয়ায়ত বর্ণিত নেই। এমন কি ইমাম আহমদ রাহ. যিনি ইমাম বুখারি রাহ.এর বিশিষ্ট উস্তাদ তাঁর হাদীসও বুখারি শরীফে মাত্র তিন-চার স্থানে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম মালেক রাহ.এর রেওয়ায়তও হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। তার কারণ এই নয় যে, তাঁরা ইলমে হাদীসে দুর্বল ছিলেন। বরং কারণ হলো তাঁরা ছিলেন ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাদের কাজ ছিলো আহকাম ও মাসায়েল বর্ণনা করা। তাঁদের হাজার হাজার ছাত্র ও অনুসারী ছিল। তাই সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থকারকগণ মনে করেছেন যে, তাদের ইলম সমূহ তাদের ছাত্রদের মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে। তাই তাঁরা ঐ সকল ব্যক্তিদের ইলম সংরক্ষণ করেছেন যেগুলো ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। নতুবা ইলমে হাদীসের সাথে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সম্পৃক্ততা সর্বজন স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য বিষয়। কেননা মুসলিম উম্মাহর সকলেই ইমাম আবু হানীফা রহ. ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, এমনকি সুফিয়ান সাওরি রাহ. তার সম্পর্কে أفقه أهل الأرض বলে মন্তব্য করেছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ.أفقه الناس বলে (তাঁর সম্পর্ক) মন্তব্য করেছেন। তাঁর ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি উঁচু মাপের একজন মুহাদ্দিসও ছিলেন। কেননা ফকীহতো তিনিই, যিনি কোরআন, হাদীস, আসারে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মত থেকে মাসআলা-মাসাঈল বের করতে সক্ষম। একজন মানুষ ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যে, ইলমে হাদীসের ব্যাপারে তার পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। যদি ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফা রাহ.র দুর্বলতা থাকতো, তাহলে তিনি কিভাবে মুজতাহিদ হতে পারেন? হাদীসতো ফেক্বহের অন্যতম উৎস। এজন্য ইমাম আবু হানীফা রাহ. কে ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে মেনে নিতে মুহাদ্দিস হওয়া অপরিহার্য বিষয়। হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় আলেম তাঁর সুবিশাল মর্যাদা মেনে নিয়েছেন। এখানে কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো-

(১) মক্কী ইবনে ইবরাহীম (ইমাম বুখারির শায়খ) বলেন-

عن مكي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.

ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁর যুগের সেরা আলেম ছিলেন (মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা ফিল হাদীস পৃ. ৯৫)

(২) শাদ্দাদ ইবনে হাকীম রাহ. বলেন ما رأيت أعلم من أبي حنيفة - ইমাম আবু হানীফা থেকে আমি বড় কোনো আলিম দেখিনি (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা পৃ. ৯৫)

(৩) খতীব বাগদাদি রাহ. তাঁর "তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে খালাফ বিন আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেন-

قال خلف بن أيوب: صار العلم من الله تعالى إلى محمد ص ثم صار إلى أصحابه ثم صار إلى التابعين، ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه، فمن شاء ليرض ومن شاء فليسخط.

ইলম আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মদ সা. এর নিকট এসেছে, অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের নিকট, অতঃপর তাবেয়ীনদের নিকট এরপর আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের নিকট। বাস্তবতা এটিই এতে কেউ সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা পৃ. ৩৩)

(৪) সাঈদ ইবনে আবী আরুবা রা. বলেন-

كان أبو حنيفة عالم العراق

ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইরাকের আল্লামা ছিলেন। (আল ইনতিকা পৃ.২০১)

(৫) হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রাহ. বলেন-

والله إني لأحب أبا حنيفة لحبه أيوب وروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة

আল্লাহর কসম আমি ইমাম আবু হানীফা রাহ.কে ভালবাসি। কারণ, তিনি আইয়ুবকে ভালবাসেন। হাম্মাদ বিন যায়েদ ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল ইনতিকা পৃ. ২০১)

(৬) আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা রাহ. বলেন-

قال يزيد بن كميت قال لي شريك في حديث ذكره قال ابن شبرمة عجزت النساء أن تلد مثل النعمان

ইয়াযিদ ইবনে কুমাইত বলেন, শারীক রাহ. হাদীস বর্ণনাকালে আমাকে বলেছেন, ইবনে শুবরুমা রাহ.বলেন- নোমান (তথা ইমাম আবু হানীফা রহ.) এর মত ব্যক্তি প্রসব করতে মহিলারা অক্ষম হয়ে গেছে। (আল ইনতিকা পৃ. ২০২)

(৭) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেন-

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ.

আবু হানীফা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কেবল মুখস্ত হাদীসগুলোই রেওয়ায়াত করতেন। হাদীস মুখস্ত না করে রেওয়ায়েত করতেন না।

(৮) সালেহ ইবনে মুহাম্মদ বলেন রাহ–

وقال صالح بن محمد الأسدي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث.

আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ.কে বলতে শুনেছি। ইমাম আবু হানীফা রাহ. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

(৯) আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রাহ. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. থেকে বর্ণনা করেন-

قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين: كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب.

আমাদের নিকট ইমাম আবু হানীফা রাহ. সত্যবাদী ছিলেন। মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নন। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা ফি ইলমিল হাদীস পৃ.৯০)

১০. মিছআর ইবনে কিদাম রাহ. বলেন–

رحم الله أبا حنيفة إنه كان فقيها عالما.

আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ছিলেন ফকীহ ও বড় আলেম। (আল ইনতিকা পৃ. ১৯৫)

১১. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বলেন-

لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

যদি আল্লাহ পাক ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরি রাহ. দ্বারা আমাকে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো হতাম। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা পৃ. ৯৪)

১২. যুহাইর ইবনে মুআবিয়া রাহ. বলেন-

قال علي بن الجعد: كنا عند زهير بن معاوية فجاءه رجل فقال له زهير: من أين جئت؟ فقال من عند أبي حنيفة فقال زهير: إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوما واحدا أنفع لك من مجيئك إلي شهرا.

আলি ইবনে জা'দ বলেন আমরা যুহাইর বিন মুআবিয়ার কাছে ছিলাম এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এলো। তিনি তাকে বললেন তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো- ইমাম আবু হানীফার কাছ থেকে। তখন যুহাইর বিন মুআবিয়া বললেন- ইমাম আবু হানীফার রাহ.'র কাছে তোমার একদিন যাওয়া আমার কাছে একমাস আসার চেয়ে বেশি উপকারী। (আল ইনতিকা পৃ. ২০৮)

১৩. ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন-

قال روح بن عبادة كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومائة فقيل له مات أبو حنيفة فقال رحمه الله لقد ذهب معه علم كثير.

রাওহ বিন উবাদা বলেন, আমি ১৫০ হিজরিতে ইবনে জুরাইজ এর নিকট ছিলাম। তাকে বলা হল, ইমাম আবু হানীফা মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। নিশ্চয় তাঁর সাথে অনেক ইলম চলে গেছে। ইবনে আব্দুল বার রাহ. তাঁর

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء

নামক গ্রন্থে- ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে উচ্চ মন্তব্য করেছেন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা সর্বমোট ৬৭ জনে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. আরও ৩ জন বাড়িয়ে মোট ৭০ জনে পৌঁছিয়েছেন। এরপর তিনি এ ব্যাপারে একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর প্রশংসাকারী ৭০ জন তাদের প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধ বড় বড় ইমাম। ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইলম, আমানতদারি, তাকওয়া আর দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর ইমামতি প্রমাণের জন্য তাঁদের পাঁচ/দশজনের প্রশংসাই যথেষ্ট। এই সত্তরজন এমন মানুষ তাঁরা যদি কারও ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, তা হলে অনায়াসে তাঁদের কথা মানতে হবে। আর তাঁদের বিরোধীদের কথা দ্বিধাহীন ভাবে ছুড়ে ফেলা হবে। উসূলে হাদীসের প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো- যদি কোনো দুর্বল রাবীকে দুজন সিক্বাহ রাবী সত্যায়ন করেন, অথবা তাদের থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তিনি সিক্বাহ বা বিশ্বস্ত হয়ে যান। (আল ইনতিকা পৃ. ২৩০ টিকা দ্র.)

এখন চিন্তা করুন এই উম্মতের বিরাট একদল মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ ও ইমাম আবু হানীফা রাহ.হাফিজুল হাদীস হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. জারহ ও তাদীলের ইমাম:

ইমাম আবু হানীফা রাহ. যে শুধুমাত্র একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন তা ই নয়; বরং হাদীস যয়ীফ ও সহীহ এবং রাবীগণের জারহ- তাদীলের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতও উসূলবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য। ইমাম যাহাবি রাহ. তার অমর গ্রন্থ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل এ বলেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগ শেষ হওয়ার পর যারা সর্ব প্রথম জারহ, তাদীল করেছেন তারা হলেন ইমাম শাবি, ইবনে সীরীন প্রমুখ। তাঁদের থেকে অনেকের তাযয়ীফ সংরক্ষিত আছে। তবে তাঁদের যুগে যয়ীফ/দুর্বল বর্ণনাকারী কম পাওয়ার কারণ হলো- দুর্বলদের অনুসরণ কম করা হতো। কেননা অনুসৃত বেশির ভাগই ছিলেন সাহাবি। সাহাবি ছাড়া যাঁরা অনুসৃত ছিলেন, তাদের অধিকাংশ ছিলেন নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এক দুইজনের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, হারিস ও আসিম ইবনে জামরা প্রমুখ। তবে ১৫০ হিজরির দিকে যখন তাবেয়িনদের যুগ শেষ হয়ে যায়, তখন উম্মতের মহান

মনীষীরা তাওসীক ও তাযয়ীফ নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তখন ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন– مارأيت أكذب من جابرالجعفي জাবির জুফি থেকে অধিক মিথ্যাবাদি আমি আর কাউকে দেখিনি। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা ফিল হাদীস পৃ.৭২-৭১) দেখুন, ইমাম যাহাবি রাহ. তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী নন; তবুও তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহ. -কে জারহ ও তাদীলের ইমামগণের প্রথম সারিতে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আব্দুল কাদির কুরাশি রাহ. তাঁর الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, নিশ্চয় ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর কথা জারহ ও তাদীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হতো এবং আলেমগণ এই শাস্ত্রে তাঁর কথা গ্রহণ করে আমলে নিয়েছেন। যেমন- ইমাম আহমদ, বুখারি, ইবনে মাঈন, আলি ইবনে মাদীনিসহ অন্যদের কথা গ্রহণ করা হয়। আর এগুলো ইমাম আবু হানীফা এর উচ্চ মার্যাদা ও তাঁর ইলমের ব্যাপকতার উপর দালালত করে। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা .পৃ. ৭৪) ইমাম তিরমিযি রাহ. কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেন-

حدثنا محمود بن غيلان عن يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح

মাহমুদ বিন গায়লান ইয়াহইয়া হিম্মানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি আবু হানীফা রাহ. -কে বলতে শুনেছি- আমি জাবির জুফি থেকে অধিক মিথ্যুক আর কাওকে দেখিনি আর আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি।

আবু সাদ সাগানি বলেন-

قال عبد الحامد الحماني سمعت أبا سعد الصغاني وقام إلى أبا فقال : يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ قال أكتب عنه فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث وحديث جابر الجعفي.

আব্দুল হামিদ হিম্মানি বলেন- আমি আবু সাদ আস সাগানিকে আবু হানীফা রাহ. কাছে দাঁড়িয়ে আবু হানীফাকে প্রশ্ন করতে শুনেছি- সুফিয়ান সাওরি থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তার থেকে হাদীস লিখুন। কেননা তিনি সিক্বাহ। তবে আবু ইসহাকের সূত্রে হারিছ থেকে এবং জাবির জুফির হাদীস থেকে বিরত থাকুন। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা পৃ.৭৪)

তালাক ইবনে হাবীবের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা বলেন- طلق بن حبيب كان يرى القدر তালাক ইবনে হাবীব কাদরিয়্যা ছিলেন।

যায়েদ বিন আইয়্যাশের ব্যাপারে বলেন- زيد بن عياش ضعيف যায়েদ বিন আইয়্যাশ যয়ীফ বা দুর্বল ছিলেন। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা পৃ.৭৪)

আতা রাহ. এর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ.বলেন-

ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح

আমি আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে উত্তম আর কাউকে দেখিনি।

রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদিতে আবু হানীফা রাহ. এর সর্ম্পকে আরো বর্ণিত, যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মর্যাদা ইলমে হাদীসে কতটুকু।

তাবেয়ি ইমাম আবু হানীফা রাহ.:

ইমাম আবু ইসহাক ফিরুজাবাদি রাহ. বলেন- ইমাম আবু হানীফা রাহ. চারজন সাহাবিকে দেখেছেন- আনাছ বিন মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, সাহল ইবনে সাদ, আবুত তোফায়েল রাযি. কাজি জামালুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ বিন সিরাজ রাহ. বলেন- ইমাম আবু হানীফা রাহ. ৭ জন সাহাবিকে দেখেছেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। (মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা রাহ. পৃ. ১০৬-১০৫)

ইবনে কাসীর রাহ. তার البداية والنهاية নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রাহ. ৭ জন সাহাবিকে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। (২য় খন্ড পৃ. ১৫১৩)

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাবেয়ীনদের গৌরবময় কাফেলার অন্যতম একজন সদস্য।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.'র হাদীস বর্ণনার শর্ত: ইমাম আবু হানীফা মূলত ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করতেন, যেগুলো ফিক্বহের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মতে হাদীস বর্ণনার জন্য শর্ত হল হাদীসটি শুনা থেকে নিয়ে বর্ণনা পর্যন্ত মুখস্থ থাকতে হবে; নতুবা হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নয়। দেখুন না হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর শর্ত কত কঠিন। পরিশেষে বলতে হয় যারা ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ব্যাপারে বলেন যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন এবং তাঁর নামে অযথা ভিত্তিহীন কথা বলে বেড়ান, তাদের জন্য আফসোস করা ছাড়া আর কী করার আছে। কেননা অন্ধকে সূর্যের আলোর বর্ণনা দেওয়াতে কোনো ফায়দা নেই। সর্বশেষ বলতে চাই- ইমাম আবু হানীফা রাহ. ছিলেন হাফিযুল হাদীস, মুজতাহিদ, ফক্বীহ, সরফ শাস্ত্রের সংকলক।

হাদীস শাস্ত্রে সর্বপ্রথম ফিকহের তারতীবে লিখিত গ্রন্থ কিতাবুল আছার এর রচয়িতা। যুহদ তাক্বওয়া ও ইবাদাতে জামানার সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি হলেন ইমাম আবু হানীফা রাহ.। তাইতো ইমাম আবু হানীফার এই অসাধারণ খেদমতের কারণে আব্দুল্লাহ বিন খরাইরি বলেছেন যে, মানুষের জন্য উচিৎ হলো, প্রত্যেক নামাযের পরে ইমাম আবু হানীফা রাহ.'র জন্যে দোয়া করা। কেননা তিনি মানুষের জন্য ফিক্বহ ও সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ২য় খন্ড পৃ. ১৫১৩)। কিন্তু আজ আমাদের কিছু লোকেরা ইমাম আবু হানীফাকে গালি দিয়ে তার শুকরিয়া আদায় করছে! এটাও কিন্তু কেয়ামতের একটি আলামত। একটি আলামত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসে আছে- ولعن آخر هذه الأمة أولها পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিসম্পাত করবে। (তিরমিযি ২য় খন্ড)

আল্লাহই জানেন, সেই সময় এসে গেলো কি না । আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুক। আমীন!

লেখক: শিক্ষার্থী, তাকমীল ফিল হাদীস

(প্রবন্ধ)

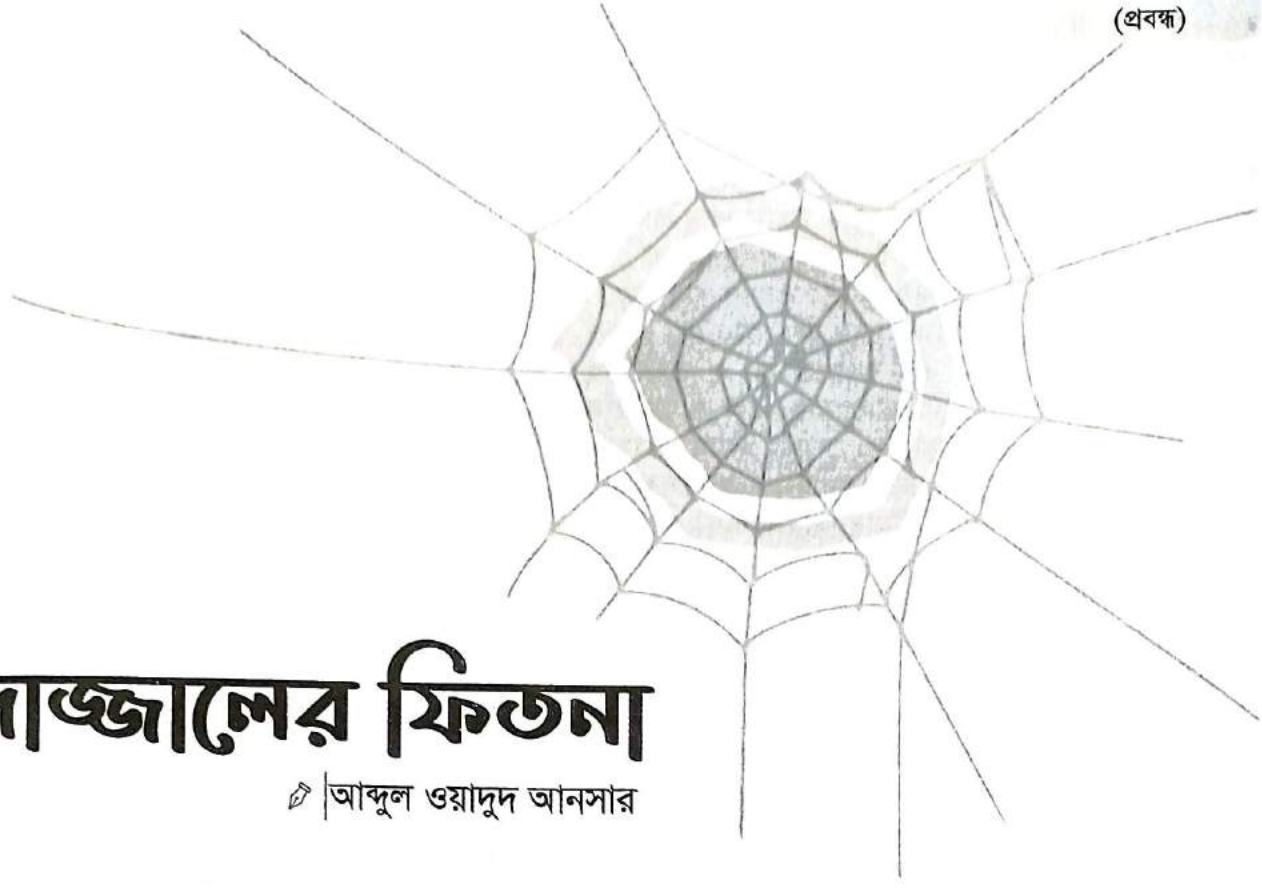

দাজ্জালের ফিতনা

আব্দুল ওয়াদুদ আনসার

সায়্যিদুনা আদম আ. এর মাধ্যমে পৃথিবীতে শুরু হয় মানবজাতির পথ চলা। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব জাতি যত বড় বড় ফিতনার শিকার হবে তার মধ্যে সবচে বড় হলো দাজ্জালের ফিতনা। মানবজাতি এর চেয়ে বড় কোনো ফিতনার সম্মুখীন হবে না। রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال

আদম আ. এর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ফিতনার আবির্ভাব হবে না। (সহীহ মুসলিম: ২৯৪৬)

এ জন্য সকল নবি তার উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তবে রাসূল সা. দাজ্জালের সর্বগ্রাসী ফিতনা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করেছেন। সহীহ বুখারিতে এসেছে- একবার রাসূল সা. দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

إني لأنذركموهُ وما من نبي إلاَّ وقد أنذرَ قومَهُ ولقد أنذرَهُ نوحٌ قومَهُ ولكن سأقولُ فيهِ قولاً لم يقلْهُ نبي لقومِهِ تعلمونَ أنَّهُ أعورُ ، وإنَّ اللهَ ليسَ بأعورَ-

তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করছি। প্রত্যেক নবিই আপন উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তবে আমি দাজ্জালের ব্যাপারে এমন একটি কথা জানাচ্ছি, যা কোন নবি তার উম্মতকে জানাননি। নিশ্চই দাজ্জাল হবে কানা, আর আল্লাহ তায়ালা কানা নন। (সহীহ বুখারি: ৭১২৭)

কে এই মাসীহে দাজ্জাল? ইমাম ইবনুল আসীর রহ. বলেন- মাসীহ মানে– যার চেহারার এক অংশ মুছে ফেলা হয়েছে। যেখানে চোখও নেই, ভ্রুও নেই। আর দাজ্জাল মানে হলো কাযযাব বা মিথ্যুক। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, দাজ্জালকে দাজ্জাল বলার কারণ হলো- সে মিথ্যা দিয়ে হক্বকে ঢেকে রাখে।

দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য : রাসূল সা. দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية

মোটা এক ব্যক্তি, লাল রঙের কোঁকড়ানো চুল, তার চোখ হবে কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের মত। (সহীহ বুখারি: ৭১২৮)

সুনানে আবি দাউদ ও মুসনাদে আহমদে সহীহ সনদে এসেছে রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

إن مسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء

দাজ্জাল দৈর্ঘ্যে হবে খাটো, হাঁটার সময় তার দু'পায়ের মাঝে ফাঁক থাকবে, চুল কোঁকড়ানো হবে, এক চোখ কানা হবে, সেটি যেন মুছে ফেলা হয়েছে। সেটি বাইরের দিকে ফোলাও নয় আবার কোঠরাগতও নয়। (আবু দাউদ: ৪৩২০)

দাজ্জালের আলামত: দাজ্জালের একটি উল্লেখযোগ্য আলামত হলো তার দুই চোখের মাঝে কাফির লেখা থাকবে। সকল মুমিন তা দেখতে পাবে। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন-

وان بين عينيه مكتوب كافر

তার দুই চোখের মাঝে কাফির লেখা থাকবে। (সহীহ বুখারি: ৭১৩১)

প্রিয় পাঠক! অনেক ভ্রষ্ট লোক দাবি করে দাজ্জাল কোনো ব্যক্তি নয়; বরং দাজ্জাল হলো বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা। এই সভ্যতা যেহেতু কেবলমাত্র বাতিলকে চোখে দেখে,

হক্বকে চোখে দেখে না। তাই রাসূল সা. তাকে রূপকার্থে কানা বলেছেন। এমন ভ্রষ্ট ধারণা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। নিঃসন্দেহে দাজ্জাল একটি শরয়ি ফিতনা, এটা একজন মুমিনের আকীদা।

দাজ্জালের ভয়াবহ ফিতনা : দাজ্জালের ফিতনা এত ভয়াবহ যে তার ফিতনায় পড়ে ঈমান হারাবে অগণিত বনি আদম। সে নিজেকে রব দাবী করবে, ইলাহ দাবী করবে। আর রব কখনো কানা হতে পারেন না। দুনিয়ায় আল্লাহকে দেখা যায় না। এই কানা বেঁটে লোকটি কীভাবে রব হতে পারে। এত স্পষ্ট আলামত থাকার পরও মানুষ তার সম্পদ, শক্তি ও পরাক্রম দেখে ধোঁকায় পড়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে এক আশ্চর্যজনক শক্তি দান করবেন।

তার শক্তি ও পরাক্রম :

১. দাজ্জাল প্রচণ্ড গতিতে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করতে পারবে। রাসূল সা. তার গতি সর্ম্পকে বলেন-كالغيث استدبرته الريح
বাতাসের ধাওয়া খাওয়া মেঘমালার ন্যায় তার গতি হবে। (সহীহ মুসলিম: ২৯৩৭) পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে সে পদার্পণ করবে। তবে মক্কা ও মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি সে চায় তাহলে ফেরেশতারা তার পথ রোধ করে দাঁড়াবেন। তার আবির্ভাবের দিনগুলোতে চর্তুদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে। দাজ্জাল তার অঢেল সম্পদ ও খাদ্য শস্য দিয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির লোকদের ঈমান কেনার চেষ্টা করবে।

২. তার কাছে দু'টি প্রবাহমান নদী থাকবে। একটিকে বলবে জান্নাত আর অন্যটিকে জাহান্নাম; যা দিয়ে সে লোকদেরকে ফিতনায় ফেলবে। আসলে তার জান্নাত হলো জাহান্নাম আর জাহান্নাম হলো জান্নাত।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

معه نهرانِ يجريان ، أحدُهما رأيَ العينِ ماءٌ أبيضُ ، والآخرُ رأيَ العينِ نارٌ تأجَّجُ ، فإمَّا أدْرَكَهُنَّ ، واحدٌ منكم ، فلْيَأْتِ النهرَ الذي يراه نارًا ، ثُمَّ لْيَغْمِسْ ، ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رأسَهُ فيَشْرَبُ ، فإنَّه ماءٌ باردٌ

দাজ্জালের কাছে দু'টি প্রবাহমান নদী থাকবে। একটিকে চোখের দেখায় স্বচ্ছ পানির ন্যায় দেখাবে। অপরটিকে দেখলে মনে হবে জলন্ত আগুন। যদি কেউ তার দেখা পেয়ে যায় তাহলে সে যেন জ্বলন্ত আগুনের নদীতেই চলে যায় এবং চোখ বন্ধ করে এই আগুন আসলে মাথা ঝুঁকিয়ে সেখান থেকে পান করে। এই আগুন আসলে- ঠান্ডা পানি। (সহীহ মুসলিম: ২৯৩৪)

তা থেকে বুঝা যায় দাজ্জাল তার অনুসারীদেরকে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে থাকে।

৩. স্বয়ং শয়তান দাজ্জালকে সহায়তা করবে। বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت أن بعثت لك أباك وأمك أتشهد إني ربك ؟ فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك

দাজ্জাল জনৈক বেদুইনকে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত মা-বাবাকে জীবিত করি- তাহলে কি আমাকে রব বলে স্বীকার করবে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ! তখন দুই শয়তান তার মা-বাবার আকৃতি ধারণ করে তার কাছে এসে বলবে- হে বৎস! তুমি তার অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই সে তোমার রব। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০৭৭)

৪. প্রাণহীন বস্তু এবং পশু পাখিরাও দাজ্জালের নির্দেশ পালন করবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দাজ্জালকে এত বেশী শক্তি দান করবেন যে, দাজ্জাল আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দেবে আর আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে জমিনকে ফুল ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দেবে, জমিন ফুল ফসলে ভরে যাবে। সে পশুপাখিকে ডাকলে- তারা তার ডাকে সাড়া দেবে। তার এরূপ কর্মকাণ্ড দেখে মানুষ দলে দলে তাকে রব স্বীকার করবে এবং ঈমান হারাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

দাজ্জাল কোথায় প্রকাশ পাবে :

সহীহ হাদীসের ভাষ্য মতে সে প্রাচ্যের খোরাসান নামক জায়গা থেকে প্রকাশ পাবে। ইসলামি ইতিহাসের এক বিখ্যাত ভূখন্ড হলো খোরাসান। বর্তমানে ইরানের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও দক্ষিণ তুর্কিমিনিস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ছিলো খোরাসান। এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় Amu Darza পশ্চিমে caspian Sea সাগর ও দক্ষিণে Dasht Kavir মধ্য ইরানের মরু অঞ্চল ও পূর্বে মধ্য আফগানিস্তানের পার্বত্য উচ্চ ভূমি। তবে তার ফিতনার বিষয়টি প্রকাশ পাবে সিরিয়া ও ইরাকের এক মধ্যবর্তী স্থান থেকে।

দাজ্জাল কত দিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে :

সহীহ মুসলিমে এসেছে-

قلنا: يا رسول الله : وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم»، قلنا: يا رسول الله: فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟"، قال: «لا، اقدروا له قدره

সাহাবিগণ রাসূল সা. -কে জিজ্ঞেস করলেন– দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বলেন– চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থাকবে। তার প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। আর তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। বাকি দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। তখন সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে কি কেবল একদিনের সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে? তখন রাসূল সা. উত্তরে বলেন- না! তোমরা যথারীতি সময় হিসাব করে দিন ঠিক করে সালাত আদায় করবে। (সহীহ মুসলিম: ৭৩৬৭) এই হাদীস থেকে বোঝা যায়- একদিন এক বছর হওয়ার বিষয়টি প্রকৃত অর্থে। রূপকার্থে নয়।

অনুসারী কারা হবে:

দাজ্জালের সর্বাধিক অনুসারী হবে ইয়াহুদি ও নারীরা। দাজ্জালের জাদুকরি শক্তি দেখে নারীরা সহজেই তার ফাঁদে পড়ে যাবে। তাই মুমিন পুরুষরা তার আবির্ভাবের খবর শুনে দ্রুত ঘরে গিয়ে তাদের মা বোনদেরকে বন্দি করে রাখবে। যাতে তারা দাজ্জালের দিকে চলে না যায়। ইয়াহুদিরা দাজ্জালের অনুসারী হওয়ার কারণ হলো, তারা বিশ্বাস করে শেষ যামানায় সর্বশেষ মাসীহ এসে হাইকেলে সুলাইমানি বা

টার ট্যাম্পল নির্মাণ করবে এবং গোটা বিশ্বে সুলাইমান আ. এর আদলে ইয়াহুদিদের বৈশ্বিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব ইয়াহুদিরা শাসন করবে। তারা তাদের মাসীহকে বলে মাসীহ বিন দাউদ। তারা তাদের মাসীহের শীঘ্রই আগমনের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করে।

তাদের ধর্মীয় উৎসব পাঁচ ও বার উদযাপনের সময় মাসীহের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ প্রার্থনাও করা হয়। আসলে তারা মিথ্যাবাদি। তাদের সর্বশেষ মাসীহ প্রকৃত পক্ষে মাসীহে দাজ্জাল। এই মাসীহ হলো নষ্ট-ভ্রষ্ট মাসীহ। প্রকৃত তথা হিদায়াতের মাসীহ হলেন সাইয়্যেদুনা ঈসা আ.। তিনি এসে এই ভ্রষ্ট মাসীহকে ও তার অনুসারী ইয়াহুদিদের ধ্বংস করবেন।

মুসনাদে আহমদে এসেছে- দাজ্জালের সর্বাধিক অনুসারী হবে ইয়াহুদিরা। সহীহ মুসলিমে এসেছে-

يتبع الدجال من يهود أصبهان، سبعون ألفا-

ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে। (মুসলিমঃ ২৯৪৪) ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কি. মি. দূরে অবস্থিত বিখ্যাত প্রদেশ ইস্পাহান। সরকারি গণনা অনুযায়ী সেখানে বর্তমানে ত্রিশ হাজার ইয়াহুদি বসবাস করে।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে কীভাবে বাঁচবেন:

দাজ্জাল আসার খবর পেলে তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। কেউ তার ঈমানের ব্যাপারে যতই আত্মবিশ্বাসী হোক, দাজ্জালের মুখোমুখি হওয়া তার জন্য উচিৎ হবে না । কারণ দাজ্জালের শক্তি এত বেশী ও সর্বগ্রাসী হবে যে মানুষকে সহজেই ধোঁকায় ফেলে দিবে। সুনানে আবু দাউদে এসেছে- রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

من سمع بالدَّجَّالِ فلينأ عنه ، فواللهِ إنَّ الرَّجلَ ليأتيه وهو يحسَبُ أنَّه مؤمنٌ فيتبعُه ممَّا يبعثُ به من الشُّبُهاتِ ، أو لما يُبَعثُ به من الشُّبُهاتِ-

কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর শুনলে সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহর কসম! মানুষ নিজেকে মুমিন ভেবে তার কাছে আসবে, কিন্তু যে সব সংশয় সৃষ্টিকারী বিষয় দিয়ে দাজ্জালকে পাঠানো হয়েছে, সে সব দেখে মানুষ তার অনুসারী হয়ে যাবে। (সুনানে আবু দাউদঃ ৪৩১৯)

কিন্তু কেউ যদি তার মুখোমুখি হয়ে যায়, সে যেন হক্কের উপর অটল থাকে। সহীহ মুসলিমে এসেছে- মানুষ দাজ্জালের সাক্ষাৎ থেকে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। তবে কেউ যদি তার মুখোমুখি হয়ে যায়, সে যেন সূরা কাহফের দশটি আয়াত পড়ে। কারণ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের দশটি আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

দাজ্জাল কীভাবে ধ্বংস হবে?:

দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইমাম মাহদির নেতৃত্বে যখন মুমিনগণ ব্যাপক প্রস্তুতি নিবে, তখন চারদিকে মুজাহিদরা লড়াইয়ের জন্য কাতার সোজা করবে। এমন সময় ঈসা আ. তাকে ধাওয়া করবেন। অবশেষে ফিলিস্তিনের লুদ শহরের পূর্ব ফটকে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হবেন এবং সেখানে তাকে হত্যা করবেন।

লুদ বর্তমানে ইজরাইলের রাজধানী। Tel Aviv zafo থেকে পূর্বে অবস্থিত। সম্প্রতি সেখানে ইয়াহুদিরা অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষার্থী, তাকমীল ফিল হাদীস

(প্রবন্ধ)

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে

নবিজি সা.

✍ | সিদ্দিকুর রহমান নাহিদ

মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন গণমানুষের মহান সেবক। মানুষের কল্যাণে তিনি ছিলেন সদা নিবেদিতপ্রাণ। নবুওত প্রাপ্তির আগ থেকেই তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। আমৃত্যু তিনি মানুষের সেবায় কাজ করেছেন। মানুষের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গ্রহণ করেছেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

বলা হয় বেকারত্ব সমাজের অভিশাপ। প্রচুর বেকার থাকা মানে সমাজে একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করা। আর শিক্ষিত মানুষের বেকারত্ব মানেই একধরনের দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা। সমাজে বেকারত্ব বেড়ে গেলে সামাজিক অনাচার ও অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়।

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব : ইসলাম এ দুটি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান আমাদের জানিয়েছে- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মানুষের মানসিক সুস্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ কারণে নবিজি সা. নিজেও আল্লাহ তায়ালার নিকট দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতেন। এমনকি তিনি যে দোয়ায় কুফর থেকে আশ্রয় চাইতেন, সেই একই দোয়ায় দারিদ্র্যের ব্যাপারেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যেমন তিনি বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفقْر

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরি এবং দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই। (সুনানে আবু দাউদ- ৩৬৫)

আজকের আধুনিক বিশ্বে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব যেন মহামারী রূপ ধারণ করেছে। অতীতেও এ সমস্যা ছিল। রাসূল সা. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সমাধানে ইসলামের শিক্ষা ও বিধানাবলির আলোকে ক্রমান্বয় পদ্ধতিতে কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রথমে তিনি মানুষদের উৎসাহিত করেছিলেন যে কোনো ধরনের কাজ ও পেশায় নিয়োজিত থাকতে। বস্তুত নবিরাও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তারা মানুষের সামনে কর্মের এবং হালাল উপার্জনের উচ্চমানের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রাসূল সা. হযরত দাউদ আ.এর ক্ষেত্রে বলেন-

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده،وان نبيا لله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায়নি। আল্লাহর নবি দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। (সহীহ বুখারি, ২০৭২)

এ বিষয়ে রাসূল সা. এর যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য ও অনুসরণীয়, সেটা হলো তিনি নিজেও ছাগল চরিয়েছেন এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে হযরত খাদীজা রাযি. এর সম্পদের মাধ্যমে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল সা. বলেছেন-

ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال:نعم:كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة-

আল্লাহতায়ালা এমন কোন নবি প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। তখন তাঁর সাহাবিগণ বললেন, আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ আমিও কয়েক কিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম। (সহীহ বুখারি: ২২৬২)

রাসূল সা. সকল বৈধ কর্মকেই সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্বের চোখে দেখতেন। কাজটি যা-ই হোক না কেনো। কেননা, মানুষের নিকট হাতপাতা এবং তাদের সামনে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে নিজে কাজ করে খাওয়াই উত্তম। এ বিষয়টি রাসূল সা. তাঁর হাদীসে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه-

তোমাদের কেউ রশি নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং বিক্রি করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা থেকে) রক্ষা করেন-তার জন্য এটাই উত্তম, মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ানোর চেয়ে। যে হাত পাতার ফলে মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। (সহীহ বুখারি- ১৪৭০)

এছাড়া রাসূল সা.এর দৃষ্টিতে কাজকর্ম ও পেশা সওয়াব লাভের মাধ্যম বলেও পরিগণিত ছিল। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনের এ সকল নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রয়োগের বাস্তব নমুনা ছিল আমাদের রাসূল সা. এর গোটা জীবন। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার এক আনসারি ব্যক্তি এসে নবিজির নিকট হাতপাতল। নবিজি সা.তাকে জিজ্ঞেসা করলেন- তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? লোকটি বলল- একটি গালিচা আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছিয়ে রাখি। একটি পাত্রও আছে, তাতে আমরা পানি পান করি। নবিজি সা. তাকে বললেন- সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসো। লোকটি সেগুলো নিয়ে এলে নবিজি সা. তা হাতে নিয়ে বললেন- 'এ দুটি কে ক্রয় করবে'? এক ব্যক্তি বলল- 'আমি এগুলো এক দিরহামে ক্রয় করব'। নবিজি সা. তখন আরও দুইবার অথবা তিন বার বললেন- কেউ কি এর অধিক মূল্য দেবে? আরেকজন বলল- 'আমি দুই দিরহামে নেব'। নবিজি সা. তখন ঐ ব্যক্তিকে জিনিস দুটি দিয়ে তার থেকে দিরহাম দুটি গ্রহণ করলেন। এরপর সেই আনসারি ব্যক্তিকে তা প্রদান করে বললেন- একদিরহাম দিয়ে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং আরেক দিরহামে একটি কুঠারের ফলা কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকটি তাই করল।

এরপর নবিজি সা. নিজ হাতে সেই লৌহকুঠারে একটি হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন- যাও, তুমি এটা দিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করো এবং পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে আমার সাথে আর দেখা করবে না। লোকটি কুঠার হাতে চলে গেল। কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে লাগল। এভাবে পনেরো দিন পার হলে সেই ব্যক্তি নবিজি সা. এর নিকট সাক্ষাত করতে এলো। ইতোমধ্যে সে দশ দিরহাম উপার্জন করেছে। এর কিছু দিয়ে সে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাবার কিনেছে।

এবার নবিজি সা. তাকে বললেন,

هَذَا خَيرٌ لَكَ مِن أَنْ تَجِئَ الْمَسْأَلَةُ نكتة في وجهك يوم القيامة -

ভিক্ষার কারণে কিয়ামতের দিন মুখমণ্ডলে দাগ নিয়ে ওঠার চেয়ে এটাই তোমার জন্য উত্তম।

নবিজি সা. আরও বলেন- তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারও জন্য অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ানো বৈধ নয়- ১. প্রচন্ড দরিদ্র ব্যক্তি, ২. ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি, ৩. যার ওপর রক্ত পণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম। (সুনানে আবু দাউদ- ১৬৪১)

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে এটা ছিল রাসূল সা. এর একটি বাস্তবসম্মত প্রায়োগিক পদক্ষেপ। যত সামান্যই হোক, তিনি দরিদ্র লোকটির শক্তি-সক্ষমতাকে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। তাকে দেখিয়েছেন একটি সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে হালাল রিজিক উপার্জন করার পথ ও পদ্ধতি।

লেখক: শিক্ষার্থী, তাকমীল ফিল হাদীস

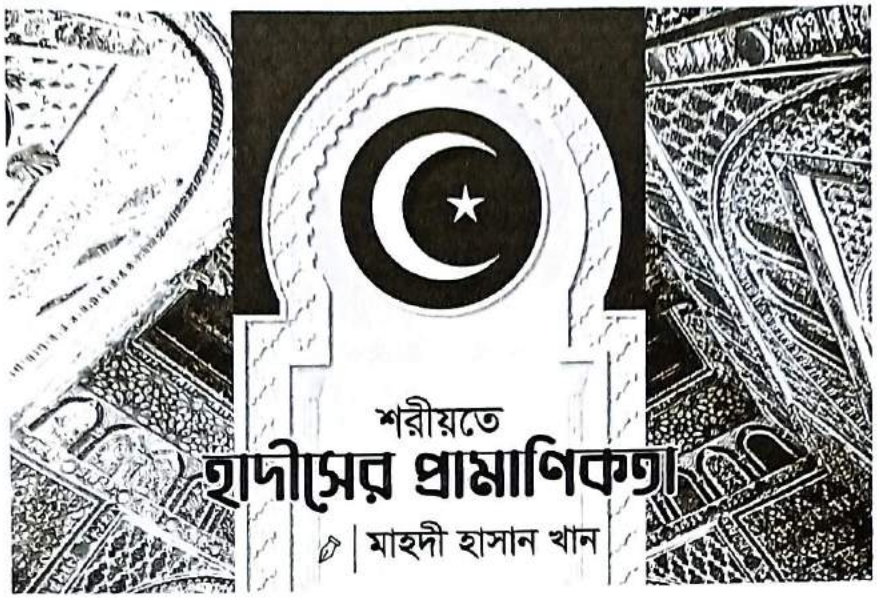

শরীয়তে হাদীসের প্রামাণিকতা

মাহদী হাসান খান

শরীয়তের দলিল চারটি। কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। নবি সা. এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আহলে হক্বের কেউ হাদীসের হুজ্জিয়তকে অস্বীকার করে নি। কিন্তু কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আজও হুজ্জিয়তে হাদীস তথা হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। এটি একটি ফিতনা। আরবিতে যাকে বলে- 'ফিতনাতু ইনকারিল হাদীস। মৌলিকভাবে এই ফিতনার দু'টি রূপ আছে। একটি পুরাতন ও অপরটি নতুন ।

পুরাতন রূপ: পুরাতন রূপের উদ্ভব ঘটেছিল হযরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ঘটনার পর। সর্বপ্রথম হাদীস অস্বীকার করে খারেজি সম্প্রদায়। তারা হাকিমের ফয়সালা মান্য করাকে কুফরি বলে থাকে। ফলে তারা সমস্ত সাহাবিকেই কাফির বলে আখ্যা দেয়। নাউযুবিল্লাহ! আর কাফিরের রেওয়ায়েত মকবুল নয় তাই তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রাসূল সা. এর হাদীস অস্বীকার করে বসে। এরপর আসে শীয়া সম্প্রদায়। তারা সিদ্দীকে আকবর রা. এর হাতে বাইআত করায় সমস্ত সাহাবিকে কাফির আখ্যায়িত করে। এরপরে আসে মু'তাযিলা সম্প্রদায়। যারা ছিলো আকল-নির্ভর। যে হাদীস তাদের আকল ও যুক্তিগ্রাহ্য তা তারা গ্রহণ করে। আর যা তাদের আকল ও যুক্তিতে ধরে না বা যে হাদীসের সাথে অপর কোনো হাদীসের বাহ্যিকবিরোধ আছে তা তারা অস্বীকার করে। এদেরই একটি গ্রুপ এমন আছে, তারা যদিও হাদীসের সুবুত মানে কিন্তু তার হুজ্জত হওয়াকে মানে না।

এসব কারণেই তারা দিদারে এলাহি, মীযান, সিরাত, গুনাহগার মুমিনের জন্য শাফায়াত ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসকে অস্বীকার করে। এদের বিরুদ্ধে মুতাকাদ্দিমীনদের মধ্যে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। মুনাযারা এবং লিখনীর মাধ্যমে এই ফিতনার দাঁতভাঙা জবাব দেন। যাদের তালিকায় প্রথম ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. (মৃত্যু : ১৫০ হি.); যিনি খারেজিদের সাথে মুনাযারা করার জন্য কূফা থেকে বিশ বার বসরায় যান। প্রতিবারই তিনি বিজয় নিয়ে ফিরে আসেন। "আর-রিসালাহ" নামে পুস্তিকা লিখে হাদীসের প্রামাণ্যতা প্রমাণে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন ইমাম শাফেয়িরহ. (মৃত্যু, ২০৪ হিঃ)। এবিষয়ে তাঁর আরেকটি কিতাব হলো- كتاب الآثار।

ইমাম আহমদ রহ. এ বিষয়ে কিতাব লিখেন كتاب السنة নামে। ইমাম সুয়ূতি রহ.ও এবিষয়ে কিতাব লিখেন مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة নামে। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন- সর্বপ্রথম মুনকিরে হাদীস হলো খাওয়ারিজ আর তাদের মোকাবেলা করেছেন আইম্মায়ে আরবাআ। ইমাম বুখারি রহ. লিখেছেন- الاعتصام। আবু বকর ইবনে খাল্লান লিখেছেন كتاب السنة ; ইমাম তাহাবি রহ. লিখেছেন শারহু মাআনিল আসার ও শরহু মুশকিলিল আসার।

হাফিজ আবুল ফাতাহ রহ. লিখেছেন- إثبات الحجة على تارك الحجة ; ইমাম গাযালি রহ. المستصفى ; ইমাম ইবনে হাযম রহ. الإحكام এবং মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম উযিরইয়ামানি রহ. الروض الباسم এ এ বিষয়ে গভীর আলোকপাত করেছেন।

এই ফিতনার পুরাতন রূপের মোকাবেলায় উলামায়ে কেরাম এমন সব মহৎ কারনামা আঞ্জাম দিয়েছেন, যার সামনে এই ফিতনার কারিগররা কুলিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে তার সুর একরকম বন্ধই হয়ে যায়।

নতুন রূপ : অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে যখন পশ্চিমারা সামরিক-রাজনৈতিক উভয়দিক থেকেই পরাজয় বরণ করল, তখন তারা ভিন্নপথে হাঁটতে শুরু করল। ইসলামের মধ্যে সন্দেহ-তারাদ্দুদ সৃষ্টির জন্য তারা নানা কূট-কৌশলের আশ্রয় নিল। যাতে ইসলামকে তার মূল থেকে কেটে ফেলা যায়। এরই ফলশ্রুতিতে তারা কতিপয় খ্রিস্টান যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমানদের শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। যাতে তারা ইসলাম শিখে ইসলামেরই ক্ষতিসাধন করতে পারে। এরাই ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদ নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো- এদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কতিপয় মুসলমানও হাদীসের ইনকার করে বসেছেন। যেমন- মিশরের ড. ত্বহা হুসাইন, আহমদ আমীন, তুরস্কের যিয়া বেগ আল্প, হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ, আব্দুল্লাহ

চক্রালভি, লেখক আসলাম জয়রামপুরি, ফতেহ নিয়াযপুরি, ড. গোলাম জিলানি বারক, ড. আহমদ দীন তামান্না চৌধুরী, গোলাম আহমদ পারভেজ, এনায়েতুল্লাহ মাশরেকি প্রমুখ। এদের হাদীস অস্বীকারের দু'টি দলিল রয়েছে । আসলে তা দলিল নয়; বরং তাদের শুবহা।

১ম শুবহা হলো- আল্লাহ তাআলা বলেন- ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ (সূরা নাহল, ৮৯) ما فرطنا في الكتاب من شيئ (সূরা আনআম : ৩৮)

অর্থাৎ আমি কুরআনে সবকিছুই বর্ণনা করেছি; কোনো কিছুই বর্ণনা করতে ছাড়িনি । যেহেতু কুরআনেই সব আছে, তাহলে হাদীস মানার প্রয়োজন কী? রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু তাবলীগে 'কুরআন' আর আমাদের দায়িত্ব হলো 'ইতাআতে কুরআন'। যার দলিল হলো- إن الحكم إلا لله (সূরা আনআম, আয়াত ৫৭) অর্থাৎ কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর। তাই হাদীস মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

তাদের ২য় শুবহাটি হলো- আমরা যদি মেনেও নেই যে, হাদীস হুজ্জত, তাহলেও বর্তমানে আমাদের সামনে থাকা হাদীসগুলোই যে রাসূল সা. থেকে বর্ণিত তা প্রমাণিত হয় না। কারণ- এক. তৎকালীন আরবরা লিখতে জানতো না। তারা ছিল উম্মি। যারাই বা জানতো তারা শুধু কুরআনই লিখত। ফলে হাদীস লেখা হয়নি। দুই. তথাপি তখন রাসূল সা. তাদেরকে হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। ফলে তা যথাযথভাবে হেফাজত হয়নি। তাই আমরা নিশ্চিত নই যে, এগুলোই রাসূলের হাদীস।

উল্লেখ্য, হাদীস লিখতে নিষেধ করার হাদীসটি হলো-

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومَن كتب عني غيرَالقرآن فَلْيَمْحُه. (صحيح مسلم . ٢١٤/١)

তাদের ১ম শুবহার জবাবে হুজ্জিয়তে হাদীসের উপর কুরআন থেকে দলিল:

এক. কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোতে কুরআনের মর্ম ও অর্থের বিবরণদানকে রাসূলের ওযীফা বলা হয়েছে।

যেমন : ১. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون
আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতরণ করেছি যাতে আপনি তা মানুষের কাছে বর্ণনা করে দেন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা নাহল : ৪৪)

২.
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সমূহ স্পষ্ট করে পেশ করতে পারেন। বস্তুত তা মুমিনদের জন্য হেদায়ত ও রহমত স্বরূপ। (সূরা নাহল : ৬৪)

একই মর্মে কুরআনে আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- সূরা আলে ইমরান: ১৬৪, সূরা বাকারা: ১৫১, সূরা জুমুআ: ০৬, সূরা নিসা: ১১৩। এসকল আয়াতে কুরআনের বর্ণনাদানকে রাসূলের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত দুই আয়াতে কুরআনকে মুবাইয়ান তথা বর্ণনাকৃত আর রাসূল সা. কে 'মুবাইয়িন তথা বর্ণনাকারী বলা হয়েছে । রাসূলের এই বর্ণনার নামই হলো হাদীস ।

৩.
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
হে রাসূল! আপনার ওপর আপনার রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে তার রিসালত পৌঁছালেন না। (সূরা মায়িদা: ৬৭)

উক্ত আয়াতে কুরআনকে 'মুবাল্লাগ' তথা পৌঁছে দেওয়ার বস্তু আর রাসূল সা. কে মুবাল্লিগ তথা পৌঁছানেওয়ালা বলা হচ্ছে আর তাঁর তাবলীগের সেই বর্ণনার নামই হলো হাদীস ।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে যে হেকমতের উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো হাদীসে নববি। যেমনটা ইমাম শাফেয়ি রাহ. ইমাম ইবনে কাসীর ও ইবনুল আসীর রহ. বর্ণনা করেছেন। প্রথম চার আয়াতে তো স্পষ্ট; নবির দায়িত্ব চারটি। তন্মধ্যে একটি হলো হেকমত শিক্ষা দেওয়া। যদি নবির হাদীস প্রমাণই না হবে, তাহলে তাঁর শিক্ষা দেওয়া হেকমতের কী অবস্থান থাকবে? হাদীসে রাসূল সা. মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।

কেননা আল্লাহ বলেন-.وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
শরীয়ত বিষয়ক কোনো কথা রাসূল সা. নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। যা বলেন ওহির মাধ্যমেই বলেন।
(সূরা নাজম : ০৩)

দুই. কুরআনের ঐসকল আয়াত যেগুলোতে উম্মতকে রাসূল সা. এর কথা ও কাজের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। যেমন-

(١) يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা: ৫৯)।

(٢) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক থেকো। (সূরা মায়িদাহ: ৯২)

উক্ত আয়াতগুলোতে أطيعوا শব্দটি যেমনি আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি রাসূলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ইতাআতের মতো রাসূলের ইতাআতও স্বতন্ত্র ও জরুরি।

এসব আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট শব্দে রাসূল সা. এর ইতাআত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতাআত দুইভাবে হয়ে থাকে। কথার অনুসরণ ও কাজের অনুকরণের মাধ্যমে। রাসূলের কথা ও কাজের নামই তো হাদীস। তাই হাদীস না মেনে চলার সুযোগ কোথায়? এ প্রকারের আরো আয়াতসমূহ-

(٣) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
হে নবি! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করো তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের মহব্বত করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

(٤) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনাদর্শে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব : ২১)

এ আয়াতে বলা হয়েছে - আল্লাহর রাসূলই সর্বোত্তম

আদর্শের অধিকারী। এ বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষদের সেই উত্তম আদর্শে আদর্শবান হতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ।

(৫) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

আর নবি মুহাম্মদ সা. মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে বেশি প্রিয়। (সূরা আহযাব : ০৬)

এই আয়াতের সারকথা হলো- মুমিনদের নিজের জানের উপর যতটা না কর্তৃত্ব রয়েছে তার চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব ও অধিকার রয়েছে আল্লাহর রাসূলের। শাহ আব্দুল কাদির দেহলভি রহ. বলেন, নবি হলেন আল্লাহর নাইব। নিজে নিজেকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নয়; কিন্তু আল্লাহর নবীর হুকুম হলে নিক্ষেপ করা ফরজ হয়ে যায় ।

(৬) ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর: ০৭)

রাসূলের আদেশ-নিষেধের তাবেদারী করার নির্দেশ আল্লাহর। হাদীস না মানা তাই আল্লাহরই নির্দেশের বিরোধিতা করা।

(৭) وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

আমি প্রত্যেক রাসূলকে এজন্যই পাঠিয়েছি যাতে আল্লাহর নির্দেশে তার (শর্তহীন) আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা : ৬৫)

অর্থাৎ নবি মানেই অনুসরণযোগ্য। আর তাঁর অনুসরণ হয় হাদীস মানার মাধ্যমে।

(৮) يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا

যেদিন তাদের চেহারাকে আগুনে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে (কত ভালো হতো) যদি আমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। (সূরা আহযাব : ৬৬)

কিয়ামতের দিন কাফিররা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদের বুঝে আসবে এই শাস্তি দুনিয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতার কারণেই এসেছে।

(৯) يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله.

তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের সামনে পেশকদমী করো না। (বরং তাদের নির্দেশের সামনে তোমাদের চিত্ত অবনত করো।) আর আল্লাহকে ভয় করো । (হুজুরাত: ০১)

তিন. ঐসকল আয়াত- যেগুলোতে রাসূলের বিরোধিতার ওপর ভীতি ও ধমক প্রদান করা হয়েছে। যেমন:

(১) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.

আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে আর শীঘ্রই তাকে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। (সূরা নিসা: ১১৫)

এখানে দু'টি উসূল বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, যে রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার জন্য জাহান্নাম। অর্থাৎ রাসূলের শরয়ি নির্দেশ পালনকে জরুরি করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো, যে মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর মুমিনদের পথ হলো হাদীস মানার পথ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কিতাব الصارم المسلول على شاتم الرسول এ নকল করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন- আমি কুরআনের ২৩টি আয়াত পেয়েছি যেখানে রাসূলের ইত্তেবা করতে বলা হয়েছে। তাই রাসূলের ইত্তেবা করা ওয়াজিব। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন-

(২) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم.

সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন ভয় করে যে, তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে কিংবা কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে। (সূরা নূর : ৬৩)

(৩) ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। (সূরা আহযাব : ৩৬)

এ দুই আয়াতে মুখালিফে রাসূলকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এই বিরোধিতাকে স্পষ্ট গোমরাহি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চার. কুরআনের ঐ সকল আয়াত- যেগুলোতে রাসূল সা. এর মুখনিসৃত কথাকে ওহি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর কাজকে সমর্থন জানানো হয়েছে। যেমন :

(১) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

তিনি মনগড়া কথা বলেন না; বরং তা হচ্ছে ওহি যা তার ওপর পাঠানো হয়। (সূরা নাজম: ১৩)

রাসূলের শরীয়ত বিষয়ক প্রতিটি কথাকে ওহি বলা হয়েছে। আর ওহির অনুসরণ আবশ্যক।

(২) وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.

তোমরা এতোদিন যে কেবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম। যাতে আমি জেনে নিতে পারি- তোমাদের মধ্যে কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে তার অনুসরণ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। (সূরা বাকারা : ৪৩)

এই আয়াতে এ বিষয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, কা'বাতুল্লাহর দিকে কিবলা ফেরানোর পূর্বে আপনি যে কিবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন তা সঠিক ছিলো। তা আমারই নির্দেশে ছিলো। কিন্তু এই নির্দেশের কথা কুরআনের কোথাও নেই। অতএব বুঝা গেল, তা ওহিয়ে খফির মাধ্যমেই হয়েছিল। আর ওহিয়ে খফির ইশারায় রাসূলের বলা কথা ও কৃতকাজের নামই হলো হাদীস।

(৩) ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

তোমরা সেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং সেগুলো না কেটে এর মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা ছিলো আল্লাহ তাআলার আদেশেই। যাতে তিনি এর দ্বারা ফাসেকদের অপমানিত করতে পারেন। (সূরা হাশর : ০৫)

রাসূল সা. খায়বার যুদ্ধে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সমস্ত ঘাস-বৃক্ষ কেটে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে কিছু মুনাফিক আপত্তি জানালে এই আয়াত নাযিল হয়; যাতে বলা হয়েছে - যা কিছু হয়েছে আমার নির্দেশেই হয়েছে। অথচ এই নির্দেশ কুরআনের কোথাও নেই । তাই তা অবশ্যই ওহিয়ে খফির মাধ্যমে হয়েছে।

(٤) ولا تصل على احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার নামাজ পড়বেন না। আর তার কবর পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না। (সূরা তাওবা : ৮৪)

রাসূলে আরাবি সা. যখন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাযার নামাজ পড়ান, তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যাকে রাসূলের পড়া জানাযার নামাজ মৌলিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে। আর ভবিষ্যতে যাতে মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জানাযার নামাজ না পড়া হয়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ জানাযার নামাজের বিধান কুরআনের কোথাও ছিল না।

(٥) يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع.
হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন নামাজের দিকে আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও আর কেনা-বেচা ছেড়ে দাও। (সূরা জুমুআ : ০৯)

এই আয়াতে আযানে জুমআর পরে খুতবায়ে জুমআর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আযানে জুমআ প্রচলনের কথা কুরআনের কোথাও নেই। যা মূলত রাসূল সা. শুরু করেছেন। তার সেই প্রচলনকে কুরআন বহাল রেখেছে।

(٦) واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
যখন তারা কোন ব্যবসায়িক কাজকর্ম বা কোন ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায় তখন সেদিকে দ্রুত দৌড়ায় এবং আপনাকে একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়। (সূরা জুমুআ : ১১)

রাসূল সা. একদা জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন মসজিদের বাইরে শষ্যবাহী এক কাফেলা এসে হাজির হয়। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদ থেকে বের হয়ে কাফেলার নিকট যান। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। এই আয়াতে রাসূল সা. কর্তৃক প্রচলিত খুতবাকে সমর্থন জানিয়ে লোকদেরকে খুতবার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার ইশারা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তখন মদীনায় খাদ্যের সংকট চলছিল এবং তখনকার খুতবা নামাজের পর হতো। তাই সাহাবায়ে কেরাম নামাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান।

পাঁচ. কুরআনের ঐসকল আয়াত যেগুলোর মতলব বুঝা- হাদীস বুঝার ওপর নির্ভরশীল। যেমন-

১. সূরা আহযাবের ৩৭ নং আয়াতে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করার বিধানটি একটি প্রেক্ষাপটসহ নাযিল হয়েছে।

২. সূরা আবাসার ৬-১ নং আয়াতে অন্ধ ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে।

৩. সূরা আনফালের ৭ নং আয়াতে বদর যুদ্ধের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

৪. সূরা তাওবার ২৫ নং আয়াতে হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানরা আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৫. সূরা তাওবার ৪০ নং আয়াতে দুইসঙ্গীর গুহায় অবস্থান ও একজন আরেকজনকে চিহ্নিত না হওয়ার উপদেশের কথা বিবৃত হয়েছে।

৬. সূরা তাওবার ১০৭ নং আয়াতে মসজিদে যেরারের উল্লেখ রয়েছে।

৭. সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতে তিন সাহাবির পেছনে থেকে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই সমস্ত আয়াতে এমন কিছু খাস ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেগুলো অনুধাবন করা হাদীসের ওপর নির্ভরশীল। লেখার কলেবর অতিবৃদ্ধির আশংকায় শুধু আয়াতগুলো উল্লেখ করে বিরত থাকতে হয়েছে। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

আরেকটি সামগ্রিক দলিল হচ্ছে - আল্লাহ তাআলার বাণী-
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
আমিই কুরআন অবতরণ করেছি আমিই তা সংরক্ষণ করবো। (সূরা হিজর : ৯)

অর্থাৎ কুরআন হেফাজতের যিম্মাদারী আল্লাহ তাআলার। কুরআন হচ্ছে লফয ও মা'না উভয়টির নাম। লফযের হেফাজত হয় হিফজের মাধ্যমে। আর মা'নার হেফাজত হয় হাদীসের হেফাজতের মাধ্যমে। অতএব, কুরআন হেফাজতের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে হাদীস হেফাজতেরও প্রতিশ্রুতি হয়ে যায়। তাছাড়া কুরআনের বহু আয়াত আছে; যা বুঝতে হলে হাদীস বুঝা জরুরি। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন-

لولا السنة لما فهمنا من القرآن. (الميزان الكبرى للشعراني -٢٥)
অর্থাৎ হাদীস না থাকলে আমরা কুরআনই বুঝতাম না।

হুজ্জিয়তে হাদীসের ওপর উম্মতের ইজমা :

১. ইমাম ইবনে হাযম রহ. الإحكام গ্রন্থে -
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
এই আয়াতের অধীনে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন-
إن الأمة مجمعة على أن هذا المذهب متوجه إلينا.
অর্থাৎ সমস্ত উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, এ নির্দেশ আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

২. ইমাম শাওকানি রহ. বলেন- জেনে রাখুন, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সুন্নাতে রাসূল জরুরিয়্যাতে দ্বীনিয়াহ হিসেবে শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র দলিল। ইসলামে যাদের কোনো অংশ নেই, তারাই একমাত্র এতে বিরোধিতা করে। কুরআন ও হাদীস একে অপরের সাথে জড়িত। পৃথক নয়। শরয়িআহকামকে আবশ্যককারী দু'টি উৎস। কোনো মুসলমানের জন্য আল্লাহর শরীয়ত ও হেদায়েতের বুঝ অর্জিত হবে না- কুরআন ও হাদীসের দিকে রুজু করা ব্যতিরেকে।

(ارشاد الفحول : ١/ ١٥٦-١٥٨)(٢٤ - ٢٣ : لمحات من تاريخ السنة)
হুজ্জিয়তে হাদীসের উপর আকলি দলিল :

১. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন-

ازرفتن با بردن فرق ظاهراست.
অর্থাৎ بردن ও رفتن আলাদা দু'টি বিষয়। প্রথমটি হচ্ছে নিজে নিজে চলা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপরকে চালানো। নিজে নিজে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প[illegible]ওয়া এক [illegible] ব্যর্থতা। কিন্তু অন্যকে চালাতে গি[illegible]য়া আ[illegible] ব্যর্থতা। তামাম আম্বিয়ায়ে কে[illegible]জ [illegible] বরং আল্লাহই তাদেরকে চালি[illegible]না[illegible]

শরীয়তকে নবিদের তবিয়তের ছাঁচে ঢেলে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। শরীয়ত তখনই পবিত্র থাকতে পারে যখন নবিদের তবিয়তের ছাঁচ পবিত্র থাকবে। যেহেতু তবিয়তে আম্বিয়া পাক ছিল, তাই শরীয়তও পৌঁছেছে পবিত্রভাবে। তাই হাদীস যা শরীয়তের অন্যতম দলিল, তা মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

২. পূর্ববর্তী বহু নবি এমন ছিলেন, যাঁদের উপর কোনো কিতাব নাযিল হয়নি। বরং আল্লাহ তাদেরকে ওহিয়ে খফির মাধ্যমে পরিচালনা করেছেন। এখন যদি তাঁদের কথা হুজ্জত না হয়, তাহলে এমন নবি পাঠানো অর্থহীন হয়ে যাবে।

৩. আমরা জানি, কোনো ভবন নির্মাণের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুধু পরিকল্পনা দিয়েই ভবন নির্মাণ হয় না। বরং সেই পরিকল্পনার ব্যাখ্যার জন্য একজন প্রকৌশলীও প্রয়োজন। যিনি সেই পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করেন-কতটি ইট লাগবে, কী পরিমাণ রড, সিমেন্ট ও বালুর প্রয়োজন পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে মহাপরিকল্পনার মহাদলিল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন- রাসূলে খোদা সা.। যেমন আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন- أقيموا الصلاة তোমরা নামাজ কায়েম করো । কুরআনের কোথাও এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি । এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূল সা. - কত ওয়াক্ত, কত রাকাত, কয়টি রুকু, কয়টি সেজদা ইত্যাদি ইত্যাদি।

* তাদের প্রথম শুবহার জবাবে তিনভাবে হুজ্জিয়তে হাদীসের দলিল পেশ করার পরে তাদের পেশকৃত আয়াতদ্বয়ের জবাব এভাবে দেওয়া যায়- আল্লাহ তাআলা কুরআনে কোনো কিছু বর্ণনা করতে ছাড়েননি মানে হলো- ইজমালান ও আসালাতান সবকিছু বর্ণনা করেছেন। কারণ কুরআন হলো সংবিধানের নাম। সংবিধানে সবকিছুর বিশদ আলোচনা করা নিয়মও নয়; বরং মৌলিক আলোচনাই এখানে মুখ্য থাকে ।

* তাদের দ্বিতীয় শুবাহর একটা পয়েন্ট ছিল- প্রথম শতাব্দীতে হাদীস লেখা হয়নি। তাই তা সঠিকভাবে হেফাজতও হয়নি। আমরা বলব, প্রথম শতাব্দীতেও হাদীস লিখা হয়েছে । তার দলিল হলো -

(١) ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وأبو داوود عن عبد الله بن عمرو رضي الله قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب تكلم في الرضاء والغضب فأمسكت عن الكتابة فذكر تذلك لرسول الله فأومأ إلى فيه وقال أكتب- فهو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أبو داود- (٣/ ٢١٨ : والمسند ٢/ ٢٠٥)

রাসূল সা. এর স্পষ্ট আদেশে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. হাদীস লিখতে শুরু করলেন। একসময় তা এক বিরাট সংকলনের রূপ ধারণ করে।

যাকে আসসাদিকা নামে ডাকা হতো। এই সংকলনে হাদীস সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের মতো ছিল। হাফিজ বদরুদ্দীন আইনি রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন- তিনি বলেন, রাসূলের সাহাবিদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী হাদীস রেওয়ায়ত করেছি, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত। কেননা তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না। মুহাক্কিকগণ আবু হুরায়রা রাযি. এর রেওয়ায়ত সংখ্যা বলেছেন- ৫৩৭৫টি। এ থেকে বুঝা যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়েত এরচেয়েও বেশি ছিল।

(٢) ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِن بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذلكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ خطبة طويلة ذكر فيها أحكام القتل فقال صحابي اسمه أبو شاه اكْتُبْ لي يا رَسولَ اللهِ، فَقالَ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ. (صحيح البخاري – ٢٤٣٤)

ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصاري يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث في عجبه ولايحفظه فشكا ذلك إلى رسول الله فقال استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط. (سنن الترمذي-٢٦٦٦)

এ জাতীয় আরো অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, অনেক সাহাবি হাদীস লিখে রাখতেন। যা মূলত রাসূলের নির্দেশেই হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, হয়তো তা ব্যাপক আকারে লিখা হতো না। তবে লিখা হতো। অনেকের লিখিত হাদীসের সংকলনকে সহীফা বলা হতো। যেমন, সহীফায়ে আলি, সহীফায়ে সাদ বিন উবাদাহ, সহীফায়ে আবি হুরায়রা ইত্যাদি।

কিছু সময়ের জন্য যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, প্রথম শতাব্দীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীস লিখেননি তবুও হাদীসের হেফাজতে কোনো ত্রুটি হতো না। কারণ, কিতাবতে হাদীস ছাড়াও হাদীস হেফাজতের আরো দু'টি পদ্ধতি আছে। হিফজে হাদীস ও তাআমূলে হাদীস। যার উভয়টিতেই তারা ছিলেন বেমিছাল মুহাফিজ। তাদের হিফজের যোগ্যতা ছিল প্রবাদতুল্য। তারা তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে নিজেদের হসব-নসব তো বটেই এমনকি উট-ঘোড়ার নসব পর্যন্ত মুখস্ত রাখতে পারতেন । শত-শত লাইনের কবিতা মাত্র একবার শুনেই হুবহু বলে দেওয়ার প্রতিযোগিতা ছিলো তাদের মাঝে; তদুপরি তারা আমলের মাধ্যমে হাদীসে নববির জীবন্ত নুসখায় পরিণত হয়েছিলেন। রাসূলের অযু-গোসলের পানি থেকে শুরু করে র-ক্তপেশাব পর্যন্ত তারা বিনষ্ট হতে দেননি।একারণেই তাদের প্রতি আল্লাহর ঘোষণা- رضي الله عنهم ورضوا عنه

রাসূলের হাদীস লিখতে নিষেধ করার ব্যাখ্যা : ইমাম সুয়ূতি রহ. تدريب الراوي তে কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন:-

১. এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িক। কুরআন নাযিলের সময়ে যখন কুরআন লিখার হতো, তখন যদি হাদীস লিখা ইযনে আম দেওয়া হতো- তাহলে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে মিশ্রণের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতো। কারণ ইবতেদায়ে ইসলামে লোকেরা কুরআনের ভাষা ও বর্ণনারীতির সাথে খুব একটা পরিচিত ছিল না ।

২. নিষেধ ছিল মানে কুরআন ও হাদীস একই সহীফায় লেখা নিষেধ ছিল ।

৩. কারো কারো মতে, নিষেধাজ্ঞা ছিল কুরআন নাযিলের মুহূর্তের সাথে খাস। কারণ তখন হাদীস লিখতে থাকলে কুরআন গাইরে কুরআনের সাথে ইলতিবাসের সন্দেহ তৈরি হয়।

৪. যাদের قوة حافظة দুর্বল- তাদের জন্য লেখার অনুমতি আর যাদের قوة حافظة ভালো- তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা ছিল। যাতে তারা লিখনীর উপর ইকতিফা করে না বসে থাকে।
৫. কারো কারো মতে, হাদীসটি মা'লূল।
৬. ইমাম বুখারি রহ. এর মতে হাদীসটি মাওকুফ। এটিই সবচেয়ে সঠিক।
ইউসুফ বিন্নুরি রহ. বলেন, এই নিষেধাজ্ঞার হেকমত হলো- রাসূলের যুগে রাসূলের সামনে কুরআন লিপিবদ্ধ করার মতো যদি হাদীসও লিপিবদ্ধ করা হতো, তাহলে প্রতিটি হাদীস কুরআনের মতো কাতয়ি বা অকাট্য হতো। ফলে তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে যেতো । এ থেকে বুঝা যায় কুরআন-হাদীস উভয়টি শরীয়তের দলিল হলেও কুরআন হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য । সর্বোপরি তারা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সাবিত করে আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে। হাদীস যদি হুজ্জতই না হয়, তাহলে তাদের এই দাবি সাবিত হলো কীভাবে। তাদের দলিল তাদের দাবির বিরোধী।
এ-তো গেল ইলমে হাদীসের খাস সংকলনের কথা। এখন সংক্ষেপে আম সংকলনের আলোচনা করব। প্রথম শতাব্দীতে হাদীস হেফাজতের প্রধান মাধ্যম ছিল হিফজে হাদীস। যেসব কারণে হাদীসের আম সংকলনের অনুমোদন ছিল না, সেসব কারণ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়- তখন সর্বপ্রথম এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করেন পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ- ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. । তিনি তার যুগের বড় বড় আলেম ও তার অধীনস্থ গভর্নরদের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, যেখানেই রাসূলের হাদীস পাওয়া যায়, তা আপনারা জমা করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।
মুআত্তা মুহাম্মাদে আছে- হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. আবু বকর আমর ইবনে হাজম রহ. এর কাছে চিঠি লিখে জানালেন, আপনি রাসূলের হাদীস তালাশ করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন । কেননা আমার আশংকা হচ্ছে ইলমের পঠন-পাঠন ও উলামায়ে কেরামের বিলুপ্তি ঘটবে।
ইবনে আব্দুল বার রাহ. লিখেন- সাঈদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি ইবনে শিহাব যুহরি রাহ. (মৃত্যু: ১২৪ হিজরি) কে সাদ ইবন ইবরাহীমের সাথে কথা বলতে শুনেছি - তিনি বলছেন- ওমর ইবনে আব্দুল আযীয আমাকে রাসূলের হাদীস জমা করার নির্দেশ দিলেন। তখন আমি তার কাছে দফতরের পর দফতর হাদীসের সংকলন লিখে পাঠালাম। আর তিনি তার অধীনস্থ প্রত্যেক শহরে এক এক দফতরে পাঠিয়ে দেন। (جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٦)
ইমাম যুহরি রহ. সেইসব দফতরে এ পরিমাণ হাদীস জমা করেন যে, তার কিতাবগুলো খলীফা ওলীদ ইবনে ইয়াযীদের কতলের পর সরকারি ভান্ডার থেকে অনেকগুলো সওয়ারী বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।
ইবনে আব্দুল বার রাহ. আরো লিখেন- এ থেকে বুঝা যায়, ইমাম যুহরি রাহ. আবু বকর ইবনে হাযম রাহ. এর পূর্বে ইলমে হাদীসের تدوين শুরু করেন। ইমাম মালিক রাহ. বলেন-

أول من دون العلم ابن شهاب (جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٩)

এই বুযুর্গদ্বয়ের পরে বিভিন্ন স্থানে হাদীসের সংকলন জোরেশোরে শুরু হয়। ইমাম মালিক ও ইবনে আবি যি'ব (ذئب) রহ. মদীনায়, ইবনে জুরাইজ রহ. মক্কায়, ইমাম আওযায়ি রহ. শামে, সুফিয়ান সাওরি রহ. কুফায়, হাম্মাদ ইবনে আবি সালামাহ বসরায়, মা'মার বিন রাশিদ ইয়ামানে, হাইশাম রহ. ওয়াসিতে, জাবির ইবনে আব্দুল হামীদ রায় শহরে, ইবনুল মুবারক রহ. খুরাসানে হাদীসের খেদমতে ব্রতী হন । এটা হলো হাদীস সংকলনের ১ম যুগ।
একই যুগে এ সকল নক্ষত্রতুল্য বুযুর্গরা হাদীস চর্চায় ব্রতী হওয়াই প্রমাণ বহন করে- আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এই তড়প পয়দা করে দেন যে, যদি তাদের সময়গুলো এই শাস্ত্রের হেফাজতে ব্যয় না করেন, তাহলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
তদুপরি হাদীস সংকলনের বিভিন্ন ধাপে, বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যারা এতে হাত দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সমালোচনাও করা হয়েছে। যদিও ইসলাম কারো সমালোচনা করার অনুমতি দেয় না, তথাপি হেফাজতে হাদীসের স্বার্থে রাবীদের সমালোচনার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এই শাস্ত্রের কিতাবাদি রচনায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনকি ইমাম বুখারি রহ. হাদীস তালাশ করতে গিয়ে যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখেছেন, সে পাত্রে খাবার না রেখে খালি পাত্র ঘোড়ার সামনে ধরে তাকে বশে আনছে- তার থেকেও হাদীস গ্রহণ করেননি।
হাদীস শাস্ত্র যাতে সব ধরনের কালিমা থেকে মুক্ত থাকে, সেজন্য এই শাস্ত্রের অধীনে আরো শতাধিক শাস্ত্র রচিত হয়েছে। যার কোনো একটির পরিসীমার মধ্যেই যদি কোনো ব্যক্তি তার সারাটা জীবন পার করে দেয়। তবুও তার কিনারায় পৌঁছাতে পারবে না। মূলকথা হলো - হুজ্জিয়তে হাদীসের ওপর পুরো উম্মত একমত।
ইমাম শাফেয়ি রাহ. বলেন, সুন্নাতে রাসূল হলো কুরআনের খাস ও আম বিষয়াদির বর্ণনাকারী। ইমাম গাযালি রাহ. المستصفى তে লিখেন-

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالته المعجزة على صدقه- والله تعالى أمرنا باتباعه لأنه لاينطق عن الهوى إن هوالا وحي يوحى- لكن بعضه يتلى فيسمى كتابا وبعضه لايتلى وهو سنة-

রাসূলের বাণী তাঁর মুজিযার (কুরআনের) সত্যতার দলিল। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। কারণ রাসুল সা. যা বলেন (শরয়ি বিষয়ে) তা আল্লাহর ওহির মাধ্যমেই বলেন। কিছু ওহি পাঠ করা হয় তার নাম কুরআন আর কিছু ওহির তিলাওয়াত হয় না, তার নাম হাদীস। আল্লাহ তা'য়ালা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী: ফযীলত ২য় বর্ষ

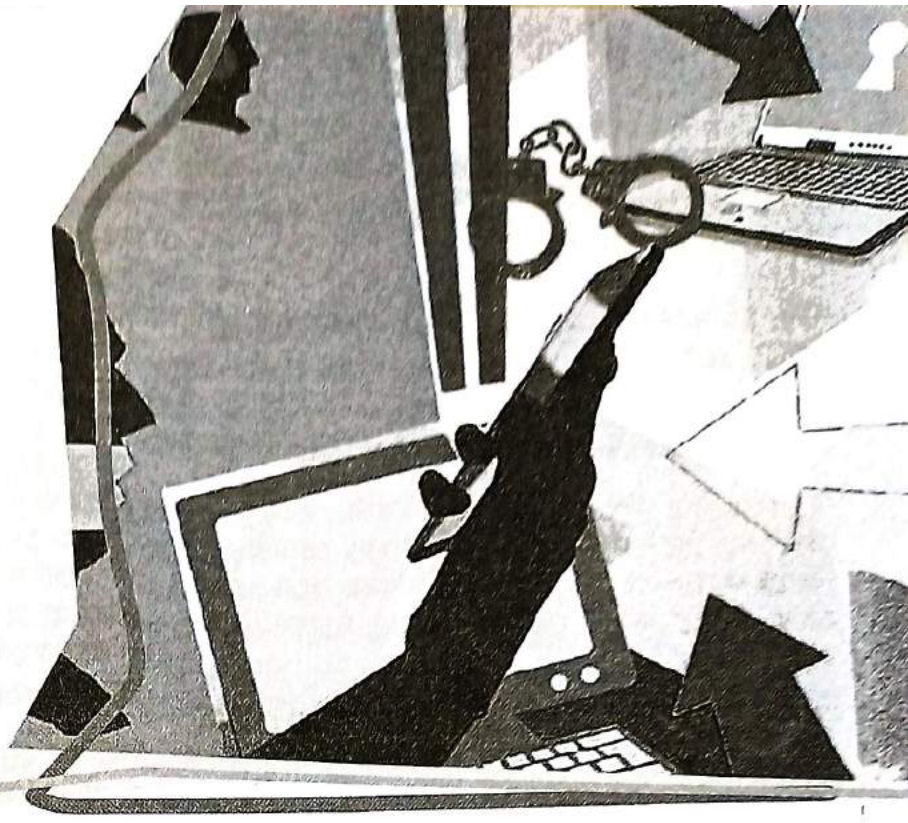

অপরাধ দমনে ইসলাম

হোসাইন আহমদ

অপরাধ কী? অপরাধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Crime, offense'। অপরাধ হচ্ছে উন্নত সমাজের বিচ্যুত আচরণের নাম। সাধারণ অর্থে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নীতি-আদর্শ, রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মসমূহকে অপরাধ বলে। অন্যভাবে বললে, যে সকল কর্ম আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অপরাধ। ধর্ম ও সমাজ ভেদে অপরাধের সংজ্ঞা ভিন্ন হয়ে থাকে। এক ধর্মে একটি বিষয় অপরাধ হলে অন্য ধর্মে তা স্মার্টনেস হয়ে থাকে। আবার এক সমাজের প্রচলিত রীতি অন্য সমাজের চোখে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, মদ্যপান, বিবাহ বহির্ভূত অবাধ মেলামেশা, লিভিং রিলেশনশিপ, পোশাকের স্বাধীনতা ইত্যাদি গর্হিত বিষয়াবলি পশ্চিমা সভ্যতায় ব্যক্তি স্বাধীনতার অংশ হলেও ইসলাম ও ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজে এগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের অপরাধ। তবে কিছু বিষয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সন্ত্রাসবাদ, চাঁদাবাজি, গুম, ধর্ষণ, জুয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সব সমাজে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ মনে করা হয়।

অপরাধের প্রতিক্রিয়া: সব ধরনের অপরাধই মানুষের মানসিক ও শারীরিক জগতে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে করে সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। অপরাধের প্রবণতা ও দৌরাত্মের সীমা ছাড়িয়ে গেলে অনাকাঙ্খিতভাবে সকলকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্মীয় অনুশাসনে ব্যত্যয় ঘটে। অপরাধের প্রাদুর্ভাবের ফলে অর্থ, সময় ও মেধার অপচয় ঘটে। হাসপাতাল, কোর্টকাচারি এমনকি জেলখানাতেও লোকসমাগম অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ লোপ পেয়ে বসে। ফলে মানুষ বিবেক বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে পার্থিব সফলতাকে একমাত্র মিশন হিসেবে বেছে নেয়। ফলশ্রুতিতে সর্বত্র আগুন প্রজ্বলিত হয়। আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে।

অপরাধ মুছে যাক, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হোক। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠুক- সভ্য সমাজের স্বপ্নে বিভোর প্রতিটি হৃদয়ের ঐকান্তিক চাওয়া এটা। ইসলামও চায় পৃথিবীতে কোনো অপরাধ না থাকুক। অপরাধ ও অপরাধীমুক্ত এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে উঠুক। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত রেখে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ দেখানোর জন্য।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। (সূরা তালাক: ৩-২)

অপরাধ দমনে ইসলাম এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কখনও অপরাধীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, কখনও বেত্রাঘাত করতে বলেছে, আবার কখনও অন্য কোনো উপায়ে অপরাধ থেকে নিবৃত করার প্রয়াস চালিয়েছে। ইসলামের বিধি-নিষেধ ও শাসনব্যবস্থাকে সামনে রাখলে এক কথায় বলা যাবে, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ও ইনসাফপূর্ণ ধর্ম। বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি, বক্রতা কিংবা

একঘেয়েমি এসব কিছু ইসলামে নেই। ইসলামের প্রতিটি বিধান সকল জাতিগোষ্ঠির কল্যাণের পক্ষে কথা বলে। জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইসলাম হচ্ছে ইনসাফের রোলমডেল। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا.

আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। (সূরা বাকারা: ১৪৩)

অন্যত্র বলেন-

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

যে তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, যতটুকু সে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে সে পরিমাণ তোমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো। আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা:১৯৪)

অপরাধ দমনে ইসলামের কতিপয় পদ্ধতি ও তার বৈশিষ্ট্য:

১. কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে: কেউ অপরাধ করলে, সেই অপরাধের শাস্তি সে পাবে, এটাই তো মূল বিধান। অপরাধ দমনের সর্বোচ্চ ও অধিকতর কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া।

ইসলামে শাস্তির বিধান তিন ধরনের:

ক. অনির্ধারিত শাস্তি। সমকালীন খলীফা বা বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনায় অপরাধ দমনে যে শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন, সেই শাস্তিই প্রদান করেন। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে তা'যীর বলে। ইসলামে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অপরাধ ব্যতীত বাকি সব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত নয়। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শাসকরা নিজ ইজতেহাদ ও চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে যেই অপরাধের শাস্তি যেটা নির্ধারণ করবেন জনগণের জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, হানাফি মাযহাব মতে অবিবাহিত নারী বা পুরুষ যিনা করলে শরীয়ত নির্ধারিত হদ্দ হচ্ছে একশত বেত্রাঘাত করা। এক বছরের দেশান্তরের কথা হাদীসে থাকলেও এটাকে তারা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সমকালীন বিচারপতি অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নির্বাসনকে ভালো মনে করলে করতে পারেন। যদিও শাফেয়ি মাযহাবে এটা নির্ধারিত হদ্দের অন্তর্ভুক্ত।

খ. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি। তবে তা আদায় করার দায়িত্ব অপরাধীর নিজের ওপর। বিভিন্ন ধরনের কাফফারা হচ্ছে এই প্রকারের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন- وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ.

যে মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে, সে একটি মুমিন গোলাম আযাদ করবে। (সূরা নিসা:৯২)

গ. কুরআন ও হাদীস দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি। যা কার্যকর করার দায়িত্ব খলীফা বা বিচারকের। এক্ষেত্রে খলীফা বা বিচারকের নিজস্ব সিদ্ধান্তের কোনো সুযোগ নেই। বরং কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত শাস্তিই তিনি প্রয়োগ করতে হবে। হদ্দ ও কেসাস হচ্ছে এই প্রকারের শাস্তি।

কেসাস হলো কোনো মুসলমান বা জিম্মিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে হত্যাকারীকে বিচারকের বিচারের ভিত্তিতে হত্যা করা। কেসাসের হকদার চাইলে ফিদয়া গ্রহণ করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার অধিকার রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যাকে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা:১৭৮)

পরের আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমাদের জন্য কেসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। সম্ভবত তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা বাকারা: ১৭৯)

হদ্দ হলো সাক্ষী প্রমাণ অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। তবে অপরাধী যদি অপরাধ স্বীকার করার পর আবার অস্বীকার করে তাহলে ভিন্ন কথা।

শরীয়তে হদ্দ পাঁচ প্রকার :

১. অবিবাহিত নারী ও পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি হচ্ছে একশত বেত্রাঘাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

যিনাকারী নারী ও পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত করো। (সূরা নূর:২)

রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন-

"عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرفيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.

হযরত যায়েদ বিন খালিদ জুহানি রা. বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে অবিবাহিত যিনাকারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের নির্দেশ দিতে শুনেছি। (বুখারি-৬৮৩১)

২. যিনাকারী নারী ও পুরুষ বিবাহিত হলে তাদের শাস্তি হচ্ছে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।

কুরআনের এই সম্পর্কিত আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেলেও এর হুকুম বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে সকল একমত।

কুরআনের আয়াত ছিলো- الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة.

বিবাহিত নারী ও পুরুষ যিনা করলে তাদেরকে অবশ্যই পাথর নিক্ষেপে হত্যা করো।

রাসূলুল্লাহ সা. হযরত মায়িযে আসলামি রা. ও হযরত রিফাআ রা. এর স্ত্রীকে বিবাহিত অবস্থায় যিনা করার কারণে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩. কারো বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দিয়ে চার সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে এর শাস্তি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

যারা কোনো পূতপবিত্র নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়ার পর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে। কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।

ওরাই পাপাচারী। (সূরা নূর:৪)

৪. কোনো ব্যক্তি কারো সংরক্ষিত সম্পদ থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ কিছু চুরি করলে শরীয়ত তার ডান হাত কাটার নির্দেশ দেয়।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

চোর পুরুষ ও নারী উভয়ের হাত কেটে ফেলো তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ। আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা:৩৮)

৫. মদ্যপানকারীর শাস্তি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত।

"عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمرين الخطاب استشارفي الخمريشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذ اسكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر فيا لخمر ثمانين. رواه مالك.

হযরত ছাওর ইবনে যায়েদ দায়লামি রা. বলেন, হযরত ওমর রা. মদ্যপানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হযরত আলি রা. বলেন, আমার পরামর্শ হচ্ছে, মদ্যপানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন। কেননা মানুষ যখন মদ্যপান করে তখন নেশাগ্রস্ত হয় আর যখন নেশাগ্রস্ত হয় তখন মাতাল হয়ে যায় আর যখন মাতাল হয় তখন মিথ্যা রটনা করে। তখন ওমর রা. মদ্যপানের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেন। (মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল আশরিবা৪২/২-)

২. প্রতিরোধমূলক: ইসলাম অপরাধের পথ খোলা রেখে অপরাধ করার সুযোগ দেয় না। বরং অপরাধ সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ তালাশ করে বের করার পর এর স্থায়ী সমাধানের পথ বাতলে দেয়।

সাধারণত দু'টি কারণে মানুষ অপরাধ করে থাকে-

১. অর্থের অভাবে কিংবা অধিক পরিমাণে সম্পদশালী হওয়ার লোভে।

২. নৈতিক অবক্ষয় ও জৈবিক চাহিদার ফলে।

প্রথম সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম সম্পদের সুসম বণ্টনের নির্দেশ দেয়। যাকাতের বিধান, ওয়ারিশদের হক, ইত্যাদি বিষয়াবলি দারিদ্র্য বিমোচন করে। সম্পদের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। কুরআন, হাদীস এসব বিধানকে সবিস্তর আলোচনা করেছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ করেছেন। এক আয়াতে বলেছেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

তোমরা নামাজ কায়েম করো। যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (সূরা বাকারা- ৪৩)

যাকাত কাদেরকে দেওয়া হবে, সেটাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এরশাদ করেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

যাকাত দেওয়া যাবে গরীবদেরকে, মিসকীনদেরকে, যাকাত উসুলকারীদেরকে, কাফেরদেরকে ইসলামের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টির জন্য (এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে), গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্থদেরকে, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদেরকে এবং মুসাফিরদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধানস্বরূপ। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা:৬০)

যাকাত এবং সদকা দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সম্পদের অপবিত্রতা দূর হয়। রাসূলুল্লাহ সা. এক হাদীসে সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলেছেন-

أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثرما أعطاه.

ধনী সদকায়ে ফিতর আদায় করলে আল্লাহ তার সম্পদ পবিত্র করে দিবেন আর গরীব আদায় করলে আল্লাহ তাকে এরচেয়ে বেশি ফিরিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ২৭০/২-)

হাদীসে যদিও রাসূল সম্পদ পবিত্রকরণকে ধনীর সাথে ও সম্পদ বৃদ্ধিকে গরীবের সাথে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয়টি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে ওয়ারিশদের হক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে ঘোষণা করেছেন-

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমানা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে এমন জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তথায় সে স্থায়ী হবে। এটাই মহা সফলতা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তথায় সে স্থায়ী হবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সূরা নিসা:১৪-১৩)

দ্বিতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় নফস ও শয়তানের ধোঁকার ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা ও এর থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষের জৈবিক চাহিদা ও যৌবনের তাড়নার ফলে যিনা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি সংঘটিত হয়। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে পর্দার বিধান জারি করেছেন। নারী ও পুরুষের জন্য নিজেদের চক্ষু অবনমিত রাখতে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে নির্দেশ করেছেন। এরশাদ হয়েছে-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পূর্বেকার জাহিলি যুগের মত নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করো না। নামাজ কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত! আল্লাহ তাআলা চান, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূতপবিত্র করতে। (সূরা আহযাব:৩৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.

হে নবি! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চক্ষু অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সবকিছু জানেন।

আর মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চক্ষু অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ পেয়ে যায় তা ছাড়া আর তারা যেন ওড়না দ্বারা নিজেদের বুক ঢেকে রাখে। (সূরা নূর:৩১-৩০)

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বেহায়াপনা প্রচারে নিরুৎসাহিত করে এর পরিণতি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

যারা মুমিনদের মধ্যে বেহায়াপনা প্রচার করতে ভালোবাসে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা নূর: ১৯)

আরেক আয়াতে অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি লাভ করো এবং তার অধিবাসীদেরকে সালাম না করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা নূর:২৭)

মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের হালাল ও উত্তম পন্থা হচ্ছে বিবাহ করা। বিবাহের মাধ্যমে একজন মানুষ তার ঈমান ও আমলের পূর্ণ হেফাজত করতে সক্ষম হয়। ইসলামে বিবাহের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনে বিবাহের আহকামসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন-

"عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشرالشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه"

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করতে সক্ষম, সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা দৃষ্টি অবনমিত রাখা ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণের জন্য অধিক সহায়ক আর যে এর সক্ষমতা রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা এটি তার জন্য নিবৃত্তিকারক। (বুখারি১১২/৯-, মুসলিম১০১৮/২-)

সর্বোপরি, নামাজের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অপরাধ ও গর্হিত কাজকে প্রতিহত করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

হে নবি! আপনার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা তেলাওয়াত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ বেহায়াপনা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়। তোমরা যা করো আল্লাহ সবকিছু জানেন। (সূরা আনকাবুত:৪৫)

৩. সংশোধনমূলক: আল্লাহর হক সম্বলিত বিষয়ে কেউ অপরাধ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবার প্রতি আহবান করেন। বান্দা যাতে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই সুযোগ দান করেন। খালিস নিয়তে তাওবা করলে আল্লাহ তার পাপ মোচন করে তাকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। খালিস তাওবা। তিনি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সূরা তাহরীম৮-)

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিদিন একশত বার ইস্তেগফার করতেন। (বুখারি ৬৭/৮-)

তাছাড়া ইসলাম মানুষকে আখলাকে হাসানা তথা উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি উৎসাহিত করে। উৎকৃষ্ট গুণাবলি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে মমত্ববোধ ও মানবিকতার প্রতি রাহনুমায়ি করে। শত্রুতার মোকাবেলায় উত্তম আচরণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

(শত্রুকে) এমন উত্তম পন্থায় প্রতিহত করো, তোমার আর যার মধ্যখানে শত্রুতা রয়েছে, দেখলে যেন মনে হয় সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (হা-মীম সেজদা:৩৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثرِ مايُدخِلُ الناسَ الجنةَ؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثرما يُدخِل الناسَ النار؟ فقال: الفم والفَرْجُ. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ."

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করা হলো, অধিকতর কোন জিনিস মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, অধিকতর কোন জিনিস মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি উত্তর দিলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযি, হাদীস২০০৪-)

৪. ক্রমান্বয়ে অপরাধকে দমন করা: ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে মানুষ সর্বপ্রকার অন্যায় ও অপরাধে জড়িত ছিলো। ইসলাম এসে সকল অপরাধকে এক সাথে দমন করতে যায় নি। এভাবে ইসলামের সকল বিধান এক সাথে প্রয়োগ করারও প্রয়াস চালায় নি। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইসলাম প্রথমে মানুষকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিয়েছে। তারপর মোটামুটি ঈমান প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করেছে। ঠিক তেমনি সকল অপরাধ ও বেহায়াপনা থেকেও এক সাথে বারণ করে নি। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটাকে নিষিদ্ধ করেছে। যাতে মানুষের কষ্ট না হয়। প্রথমে কবিরা গোনাহ নিষিদ্ধ করেছে। তারপর সগিরা গোনাহ থেকে। কেননা ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। সহজতা হচ্ছে ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষকে সাধ্যের বাইরে বাধ্য করতে ইসলাম পছন্দ করে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন- يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করতে চান, তোমাদের উপর কঠিন করতে চান না। (সূরা বাকারা:১৮৫)

অন্যত্র বলেন- لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ.

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বাধ্য করেন না। তার কর্মফলের উপকার ও অপকার সেই পাবে। (সূরা বাকারা:২৮৬)

কুরআন তেইশ বছরে এক আয়াত, দুই আয়াত, এক সূরা, অর্ধ সূরা করে নাযিল হওয়ার অন্যতম হেকমত হচ্ছে এটা। ক্ষেত্র ও পরিবেশ বুঝে মানুষকে একটা একটা করে সকল প্রকার অন্যায় ও অপরাধ থেকে মুক্ত করা। কেননা জাহিলি যুগে মানুষ যে সকল অপরাধে নিমজ্জিত ছিলো, তা তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসছিলো। এক সাথে সবগুলো প্রতিহত করতে গেলে হিতে বিপরীত দেখা দিতো। রশ্মি ছিড়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। এভাবে কখনও নির্দিষ্ট কোনো একটি অপরাধকেও ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করেছেন। যাতে তার অনিষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সমূলে নির্মূল করা যায়। উদাহরণস্বরূপ মদ্যপানকে মোট চার বারে হারাম করেছেন:

প্রথমবার শুধুমাত্র মদের অনুৎকৃষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন-

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তোমরা নেশাজাত দ্রব্য ও উত্তম রিযিক গ্রহণ করো। (সূরা নাহল:৬৭)

এখানে উত্তম রিযিকের বিপরীতে নেশাজাত দ্রব্যকে উল্লেখ করে অপকারিতা ও অনুৎকৃষ্টতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বারে মদ্যপানের ক্ষতির উল্লেখ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আপনি বলুন, এতদুভয়ে রয়েছে বড় গোনাহ ও মানুষের জন্য কিছু উপকার। এগুলোর উপকার থেকে গোনাহ অনেক বড়। (সূরা বাকারা: ২১৯)

তৃতীয়বারে শুধুমাত্র নামাজের সময় মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো। (সূরা নিসা: ৪৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে, একবার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. কিছু সাহাবিকে ওয়ালিমায় দাওয়াত করলেন। আলি রা. এর ভাষ্যমতে, আমাদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে মদ্যপান করালেন। আমাদেরকে নেশা আচ্ছন্ন করলো। তখন নামাজের সময় হয়ে গেলো। সকলে আমাকে ইমামতি করার জন্য সামনে দিলেন। আমি কেরাত পড়তে শুরু করলাম-

"قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ماعبدتم"

এভাবে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। (আবু দাউদ- ৩৬৭১)

চতুর্থবারে মদ্যপানকে চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। বেশি পান করলে হারাম, কম পান করলে হারাম নয়- এমন কোনো সুযোগ রাখেন নি। নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথেও হারামকে সম্পৃক্ত করেন নি। সর্বাবস্থায় যা কিছুই পান করা হবে, তা হারাম হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ হচ্ছে অপবিত্র। শয়তানের কার্য। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (সূরা মায়েদা:৯০)

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট: পূর্বের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এমন অবস্থা হলো, সাহাবায়ে কেরাম এশার নামাজ আদায়ের পর মদ্যপান করতেন। একদিন এভাবে কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মদ্যপানের পর বসে গল্প করছিলেন। তাদেরকে নেশা আচ্ছন্ন করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সা. এর চাচা হামযা রা. ও সেখানে ছিলেন। তখন একটি ছোট বাদী তাদের সামনে গান করছিলো। সে গানের মধ্যে বলে উঠলো,

'ألا ياحمز للشرف النواء - وهن معقلات بالفناء'

তখন হামযা রা. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে আলি রা.এর দু'টি উট ও একটি গরুকে জবাই করে ফেললেন। আলি রা.দুঃখভরা হৃদয়ে রাসূল সা. এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখন হামযা রা. এর তিরস্কার করতে লাগলে জবাবে হামযা রা. বলেন- 'وهل أنتم إلا عبيد لأبي.'

তোমরা তো হলে আমার বাপের গোলাম।

রাসূল সা. বুঝতে পারলেন যে, হামযা নেশাগ্রস্ত। তাই কোনো বিচার করতে গেলেন না। তখন ওমর রা. আল্লাহর কাছে দোআ করলেন- 'اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا'

তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে মদ্যপানকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ ৩৬৭০-)

ইনসাফ ভিত্তিক : ইসলাম অন্যায়, অপরাধ ও জাহিলিয়্যাতকে দমন করতে নির্দিষ্ট কোনো একটি পন্থা অবলম্বন করে নি। অপরাধের স্তরভেদে দমন পদ্ধতিও ভিন্ন হয়েছে। কথায় আছে, 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর'। ইসলামও পরিবেশ, পরিস্থিতি বুঝে যখন যেটা দরকার, তখন সেটা ব্যবহার করেছে। বড় অপরাধের বিরুদ্ধে শক্ত

তখন সেটা ব্যবহার করেছে। বড় অপরাধের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ছোট অপরাধের বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। ইনসাফের চাহিদাও এটা।

ইসলাম অপরাধ বা অন্যায়ের অবস্থা বিবেচনা করেছে। মানুষের মধ্যে সমতা বজায় রেখেছে। ইসলামে কে বড়- কে ছোট, কে আরব কে আজম, কে কুরাইশি, কে অন্য গোষ্ঠীর লোক, কে কাছের কে দূরের- এটা পরওয়া করা হয় না। দেখা হয়, কে বড় অপরাধের সাথে জড়িত আর কে ছোট অপরাধের সাথে জড়িত? কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে অগ্রগামী আর কে পিছুগামী? কে দোষী আর কে নির্দোষ?

ইয়াহুদিরা তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা অপরাধ করলে তাওরাতের বিধানকে তাহরীফ করে শাস্তি হালকা করে নিতো আর দুর্বলরা কোনো অপরাধ করলে তার সঠিক বিচার করতো। নিজেদের স্বার্থে তাওরাতের মধ্যে রদবদল করে ফেলতো। কিন্তু ইসলামে এসবের কোনো স্থান নেই।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন-

أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذ اسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها. متفق عليه

বনু মাখজুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিলো। এতে কুরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করে, কে নবিজি সা. এর কাছে এ ব্যাপারটি উত্থাপন করতে পারবে? তাঁর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ রা. ছাড়া আর কে এ সাহস করতে পারবে? এরপর উসামা রা. রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন রাসূল সা. বলেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে একটি দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতি ছিলো যে, যখন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ সা.এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেবো। (বুখারি৩৪৭৫-, মুসলিম- ১৬৮৮)

ইসলাম অপরাধের শাস্তি দেওয়াকেই শুধু দায়িত্ব মনে করে না। অপরাধকে চিরবিদায় করতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। এজন্য সব অপরাধের শাস্তি এক হয় না। যেটাকে যেভাবে দমন করা সম্ভব সেটাকে সে ভাবে দমন করার চেষ্টা করেছে। ইসলামের মৃত্যুদণ্ড বিধান কিংবা অঙ্গহানির বিধানের উপর অনেকে আপত্তি তুলতে চায়। এগুলোর অসারতা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু ইসলাম যে হেকমতে এই বিধান দিয়েছে সেটা বুঝতে চায় না। ইসলামের বিধানসমূহের মধ্যে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, এর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, ইসলাম কতটা যুক্তিপূর্ণ ও মানবিক ধর্ম।

যদি শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়ার জন্য এসব বিধান জারি করা হতো, তাহলে ইসলামি ইতিহাসে এই শাস্তি প্রয়োগের অনেক ঘটনা বর্ণনা হতো। অথচ, রাসূলুল্লাহ সা. এর পূর্ণ নবুওয়াতি জীবনে মাত্র দু'জন ব্যক্তিকে যিনার কারণে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়েছে আর অল্প সংখ্যক কিছু চোরের হাত কাটা হয়েছে বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। এথেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের কঠোর ও শক্ত এসব বিধানাবলি অপরাধকে নির্মূলভাবে ধ্বংস করার জন্য এবং এক-দু'জনের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং বলা যাবে, ইসলামের অপরাধ দমন পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট, ইনসাফপূর্ণ ও মধ্যপন্থী।

শিক্ষার্থী: ফযীলত ২য় বর্ষ

(প্রবন্ধ)

এখতেলাফ ও খেলাফ পরিচয় ও ব্যবধান

আনওয়ার হুসাইন

اختلاف শব্দের ব্যাখ্যা : আল্লামা রাগিব আল-আসফাহানি রাহ. তার ''আল মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআনে বলেন-اختلاف এবং مخالفة হচ্ছে প্রত্যেকে তার অবস্থা বা মতের ক্ষেত্রে অপরের বিপরীত মত পোষণ করা। خلاف হচ্ছে তার চেয়ে ব্যাপক। এর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের অর্থও আছে। কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন একটি অপরটির বিপরীত নয়। اختلاف এর কারণে কখনো ঝগড়া ও বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাই কখনো রূপকার্থে اختلاف ঝগড়া-বিবাদের অর্থে ব্যবহার হয়। এ অর্থেই আল্লাহর বাণী- فاختلف الأحزاب من بينهم (সূরা মারয়াম- ৩৭) এবং ولايزالون مختلفين (সূরা হুদ- ১১৮)।

ইখতেলাফ শব্দের মধ্যে মূলত কিন্তু ঝগড়া-বিবাদের অর্থ নেই। আর خلاف হচ্ছে ব্যাপক।

আল্লামা আবুল কাফায়ি তার كليات নামক কিতাবে اختلاف ও خلاف র মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন- (১) اختلاف হচ্ছে যার পদ্ধতি ভিন্ন হবে, উদ্দেশ্য এক হবে। আর خلاف হচ্ছে যার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য উভয়টি ভিন্ন হবে। (আল মুফরদাত- ১৭২)

(২) اختلاف যা দলিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে, خلاف যা দলিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

(৩) اختلاف হলো রহমতের নিদর্শন, خلاف হলো বিদআতের নিদর্শন।

(৪) কাজী সাহেব خلاف এর ফয়সালা দিলে তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকে; اختلاف এ যার সুযোগ নেই। কেননা, خلاف এমন জায়গায় হয়, যাতে ইজতিহাদ জায়েয নয়। অর্থাৎ তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিপরীত।

সংক্ষেপে বলা যায়- اختلاف- যাতে মতপার্থক্যকারীদের উদ্দেশ্য এক থাকা সত্ত্বেও 'মাধ্যম' এর ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকে, خلاف–যাতে মতপার্থক্যকারীদের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম উভয়টিতে ভিন্নতা থাকে। (কুল্লিয়্যাত- ৭৯/১)

ইখতিলাফের প্রকারভেদ : ইখতিলাফ বা মতভেদ দু'প্রকার: (ক) محمود বা প্রশংসনীয়। (খ) مذموم বা নিন্দনীয়। বলা বাহুল্য, শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যারা সঠিক ধারণা রাখে না, তারা মতভেদ শব্দটি শোনলেই ভ্রুকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা যেন বিব্রত হয়ে পড়েন। তাদের জানা থাকা উচিত যে, মতভেদ মাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ, স্বয়ং দলীল ঐ মতভেদের উৎস। আর কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে। দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলিলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস। প্রথমটি প্রশংসনীয়এবং এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা ভুল এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অন্যায়। দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়। শরীয়তে যার কোনো স্থান নেই। ফুরুয়ি বা শাখাগত বিষয়ে মতভেদ হতেই পারে, তবে তা বিবাদের কারণ না হওয়া চাই। এ ধরনের বিষয়ে মতভেদ নবি করীম সা. র যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবা ও তাবেয়িনের যুগেও ছিল, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

নবি সা. এর যুগ: (১) রাসূলুল্লাহ সা. গায়ওয়ায়ে আহযাব [খন্দকের যুদ্ধ] 'র মতো কঠিন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। ইতোমধ্যে জিবরীল আ. এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো এখনো পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন, এটাই আল্লাহর আদেশ। রাসূল সা. বললেন– কোন দিকে যাব? জিবরীল বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ওই দিকে। রাসূল সা. সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং হযরত বিলাল রা. কে ঘোষণা দিতে বলেন যে,

من كان سامعا مطيعا لنا فلايصلينا لعصر إلا في بني قريظة

যে রাসূলের বাধ্য ও অনুগত, সে যেন বনু কুরায়যায় যেয়েই আসরের নামাজ পড়ে। ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে আসরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবি রাসূলের আদেশের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমরা বনু কুরায়যায় গিয়ে নামাজ পড়ব। আরেক দল রাসূলের নির্দেশ দানের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে বললেন– আমরা আসরের নামাজ রাস্তায় পড়ে নেব।

কেননা রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল না যে, আমরা নামাজ কাযা করে নেই। বরং উদ্দেশ্য ছিল আমরা যেন দ্রুত বনু কুরাইযায় গিয়ে পৌঁছি। বর্ণনাকারী বলেন-

فصلت طائفة إيمانا واحتسابا وتركت طائفة إيمان اواحتسابا

"যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তাঁরাও রাসূলের প্রতি ঈমানের কারণে সওয়াবের আশায় নামাজ পড়েছেন। আর যারা কাযা করেছেন, তারাও রাসূলের উপর ঈমানের কারণে সওয়াবের আশায় কাযা করেছেন।" পরিশেষে এই ঘটনা রাসূলের সামনে উপস্থাপিত হল। রাসূল সা. কোন দলকেই তিরস্কার করলেন না। যেহেতু প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নবিজির আনুগত্য ও আদেশ পালন। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযী: ৪১১৯, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ: ১৭৭০)

(২) রাসূল সা. থেকে সাহাবায়ে কেরাম রা. কেরাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেউ এক কেরাতে পড়তেন, কেউ অন্য কেরাতে পড়তেন। কারণ সাত কেরাতে কুরআন পাঠের অনুমোদন ছিল। কেরাত নিয়ে ভিন্নতা হয়েছে নবির যুগে। ইমাম বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর রা. বলেন, আমি রাসূল সা.র জীবদ্দশায় হিশাম ইবনে হাকিমকে সূরা ফুরকান পড়তে শোনলাম। খেয়াল করে শুনলাম যে, তিনি এমনসব হরফে সূরাটি পাঠ করেছেন যা, রাসূল সা. আমাকে শিখাননি। (তিনি বলেন) মনে হচ্ছিল নামাযের মধ্যেই তাকে ধরে নেব। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতঃপর রুমাল দিয়ে তার গর্দান বেঁধে বললাম– এই সূরাটি কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে? বললেন– রাসূল সা. শিখিয়েছেন। তখন আমি তাঁকে বললাম– তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসূল আমাকেও এই সূরাটি শিখিয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। অতঃপর তাকে টেনে নিয়ে রাসূলের খেদমতে উপস্থিত করে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে এমনসব হরফে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি, যা আপনি আমাকে শিক্ষা দেননি। তখন রাসূল বললেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। পরে হিশামকে পড়তে বললে হিশাম আগের মতোই পড়লেন। রাসূল সা. বলেন أنزلت هكذا "এভাবেই কুরআন নাযিল হয়েছে"। তারপর বলেন "নিশ্চয় এ কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে, কাজেই যেভাবে তোমাদের সহজ হয় সেভাবে পড়"। কোন বর্ণনায় আছে রাসূল উমর রা. এর কেরাত শুনেও বলেছেন- এভাবেই কুরআন নাযিল হয়েছে। (বুখারি, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন: ৪৭০৬)

সাহাবায়ে কেরামের যুগে মতভেদ : এক. রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কোনো মহান ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করা। নইলে মুলমানদের ঐক্যে মুনাফিকদের দ্বারা ফাটল ধরানোর এবং ইসলামের গৌরবময় ভবন, তা জমিনে মিশে যাওয়ার আশংকা ছিল। তখন খলীফা নির্বাচনে মুসলমানগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যান। আনসারগণ বললেন– নেতা তাদের মধ্য থেকে হবেন। মুহাজিরগণ বললেন– নেতা আমাদের মধ্য থেকে হবেন। তখন হযরত আবু বকর রা. এক বক্তৃতা দেন এবং হাদীস শোনিয়ে দেন- الأئمة من قريش "ইমাম বা নেতা হবেন কুরাইশদের মধ্য থেকে।" তখন আনসারিগণ নীরব হয়ে গেলেন। আবু বকর রাযি.কে খলীফা বানাতে সবাই একমত হয়ে গেলেন। (খেলাফতে রাশেদা পৃ. ২৯)

দুই. রাসূলের ইন্তেকালের সাথে সাথে আরবে ধর্মান্তরের ফেতনা ছড়িয়ে পড়ল। এ সময়টি ছিল ইসলামের জন্য বড়ই নাজুক। অনেক সাহাবির পরামর্শ ছিল কিছুদিনের জন্য উসামা বাহিনীর (যা রাসূল পাঠিয়েছিলেন) যাত্রা মূলতবি রাখা হোক এবং প্রথমে মুরতাদদের শায়েস্তা করা হোক। কিন্তু আবু বকর রাযি. এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন না; বরং তিনি বললেন– আমি ঐ পতাকা খুলতে পারব না, যা রাসূল সা. নিজ হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। [খেলাফতে রাশেদা- পৃষ্ঠা ৩৮-৩৭]

তিন. যখন কিছু লোক আবু বকর রাযি. এর সময়ে যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন এ ফেতনা নিভানোর জন্য তিনি অন্য সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কতিপয় সাহাবি আরজ করলেন, এখন খুব নাজুক সময়, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে নমনীয় আচরণ করা হোক, কিন্তু আবু বকর রা. এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে বললেন, আল্লাহর কসম! একটি ছাগলের বাচ্চাও যদি তারা দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলের সময়ে দিত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। (খেলাফতে রাশেদা পৃ.৪০) অন্য বর্ণনায় আছে আমি জীবিত থাকতে কি দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যাবে? এরপর তাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন।

তাবেয়িনের যুগ: সাহাবিদের মাঝে যে রকম মতভেদ হয়েছে, তাবেয়িদের মধ্যেও এরকম মতভেদ হয়েছে। এজন্যে তা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়নি। যেমনটি আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন (হাত তোলা) নিয়ে মতভেদ, আমীন আস্তে পড়া, জোরে পড়া নিয়ে মতভেদ, হাত বাঁধা না বাঁধা, নাভীর উপরে না নিচে বাঁধা ইত্যাদি ফুরুয়ী বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। সকলেই নিজ নিজ ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন এবং অন্যটিকেও জায়েয বলেছেন। তাঁদের পরস্পরের সম্মানে কমতি হয়নি। শাফেয়ি রহ. আবু হানীফা সম্পর্কে বলেন-

أعد ذكر نعمان لنا أن ذكره هو المسك ماكررته يتضوع

"তোমরা বারবার আবু হানীফার আলোচনা করো, কেননা তা যেন মিশক, যা নাড়া-চাড়া করলে সুগন্ধি ছড়ায়।" আরো বলেন, "মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে আবু হানীফার পরিবারভুক্ত।" একবার শাফেয়ি রহ. আবু হানীফার কবরের কাছাকাছি স্থানে ফজরের নামায পড়েন, তখন আবু হানীফার সম্মানার্থে কুনুত পড়েননি। অথচ তার মাযহাবে ফজরে কুনুত পড়া হতো। তিনি বলতেন, আমি অনেক সময় ইরাকবাসীদের (আবু হানীফার) মাযহাবের উপর আমল করি। ইমাম মালিক রহ বলেন- যদি কোন কাঠের খুঁটিকে আবু হানীফা স্বর্ণের দাবি করেন, তাহলে তিনি যুক্তির নিরিখে তা প্রমাণ করতে সক্ষম। কিন্তু আজ আমাদের কিছু ভাইদের দেখা যায়, যারা আমীন জোরে বা আস্তে পড়া এবং রফয়ে ইয়াদাইন করা না করা নিয়ে এক দল অন্য দলের প্রতি কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। যা নিতান্তই ভুল ও মূর্খতা।

মতভেদের উৎস বা কারণ :

(১) কখনো মতভেদ হয় দলীল না জানার কারণে। কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে একজনের হয়তো হাদীস জানা আছে, অপরজনের জানা ছিল না। তাই তিনি ইজতিহাদে বাধ্য হয়েছেন।

(২) রাসূলের কাজের ধরন নির্ণয়ে পার্থক্য হতো। রাসূল একটি কাজ করেছেন। সাহাবিরা দেখে নিজ মানবিক চিন্তা অনুসারে কেউ এটাকে ওয়াজিব মনে করেছেন, কেউ মুবাহ মনে করেছেন। যেমন রাসূল হজ্বের সময় আবতাহ উপত্যকায় অবতরণ করেন। কেউ এটাকে হজ্বের সুন্নত বলেছেন, আর কেউ সুন্নত বলেন নি। (৩) রাসূলের বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য আয়ত্ব করতে না পারার কারণে।

(৪) কোন হুকুম বা বিধানের কারণ নির্ণয়ে মতভেদের ফলে।

(৫) কখনো দলীল-প্রমাণ বা হুকুম ভুলে যাওয়ার ফলে।

(৬) নস্ বা শরয়ী দলীল একাধিক থাকার কারণে।

(৭) আভিধানিক দৃষ্টিতে একটি শব্দের একাধিক অর্থ থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে মতভেদ হওয়ার কারণে। যেমন قروء শব্দ, যা হায়েয ও তুহুর উভয় অর্থকে শামিল রাখে। এবং والليل إذا عسعس এর মধ্যে عسعس শব্দ। যা রাত্রির আগমন ও চলে যাওয়া উভয়টিকে শামিল রাখে।

(৮) সমন্বয় সাধনে পার্থক্য হয়। তথা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমন্বয় করতে গিয়ে মতভেদ হয়।

বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা: শাখাগত বিষয়ে মতভেদের ক্ষেত্রে উম্মতের করণীয় কী– তা শরীয়তের দলীলের আলোকে ফিকহে ইসলামিতে বিবৃত হয়েছে। তার কয়েকটি তুলে ধরলাম–

(১) যে অঞ্চলে যে সুন্নাহ প্রচলিত আছে, সেখানে তা-ই চলতে দেওয়া উচিত। এর উপর আপত্তি করা যাবে না। আপত্তি হবে তাতে, যা কুরআন এবং সুন্নাহ পরিপন্থী। কিন্তু এক সুন্নাহর উপর এজন্য আপত্তি করা যাবে না যে, তা আরেক সুন্নাহর মোতাবেক নয়।

(২) যে সব মাসআলায় ইজতিহাদের প্রয়োজন, তাতে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। এসব মতভেদের কোন একটিকে গর্হিত বলা যাবে না। এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে গোমরা, ফাসিক ও বিদআতি বলা যাবে না। কারণ এর দ্বারা প্রকারান্তরে অপর একটি সুন্নতকে বেদআত বলা হয়ে যায়। খাইরুল কুরুন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন থেকে এ নীতিই অনুসৃত হয়ে আসছে। যাতে কারো দ্বিমত ছিল না। যেমন ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, মুহাম্মদ সা. এর সাথী-সাহাবিগণ মতভেদ করবে না তা আমি পছন্দ করি না। তারা কোনো বিষয়ের উপর একমত হয়ে যাওয়ার পরও কেউ তা ছেড়ে দিলে সে সুন্নত ছেড়ে দিল। আর তাদের মতভেদপূর্ণ কোন এক মত গ্রহণ করলে সে সুন্নত গ্রহণ করল। (সুনানে দারেমি: ১৫১)

আল্লামা কাসতাল্লানি রাহ. মুহাম্মদ সা. 'র উম্মতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– "তাদের ইজমা শরীয়তের দলীল। তাদের মতভেদ রহমত"। ইবনে তাইমিয়া রহ. তার مجمع الفوائد এ এমনই বলেছেন। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রহ. বলেন, "মুহাম্মদ সা. এর সাথীদের মতভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ"।

লেখক : শিক্ষার্থী, ফযীলত ২য় বর্ষ

(তারদীদ)

মওদুদিবাদ বনাম

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

মিনহাজ ইবনে মুনির উদ্দিন

হক্ব ও বাতিলের দ্বন্ধ নতুন কোন বিষয় নয়। মানব সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে এ দ্বন্ধ অব্যাহত। তবে সব বাতিল একই আকৃতি নিয়ে আসে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে আসে। কোনো কোনো বাতিল তো প্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করে বসে। আর কোনো বাতিল ছদ্মবেশে দ্বীনের ভেতর প্রবেশ করে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

ধর্মানুরাগীদের জন্য প্রকাশ্য বাতিলের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকা সহজ। কিন্তু দ্বীনের ভেতরে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা বাতিলের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। কারণ, এরা কুরআন ও হাদীসকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক আলোচিত সৈয়দ আবুল আলা মওদুদি ছিলেন এদের অন্যতম।

১৩২১ হিজরি মোতবেক ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দরাবাদ প্রদেশের আওরঙ্গবাদ জেলায় তার জন্ম। তিনি একজন মেধাবী ও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। দক্ষ্য লেখক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এক সময় নিজেই একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'তরজমানুল কুরআন'। তবে দুঃখজনক হল, তার কলম, মেধা ও শ্রম হক্বের পথে ব্যয় হয়নি। বরং বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।

প্রথমদিকে তিনি তার পত্রিকায় আধুনিক যুগের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করতেন। তুলে ধরতেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামের মধ্যকার অনেক বিষয়াশয়। তার লেখায় আকর্ষণ থাকার কারণে অনেক বিজ্ঞ আলেম তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবি, মাওলানা মঞ্জুর নুমানি, সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়রি, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহি প্রমূখ তাদের অন্যতম। প্রথমে যদিও তারা তার সাথে ছিলেন। পরবর্তীতে উপলব্ধি করলেন তার মাঝে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। এমনকি তার অনেক দৃষ্টিভঙ্গি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী। তখন তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়, নবি করীম -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের অনুসৃত পথের অনুসারীদেরকেই।

সৈয়দ আবুল আলা মওদুদি সাহেব কুরআনের পরিভাষা, তাফসীর, ইসমতে আম্বিয়া (নবিগণ নিষ্পাপ), নবুওতের দায়িত্ব পালন, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, তাদের অবমাননা, তাকলীদ (মাযহাব অনুসরণ), মাযহাব পরিবর্তন, তাসাউফ, দাওয়াত ও তাবলীগসহ এ রকম অজস্র মাসআলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীতে নিজস্ব মনগড়া বক্তব্য দাড় করেছেন।
এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করব!

নবিগণ নিষ্পাপ ও নবুওতের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গ:
মওদুদি সাহেবের মতে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন এবং তারা নবুওতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন।

তিনি বলেন- "আল্লাহ ইচ্ছাকৃত প্রত্যেক নবি থেকে কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটা গুনাহ ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবিদেরকে খোদা মনে না করে বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে।"

আরো বলেন- "অন্যদের কথাতো স্বতন্ত্র, প্রায়শই পয়গাম্বরগণও তাদের কুপ্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন।"

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল আম্বিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ এবং তারা সমালোচনার উর্ধ্বে।

الفقه الأكبر গ্রন্থে রয়েছে–

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر و الكبائر و الكفر والقبائح

আম্বিয়ায়ে কেরাম ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র। (আল ফিকহুল আকবর- ৯৯)

মোল্লা আলি ক্বারী রহ. লিখেন-

عصمة الأنبياء من الكبائر و الصغائر قبل النبوة وبعدها.

আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গুনাহ থেকে মা'সুম তথা নিষ্পাপ। (মিরকাতুল মাসাবীহ ২৪৪/১)

পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম আল্লামা শফী রহ. লিখেন- "চার ইমাম সহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবিগণ ছোট বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।"

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة

তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব- ২১)

বলা বাহুল্য, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গোটা জীবনকেই আদর্শ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দোষ-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত না হলে তাকে এরূপ আদর্শ ব্যক্তিত্ব আখ্যায়িত করা যেত না।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم.

(নবি!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

অত্র আয়াতে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন ও ক্ষমা লাভের মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। সুতরাং নবিদের থেকে পাপ সংঘটিত হয় না বিধায় তাঁর অনুসরণকে আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রাপ্তির মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কী আশ্চর্য দর্শন মওদুদি সাহেবের। নবিগণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন- এটা তাদের মানুষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হল না, অধিকন্তু তারা মানুষ- সেটা প্রমাণ করার জন্য তাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত করাতে হল!!

সংশয় নিরসন:

কুরআনের কিছু আয়াতের দিকে তাকালে এ সংশয় উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে, নবিগণ নিষ্পাপ কি না; কেননা বিভিন্ন আয়াতে নবিগণকে উদ্দেশ্য করে ইস্তেগফার ও তাওবার কথা বলা হয়েছে।

যেমন: হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে-

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه (البقرة:٣٧)

অন্যত্র আছে

وعصى آدم ربه فغوى. (طه:١٢١)

নবি কারীম -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- প্রসঙ্গে-

واستغفر لذنبك وللمؤمنين و المؤمنات (محمد:١٩)

অন্যত্র বলেন-

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (النصر:٣)

এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি জবাব নিম্নরূপ:

(১) কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে অথবা বেখেয়ালে নবিদের থেকে কিছু কাজ সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নবিদের মাকাম অত্যন্ত উচ্চ এবং মহান ব্যক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সেটাকে বড় ধরা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাজকে পাপ ও অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো পাপই নয়। যেমন বলা হয়-حسنات الأبرار سيئات المقربين

(১) নবিগণ কর্তৃক সর্বোত্তম পর্যায়ের আমল বর্জন করাকেই পাপ বলে আখ্যায়িত করে তাঁদের তিরস্কার করা হয়েছে। যদিও তাঁরা যেটা করেছেন সেটা উত্তম। তবে সর্বোত্তম নয়। আল্লাহর সাথে তাদের অধিক নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে তাদের দ্বারা সর্বোত্তমটা বর্জন যেন অন্যের দ্বারা ওয়াজিব বর্জন করার মত।

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি ও তাদের সমালোচনা প্রসঙ্গ:

মওদুদি সাহেবের মতে- সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন এবং তাদের সমালোচনা শুধু জায়েয মনে করেন না; বরং জরুরি মনে করেন। তিনি বলেন-

"রাসূলে খোদাকে ছাড়া কাউকে হক্বের মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না।"

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে- সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি, সকল সাহাবি আদিল। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুসামারাহ'তে বলা হয়েছে-

اعتقاد أهل السنة و الجماعة تزكيةجميع الصحابة رضـ وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল- আবশ্যিক ভাবে সমস্ত সাহাবির জন্য 'আদালত' গুণ মেনে নিয়ে তাঁদেরকে পবিত্র সাব্যস্ত করা। দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের প্রশংসা করা।

কুরআনের অনেক আয়াতে এবং নবিজির অসংখ্য হাদীসে, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান, আমল ও মাসলাককে মাপকাঠিরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি তাঁদের সমালোচনাকে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- آمنوا كما آمن الناس.

এই লোকেরা (তথা সাহাবিরা) যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আনো। (সূরাতুল বাকারা- ১৩)

উল্লেখ্য, আয়াতে 'নাস' বলে সাহাবায়ে কেরামকেই বুঝানো

হয়েছে। এটি সর্বসম্মত মত। কারণ, কুরআন অবতরণকালে কেবল তারাই ছিলেন ঈমানদার। প্রমাণিত হল সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের মাপকাঠি।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، و إن تولوا فإنما هم في شقاق.

তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যে রকম ঈমান তোমরা (তথা সাহাবিগণ) এনেছ। তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। (সূরাতুল বাকারা- ১৩৭)

এ দু'আয়াতে সাহাবিদের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে।

অন্যদিকে সহীহ বুখারিতে রয়েছে–

عن أبي سعيد الخدريرضـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مدّ أحدهم ولا نصفيه".

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, নবিজি ইরশাদ করেন- তোমরা আমার সাহাবিদের সমালোচনা কর না। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌঁছতে পারবে না। (সহীহ বুখারি- ৩৬৭৩)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

عن عبد الله بن مغفل رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم و من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله و من آذى الله فيوشك أن يأخذه

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন- তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবিদের ব্যাপারে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবিদের ব্যাপারে। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। বস্তুত যে তাদেরকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল এবং যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিবে, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, সে অতিসত্তর পাকড়াও হবে। (সুনানে তিরমিযি- ৩৮৬২)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। তারা ন্যায়পরায়ন। তাঁদের সমালোচনা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অনুসৃত নীতির বাহিরে গিয়ে সাহাবিদের সমালোচনায় লিপ্ত হবে সে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী।

ইমাম আবু যুরআহ রহ. বলেন-

"যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে সে কোন সাহাবির সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিন্দীক-ধর্মত্যাগী। কারণ, আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল হক্ব। কুরআন হক্ব। আর এই কুরআন ও হাদীস সাহাবায়ে কেরামই আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এই সূত্র-পরম্পরাকে বিক্ষত করতে। যাতে পরিণামে পুরো কুরআন-সুন্নাই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ, এরা যিন্দীক-ধর্মত্যাগী।

শিক্ষার্থী: ফযীলত ২য় বর্ষ

(সীরাত)

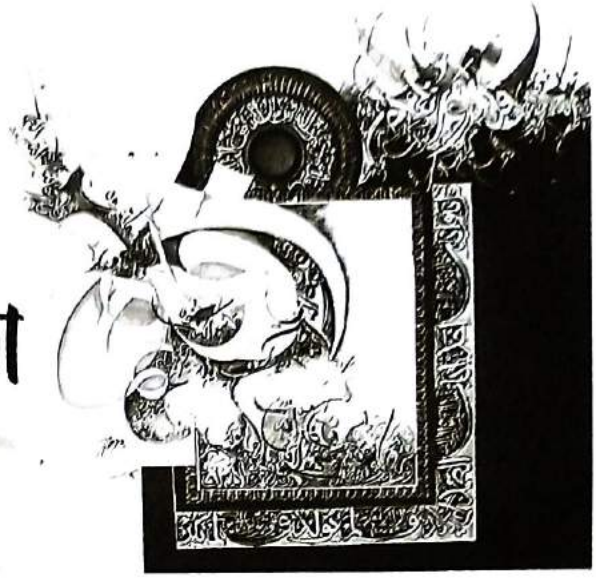

মুমিনের ভালোবাসা

মুবীনুল হক্ব

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাঁকে আন্তরিকভাবে ভালো না বাসলে পূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না। যাঁর ভালোবাসা খোদা তায়ালার ভালোবাসারই নামান্তর। যে প্রেমে খোদাকে পাওয়া যায়, ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করা যায়।

যে প্রেম ঈমানে আনে পূর্ণতা, বিশ্বাসকে করে শাণিত, জীবনকে করে মহিমান্বিত। মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- নবিপ্রেম। মুমিন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভক্তি করে সবচেয়ে বেশি। তার প্রেম-ভালোবাসায় ঢেলে দেয় হৃদয়ের সবটুকু অনুরাগ। হৃদয় গহীনে চাষ করে 'মুহাম্মাদ দর্শনের' মহান স্বপ্ন। শুভ স্বপ্ন। পবিত্র স্বপ্ন। তার এ ভক্তি অকৃত্রিম। এ অনুরাগ স্বর্গীয় সাফল্যের আশায়, পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণের নেশায়। এর বিপরীতে আপন সত্তা, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি তাঁর কাছে মূল্যহীন- তুচ্ছ। তাঁর প্রিয় নাম মুহাম্মাদ। হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদের স্মরণ। আত্মার প্রশান্তি প্রিয় নবির উচ্চারণ। সে শান্তি খোঁজে প্রিয়তমের অনুসরণ-অনুকরণে। নিজেকে উৎসর্গিত করে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে মুমিনের এই প্রেম-ভালোবাসার প্রামাণ্যতা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়াস পাব- ইনশাআল্লাহ।

মুমিনের এই ভালোবাসা ঈমানের দাবি। এই ভালোবাসা একজন ঈমানদারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পবিত্র এই প্রেমের পূর্ণতা গৌরবের। এবিষয়ে রাব্বে কারীমের বাণী যেমন স্পষ্ট, তেমনি আপোসহীন। পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলছে-

বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আলাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য -যাতে মন্দা পড়ার আশংকা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো- তাহলে আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (তাওবা- ২৪)

উল্লিখিত আয়াতে বাপদাদা, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সুখের ঘরবাড়ি সবকিছুর চেয়ে রাসূল সা.কে ভালোবাসতে বলা হয়েছে। অন্যথায় রয়েছে বিপদসংকেত।

এই ভালোবাসার গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রিয় নবিজির প্রিয় সাহাবি, উম্মাহরত্ন হাফিযুল হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মা-বাবা এবং সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয় না হব। (সহীহ বুখারি, হাদীস- ১৬)

অতএব, ঈমানের পূর্ণতার জন্য এই ভালোবাসা অনিবার্য। এই ভালোবাসা হতে হবে মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, সহায় সম্পদ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

এই ভালোবাসার ফল ও দীপ্তি :

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এই ভালোবাসা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যেমন আবশ্যকীয়, তেমনি তার ফলও অনন্য। দুনিয়া আখেরাত- উভয় জাহানেই এই মুহাব্বাত মুমিনজীবনের উত্তম পাথেয়, আত্মার জ্যোতি এবং মুক্তির অঙ্গীকার।

পার্থিব জীবনের ফলাফল: যে রাসূলকে ভালোবাসবে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। প্রিয় নবির স্নেহাশিস খাদিম আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। এক. তাঁর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় হতে হবে। দুই. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসবে। তিন. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে, ঈমানের পর কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে ঠিক তেমনি অপছন্দ করবে। (সহীহ বুখারি, হাদীস: ১৬; মুসলিম, হাদীস: ৪৩)

ঈমানের এই স্বাদ যে লাভ করেছে, সেই বলতে পারে এর মর্ম। তার জীবন হয়ে উঠে সুখের ও অনাবিল তৃপ্তির।

আখিরাতে পুরষ্কার: স্বয়ং প্রিয়তম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য।

নবিজির মিষ্ট ভাষায় শব্দের শৈল্পিক গাঁথুনিতেই শুনি এই মহা প্রতিদানের ঘোষণা। তিনি বলেন- المرء مع من أحب।

যে যাকে ভালোবাসবে, (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬১৬৯)

রোজ হাশরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে প্রিয়তম নবির স্নেহের পরশের চেয়ে আছে কি কোনো মূল্যবান বস্তু?

ভালোবাসার এই দাবি যৌক্তিক

নবিজির প্রতি মুমিন বান্দার এই প্রেম-ভালোবাসা, প্রীতি ও অনুরাগ যে কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ এবং শুধু ঈমানের দাবি- তা নয়; বরং এই ভালোবাসা সুস্থ বিবেক এবং যুক্তিরও দাবি।

স্বভাবত কাউকে ভালোবাসার উৎস চারটি। অনুগ্রহ, আত্মীয়তা, যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলী, সৌন্দর্য। এ কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উল্লিখিত গুণাবলীর একক সমাবেশ ঘটেছে রাসূলে আরাবি সা. এর মাঝে।

এক. উম্মতের প্রতি রাসূলের অনুগ্রহ

উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুগ্রহ অনেক। অসংখ্য। অগণিত। যখন পৃথিবী ছিল অত্যাচার অনাচারে জর্জরিত, নৈতিকতা ও মানবতা বিবর্জিত- তখন তাঁর আগমন হয়েছিল সাক্ষাৎ রহমতরূপে। আলোর প্রদীপশিখা নিয়ে, সাম্য-ন্যায়ের মশাল জ্বেলে আধাঁরে ঘেরা কুৎসিত এ সমাজকে মনুষ্যত্বের পাঠ দিলেন। দেখালেন আলোর পথ, প্রকৃত সাফল্যের ঠিকানা। মাটির মানুষকে পরিচিত করলেন তাঁর আসমানি মর্যাদার সাথে। তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত করলেন প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাস ও চেতনার, চরিত্র ও নৈতিকতার আকাশসম উচ্চতায় উড্ডয়নের এক সুপ্ত দুয়ার। মূর্খযুগ রাতারাতি বদলে গেল সোনালি যুগে। গোড়াপত্তন হল সভত্যার। জয় হল মানবতার। তিনিই আমার প্রিয়তম রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জগতবাসী সকলে মিলেও কি এঋণ শোধ করতে পারবে? না! কখনও না! এঋণ শোধ হবার নয়।

তাইতো কুরআনের ভাষ্যমতে তাঁর আগমনটা ছিল বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। সে রহমত ব্যাপ্ত ছিল সকলের তরে। সৃষ্টিকুলের জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। ইরশাদ হচ্ছে- وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

হে নবি! আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি। (আম্বিয়া- ১০৭)

ইমাম ত্বাবারি রাহিমাহুল্লাহ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন -নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত যাবত আগত সকল মাখলুকের প্রতি রহমত। এই রহমত থেকে উপকৃত হবে সকলে।

মুমিনের রহমত এজন্য যে, আল্লাহ তাকে নবির মাধ্যমে হিদায়াত দান করেছেন। সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলের হেদায়েত অনুযায়ী আমল করে ইহকাল ও পরকালের সুখ লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কী হতে পারে।

অবিশ্বাসীদের জন্যও ছিলেন রহমত। তাঁর ওসিলায় আল্লাহ তাদেরকে নগদ শাস্তি দিবেন না, যেমনটা দিয়েছিলেন পূর্ববর্তী কাফিরদেরকে। (তাফসিরে ত্বাবারি)

উম্মাতের প্রতি নবির অনুগ্রহ কেমন- তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিচ্ছেন সুন্দর বর্ণনায়, হৃদয়ছোঁয়া ভঙ্গিমায়-

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَه، فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ

প্রত্যেক নবির এমন একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা মাকবুল হবে। তারা (দুনিয়াতে) সে দোয়া করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। আমি আমার এই বিশেষ দোয়াকে কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের সুপারিশের জন্য মুলতবি রেখেছি। (মুসলিম :১৯৯)।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- এতে উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পূর্ণ মায়া-মমতা, দয়া-অনুগ্রহের কথা এবং তাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর প্রচেষ্টার কথা ফুটে ওঠেছে। তাইতো তিনি এই উম্মতের জন্য তাঁর বিশেষ দোয়া তাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য তুলে রেখেছেন।

এরচেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কী হতে পারে? যেদিন সকল নবিই নাফসী নাফসীর তাসবীহ জপবেন, সেদিন আমার প্রিয়নবি জপবেন 'উম্মাতী উম্মাতীর তাসবীহ!

যে নবি উম্মতের এত কল্যাণকামী। হিতৈষী। উম্মতের ব্যথায় যিনি হন ব্যথিত। যার মমতার বিস্তৃতি এতএত, তাঁর জন্য তো মনের চাওয়া এমন-

نکل جائے جانتیرے قدمونکے نیچے
یہی دلکی حسرت یہی آرزو ہے

'তোমার চরণতলে জীবন সঁপে দিই, এই তো জীবনের আশা আকুলতা।'

পাঠক, উম্মতদরদী নবির অনুগ্রহের উপাখ্যান শুনে বলতে তো পারিই - তোমাকে ভালোবাসি হে নবি!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দুই.

নবিজির যোগ্যতা ও গুণাবলী

যার আগমনে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত পৃথিবী সত্যের সন্ধান পেয়েছে, ধন্য হয়েছে। যাঁর হিদায়াতের পরশে এ ধরণী পেয়েছে নবজীবনের সন্ধান। বিদায় নিয়েছে সব আঁধার। সে প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যোগ্যতার পরিমাপ করা যায়? হিদায়াতের আলোকবর্তিকা তিনি। তার যোগ্যতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎকর্ষতার বিবরণ নিজেই দিচ্ছেন-

أوتيت علم الأولين والأخرين.

আমাকে দেওয়া হয়েছে আদি-অন্তের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান।

চারিত্রিক সুষমামণ্ডিত এই মহামানব, যার সান্নিধ্যে কট্টর শত্রুও হয়ে যায় আপন।

এক পলক দর্শনেই ভুলে যায় সব শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ। সেই নবির চারিত্রিক সৌন্দর্যের ঘোষণা দিচ্ছেন স্বয়ং রাব্বে কারীম-

إنك لعلى خلق عظيم

নিশ্চয় আপনি চারিত্রিক উৎকর্ষতায় অধিষ্ঠিত। (কলমঃ ৫)
এমন মহৎ গুণের অধিকারী নবিজি কি প্রেম-ভালোবাসার উত্তম পাত্র নন?!
তবে কে আছে তিনি বিনে? নেই! তিনি অনন্য। তুলনাহীন। উপমাহীন। অমন সুন্দর মনের মানুষটিকে ভালোবাসে না কোন সে অন্তর? কোন সে দিল?
শেখ সাদীর ভাষায়-
মহান স্বভাব চরিত্র মধুর
উম্মতের কাণ্ডারী নবি বিভুর।
কোন সে অন্তর? কোন সে দিল?

তিন.

নবিজির আত্মীয়তা

মানুষ আত্মীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে ভালোবাসে। সৃষ্টিকুলের সর্বাধিক নিকটতম আত্মীয় হচ্ছেন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরশাদ হচ্ছে-

النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم.....

"নবি সা. মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক ঘনিষ্ঠ। রাসূলের স্ত্রীগণ তাঁদের মা। (আহযাবঃ৬)। বরং প্রিয় রাসূল জন্মদাতা মায়ের চেয়েও আপন। নিঃসন্দেহে। কারণ, একজন মা সন্তানের পার্থিব সুখের চিন্তা করেন। পার্থিব কোন দুঃখ কষ্টে সন্তান জর্জরিত হোক -মমতাময়ী মা এটা কখনও চান না, চাইতে পারেন না।
কিন্তু প্রিয়তম নবি সা. -এর ভালোবাসা আরও শিকড়সমৃদ্ধ। তাঁর ভাবনা আরও গভীর। পৃথিবীটাকে সুখের রাজ্যে পরিণত করতে তিনি যেমন ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি পরকালের বিশাল জীবনে দোজখের আগুনে দগ্ধ হবে একটি মানবাত্মা -এটা তিনি সইতে পারতেন না। এই আশংকাটাই তাকে পীড়া দিত। ইহকালীন সুখ ও পরকালীন চিরশান্তি লাভের পথ বাতলে দিয়েছেন জীবনভর।
এমনকি হাশরের মাঠে যখন মা গর্ভের সন্তানকে স্বীকার করবে না, আপন পর সকলেই পরিচয় অস্বীকার করবে,দূরে ঠেলে দেবে-এমন কঠিন মুহূর্তে এগিয়ে আসবেন আমার প্রিয়তম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
একমাত্র নবি মুহাম্মাদই হবেন আপনজন, একমাত্র আশ্রয়স্থল ও ভরসার পাত্র।
সুতরাং যদি ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার কারণে কাউকে ভালোবাসতে হয়, তবে প্রিয়তম রাসূলকে ভালোবাসাই আত্মীয়তার দাবি। আত্মীয়তার এ দাবি পূরণে এসো সুর তুলি-

তব আগমনে ধন্য এ নিখিলভুবন
তোমাকে ভালোবাসে না কোন সে মন।

চার.

প্রিয় নবির সৌন্দর্য :

মানুষ সুন্দরের প্রতি দুর্বল। পার্থিব সৌন্দর্য মানুষকে আকর্ষণ করে। প্রেম-ভালোবাসার এই সমুদ্রে প্রিয়তম নবিজির সৌন্দর্য বর্ণনায় রচিত হয়েছে বহু শামায়েল গ্রন্থ, অসংখ্য কাব্য-ভাণ্ডার। তদুপরি নবিপ্রেমী সাহাবিরা নিজের মত করে এই শৈল্পিক রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা দিয়ে গেছেন অবিরত।
প্রখ্যাত সাহাবি জাবির ইবনে সামুরা -রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ভাষায় প্রিয়তমের রূপের বর্ণনা এভাবে -

وقال جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه: رأيته صلى الله عليه وسلم فى ليلة اضحيان فجعلت انظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمروعليه حلة حمراء فاذاهواحسن عندى من القمر

প্রখ্যাত সাহাবি জাবির ইবনে সামুরা -রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি এক চাঁদনি রাতে রাসূল ও আকাশের চন্দ্রের দিকে তাকাচ্ছিলাম। শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর। (শামায়েল২)।
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাষায়- যুলায়খার সাথীরা যদি আমার প্রিয়তম নবিজির নূরানি ঔজ্জ্বল্য এক ঝলক দেখত, তবে হাতের বদলে কলিজাই কেটে ফেলত। (খাসায়েলে মুস্তফা-২৪)
হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রা. বলেছেন-

وأحسن منك لم تر قط عيني
وأجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب
كأنك خلقت كما تشاء

আপনারচেয়ে সুন্দর মানুষ
চক্ষু আমার হেরেনি কভু,
আপনার মত সুশ্রী সন্তান-
কোনো মা প্রসব করেনি আজও।
যেভাবে চেয়েছেন, জন্মেছেন সেভাবে
সকল দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে তব।

এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সকল সুন্দরের শৈল্পিক সমন্বয়ে সুশোভিত ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
রূপের পাগল হে প্রেমিক আত্মা! বলো না আমার রাসূলকে তুমি কতটুকু ভালোবাসো? তোমার রূপপ্রেম যদি যথার্থ হয়, তবেই বলে উঠবে-
তব প্রেম-ভিখারি এ আত্মাকে দাও প্রেমের স্বাদ হে প্রিয়নবি!
তব দর্শনের পরম পিপাসা নিবারিত করো হে প্রিয়তম। স্বপ্নের বাতায়ন পথে হলেও!
এককথায়, আল্লাহ চান মানুষ তাঁর রাসূলকে -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসুক। তাই তিনি ভালোবাসার সকল উৎস-উপকরণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁর মাঝে। যাতে পৃথিবীর সকল মানুষ প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত আবেদনেই তাঁকে ভালোবাসে।

ভালোবাসার প্রকৃতি :

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ দীনারের এক নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার স্বামী ও ভাই উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। লোকেরা যখন তাকে সমবেদনা জানাতে গেল, তখন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ

না করে তিনি বরং জানতে চাইলেন- নবিজি কেমন আছেন?। তারা বলল- ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তাতেও তাঁর মন শান্ত হল না। আগ্রহের আতিশয্যে তিনি বলে ওঠলেন-

أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ

আমি নিজে দেখতে চাই; আমাকে দেখাও। অতঃপর রাসূলের দেখা পেয়ে ঈমানদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন-

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

(আল্লাহর রাসূল, আপনি নিরাপদ আছেন!) আপনার (নিরাপত্তার) পরে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ। (দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী- ৩০২/৩; সীরাতে ইবনে হিশাম- ৯৯/২)

ইশকে নবির কী অপূর্ব নাজরানা! রাসূলপ্রেমের কী অনুপম দৃষ্টান্ত!

এসব হৃদয়স্পর্শী ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী হয়েই তো আরবের আবু সুফিয়ান রা. (তখনও তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি) দীপ্ত কণ্ঠে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন-

ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم محمدا.

অর্থাৎ, আমি কাউকে এতটা ভালবাসতে দেখিনি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সঙ্গীরা যতটা ভালবাসে। (সীরাতে ইবনে হিশাম- ১৭২/২; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৬৫/৪)

ভালোবাসার স্বরূপ:

ভালোবাসার দাবিই হচ্ছে প্রেমাস্পদের অনুসরণ-অনুকরণ। রাসূলপ্রেমের দাবি হবে তাঁর সুন্নাহ'র অনুসরণ। তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন।

হাকিম মাহমুদ আরক্বাম -রাহিমাহুল্লাহ -বলেন-

لو كان حبك صادقا لأطعته
إن المحب لمن يحب مطيع

যদি তোমার প্রেম খাঁটি হত, তবে তুমি তার অনুসরণ করতে। প্রেমিক তো প্রেমাস্পদেরই অনুগত হয়।

কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে অনেক মানুষ ইশকে-নবির দাবি করেন বটে, কিন্তু এই ভালোবাসার ধরন নিয়ে তাঁদের মাঝে প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়।

ভালোবাসার জানান দিতে গিয়ে তাঁরা নানান কুসংস্কারের আমাদানী করেন। কেউ বা আবার তার স্তুতি গাঁইতে যেয়ে তাঁকে আল্লাহর আসনেই ঠাঁই দিয়ে দেন।

অথচ, ইসলাম এসব প্রান্তিকতাকে আদৌ সমর্থন করে না। বরং ইসলামে রয়েছে ভালোবাসা প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উত্তম বিধিমালা।

ইসলাম বলে- নবিপ্রেমের স্বরূপ হবে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করা- নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে হলেও। এটাই তো যুক্তির দাবি। প্রেমের চাহিদা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাটিই আমাদের পাথেয় হবে আশা করি-

উহুদ যুদ্ধের ভয়াবহ মুহূর্তে সাহাবি হযরত আবু তালহা রা. নিজে ঢাল হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হওয়া আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। একপর্যায়ে যখন নবিজি উঁকি দিয়ে দেখতে উদ্যত হলেন, তখন আবু তালহা রা. ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে বলে উঠলেন-

يَا نَبِيَّ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،لاَيَ اللهِ،بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لاَتُشْرِفْ يُصِيبُكَ كَسَهْمٌ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি উঁকি দেবেন না; পাছে আপনার গায়ে কোনো তীর এসে লাগে। আমার বুক আপনার জন্য উৎসর্গিত। (সহীহ বুখারী, হাদীস- ৩৮১১)। প্রেমের এ বাস্তব চিত্র আকঁতে কবির সুরে বলি-

آرزو بے یہی ہے یہی تمنا
ہو پرفدا جہ شت کا حزیں جان یہ

'আশা-আকাঙ্খা এই তো ছিল শুধু, জীবন যদি হতো তোমাতে বিলীন।'

ভালোবাসার দাবি

দরূদ পাঠ ভালোবাসার দাবি। চিরসত্য উপমা-

من أحب شيأ أكثر ذكره

মানুষ যাকে ভালোবাসে, তাকে সর্বক্ষণ স্মরণ করে।

রাসূলকে স্মরণ করা মানে তাঁর উপর দরূদ পড়া। দরূদের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুল কায়্যিম -রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন-

أنها سبب لدوام محبته للرسول -صلى الله عليه و سلم- وزيادته او تضاعفها

'অর্থাৎ, দরূদপাঠ হল ইশকে রাসূলের স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির কারণ।'

আমরা দাবি করি- আল্লাহকে ভালোবাসি। ভালোবাসি প্রিয়তম রাসূলকে। কিন্তু বাস্তবে কি সেই ভালোবাসার আবেদন অনুভব করেছি কখনও? জীবনের পাতায় সেই প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি আঁকতে পেরেছি? রাসূলপ্রেমে জীবন বিলানোর দীপ্ত শপথ নিয়েছি কখনও?

কামনা করি সেই চেতনা জীবন্ত হয়ে উঠুক আমাদের ভাবনায়- সমূহ কর্মধারায়।

হৃদয়ের গহীন থেকে সুর তুলি-তোমাকেই ভালোবাসি হে রাসূল!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখক : শিক্ষার্থী, ফযিলত ১ম বর্ষ

(মুনাকাশা)

তাকলীদ শান্তি ও সমৃদ্ধির অনন্য সোপান

আবু তাহির

তাকলীদ একটি ন্যাচারাল তথা স্বভাবগত বিষয়। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ তাকলীদে অভ্যস্ত। আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা সবাই গুরুজনদের তাকলীদ করে থাকে। এর ব্যত্যয় ঘটলে লোকসমাজ তাকে বেআদব বলে আখ্যায়িত করে। মানুষের জীবনতরীর যাত্রা দু'ভাবে হয়।

এক. তাহকীক : জীবনে উদ্ভূত সব সমস্যা স্বীয় মেধা ও চিন্তার মাধ্যমে সমাধান করা।

দুই. তাকলীদ : উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে জ্ঞানীদের দ্বারস্থ হয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা। যেমন- কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে হয়তো সে নিজে সুস্থতার পথ খুঁজবে, না হয় অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারের পরামর্শে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে।

একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের ইচ্ছে করলে হয়তো সে নিজেই নকশা এঁকে নির্মাণ করবে, না হয় অভিজ্ঞ কোনো ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ মিস্ত্রীর মাধ্যমে নির্মাণ করবে। এরকমই মানবজাতির যাত্রা দু'টি পথে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, একজন মানুষ সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে না। বরং এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো, যে বিষয়ে তার জানাশোনা নেই, সে বিষয়ে অন্যের দ্বারস্থ হবে। এর নামই তাকলীদ। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে পার্থিব ও পরকালীন সুখ-শান্তি। একটি পরিবার শান্তি-সুখের নীড় তখনই হবে, যখন সে পরিবারের সদস্যরা পরিবারের বড়জনের তাকলীদ করবে। সমাজের শান্তি-সুখ নিহিত থাকে সমাজপতিদের তাকলীদে। রাষ্ট্রের শান্তি ও সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগতি সবই রাষ্ট্রপ্রধানের তাকলীদ তথা আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত।

বর্তমান পৃথিবীর অসামান্য সফলতা ও প্রাপ্তির নিগুঢ় রহস্য খুঁজলে আমরা সেই তাকলীদকেই পাই। এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। নিমিষেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবরাখবর রাখা যায়- তা কি লক্ষ কোটি মানুষের আবিষ্কার? বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত আজ সারা দুনিয়া। তাও কি লক্ষ কোটি মানুষের আবিষ্কার? পাতালের ট্রেন থেকে আকাশের বিমান পর্যন্ত সকল আবিষ্কারই তো বিশেষ কোন একজন বিজ্ঞানী কিংবা বিজ্ঞানীদের ক্ষুদ্র টিমের। অতঃপর সেই ব্যক্তি অথবা ক্ষুদ্র টিম আবিষ্কার করেছেন কিছু নীতি, পথ ও পদ্ধতি। সেই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেই পৃথিবী অসামান্য সফলতা ও প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। পৃথিবীর অগ্রগতি ও উন্নতির এই তো প্রকৃত তত্ত্ব। ধর্মীয় পরিভাষায় একেই বলে তাকলীদ।

তাকলীদের স্বরূপ : দ্বীনের মূল কনসেপ্ট হচ্ছে, নিঃসংকোচে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা। রাসূল সা. এর আনুগত্য এ জন্য অপরিহার্য যে, তিনি তার কথা ও কাজে আল্লাহর বিধানাবলীকে তুলে ধরেছেন। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ এসব বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। তবে স্মরণ রাখতে হবে, কুরআন ও সুন্নাহর এমন অনেক বিধান আছে, যেগুলোতে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই। যেমন কুরআনে এসেছে-

ولا يغتب بعضكم بعضا

তোমরা একে অন্যের দোষ চর্চা কর না। (সূরা হুজুরাত : ১২)

হাদীসে এসেছে-

لا فضل لعربي على عجمي

কোনো আরবির অনারবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবি ভাষা বুঝেন, এমন ব্যক্তি এরকম বাক্য শুনামাত্রই তার মর্ম ও অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর এমন অনেক হুকুম-আহকাম রয়েছে যাতে জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও একাধিক অর্থ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীসের মধ্যে কখনো বাহ্যিক কিছু বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

যেমন : হাদীসে এসেছে–

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

যার নামাযে ইমাম আছেন, তার ইমামের ক্বিরাত তার ক্বিরাত বলে গণ্য হবে। (বায়হাকি ১৬০/২)। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, মুক্তাদী ইমামের সাথে ক্বিরাত পড়বে না।

অন্যত্র রাসূল সা.বলেছেন–

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায হয়নি। (বুখারি- ৭৫৬)।

হাদীস দু'টিতে বাহ্যত কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ ভাষাবিদরা এর সামঞ্জস্যবিধান করতে পারবে না।

আরেকটি উদাহরণ-

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ যেন তিন কুরু পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখে। (সূরা বাকারাহ: ২২৮)। এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত তিন কুরু বলা হয়েছে। কুরু শব্দটি হায়েয ও তুহুর উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এখানে কোনটি গ্রহণ করা হবে- এটা নির্ধারণ করা যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তো, বুঝা গেলো কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা থেকে মর্ম উদ্ঘাটন করা অনেক সময় অনেকের পক্ষে জটিল হয়ে

দাঁড়ায়। এই জটিলতা থেকে উত্তরণের একটি মাধ্যম হতে পারে তাহকীক, অপরটি তাকলীদ। অর্থাৎ হয়তো আমরা নিজেরা নিজেদের বুঝমতো এসব জটিল বিষয়ে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবো অথবা কুরআন-হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনিষীদের উপলব্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করবো। তারা এ ক্ষেত্রে যা বুঝেছেন এবং বলেছেন, আমরা সে অনুযায়ী আমল করবো। আমরা যদি বাস্তবতার নিরিখে বিচার করি, তাহলে দেখবো- প্রথম পথটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পথটি হল সতর্কতাপূর্ণ ও নিরাপদ। এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা। সহজ কথায় তাকলীদ বা মাযহাব হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে আমরা যেসব জটিলতার সম্মুখীন হই, সেগুলোর ক্ষেত্রে শরয়ী পণ্ডিতদের দেওয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর আমল করা। এতক্ষণের আলোচনায় একথা প্রতিভাত হয়েছে যে, তাকলীদ বা মাযহাব আলাদা কোন ধর্মবিশ্বাসের নাম নয়। কারো তাকলীদ করা মানে ব্যক্তিপূজা নয়। তাকলীদের অর্থ আদৌ একথা নয় যে, মুজতাহিদকে আইনপ্রণেতা বা সর্ববিষয়ে তাকে অনুসরণ করা।

তাকলীদ কি শুধু যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না কুরআন হাদীসেও এর নির্দেশনা রয়েছে? আসুন, আমরা একটু তালাশ করে দেখি।

কুরআনের আলোকে তাকলীদের প্রামাণিকতা :

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يا أيها الذين آمنواأطيعوالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم

হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর– তাদেরও আনুগত্য করো (সূরা নিসা : ৫৯)

অনেক মুফাসসিরের মতে উলুল আমর দ্বারা মুসলমান শাসকগণকে বুঝানো হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্বাস রাযি., মুজাহিদ, আতা ইবনে আবি রাবাহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের মতে- উলুল আমর বলতে ফকীহগণকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাযি রাহ. দ্বিতীয় তাফসীরকে একাধিক দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর মন্তব্য করেছেন- এই আয়াতে উলুল আমর বলতে উম্মতের ফকীহ উলামায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, বর্ণিত আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ ও রাসূলের সাথে ফকীহগণেরও অনুসরণ করে। এঁদের অনুসরণ করাকে ইসলামী পরিভাষায় তাকলীদ বলে। আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

আর মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা তাওবা : ১২২)

আলোচিত আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, মুসলমানদের সব সদস্য যেন জিহাদে শরীক না হয়। বরং তাদের মধ্যে কিছু মানুষ যেন দিবানিশি ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর যারা ইলম অর্জন করেনি, তাদের কাছে যেনো ইলম পৌঁছে দেয়। সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হল– ফকীহগণের কাজ হচ্ছে অন্যদেরকে হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত করা আর অন্যদের কাজ হল– তাদের নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে আমল করা। এই পদ্ধতিকেই তাকলীদ বলে।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো। (সূরা আম্বিয়া : ০৭)

উক্ত আয়াতে মানবজাতির জন্য একটি মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ কোনো বিষয়ে অজ্ঞ হলে তার জন্য জরুরি হল– সে ওই বিষয়ের অভিজ্ঞদের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে নেবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। বর্ণিত এই পদ্ধতিকেই ইলমি পরিভাষায় তাকলীদ বলে।

হাদীসের মাধ্যমে তাকলীদের প্রামাণিকতা :

কুরআনের মত হাদীসেও তাকলীদের পক্ষে অনেক দলিল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি–

এক-

عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر، وعمر

রাসূল সা. বলেন– আমি জানি না, তোমাদের মাঝে আর কতদিন জীবিত থাকবো। এরপর তোমরা আমার পরে যারা থাকবে, তাঁদের অনুসরণ করবে। এই বলে তিনি আবু বকর ও উমরের প্রতি ইশারা করলেন। (তিরমিযি : ৩৭৯৯)

বর্ণিত হাদীসে যে আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে আনুগত্যের জন্য নয়। বরং ধর্মীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে আমরা একটি আয়াত পাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده

এদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো। (সূরা আনআম: ৯০)

এখানেও ইকতিদা বলতে ধর্মীয় বিষয়ের ইকতিদা বুঝানো হয়েছে; প্রশাসনিক বিষয়ে নয়।

দুই. নবি সা. ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের হৃদয় থেকে ইলম টেনে বের করবেন না। বরং আলেমদের উঠিয়ে নিয়ে ইলমের সমাপ্তি ঘটাবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাদের পরামর্শে চলবে। তাদের নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই

ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারি : ১০০, মুসলিম : ২৬৭৩)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, ফতোয়া দেওয়া আলেমদের কাজ। লোকেরা তাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, আলেমগণ সমাধান দিবেন এবং লোকেরা সে অনুযায়ী আমল করবে।

উক্ত হাদীসে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, রাসূল সা. এমন একটি যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন– যে যুগে সত্যিকারের কোন আলেম থাকবে না; বরং মূর্খরা ফতোয়া দেবে। আলেমশূন্যতার সেই যুগে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্যতা থাকবে না। তখন পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের তাকলীদ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে কি? সে সংকট থেকে উত্তরণের একক মাধ্যম হচ্ছে- ফকীহদের অনুসরণ। আর এটার নামই তাকলীদ।

তিন. রাসূল সা. বলেছেন–

من أفتى بغيرعلم كان إثمه على من أفتاه

যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, এর গোনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। (আবু দাউদ : ৩৬৫৭)

হাদীসটি তাকলীদের পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল এজন্য যে, যদি তাকলীদ জায়েয না হতো- তাহলে উল্লিখিত ভুল ফতোয়ার গোনাহ ফতোয়াদাতার উপর বর্তাবে কেনো?

চার. আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলের কিছু সাহাবি জামাতে বিলম্বে আসতে শুরু করলে নবিজি সা. তাদেরকে নামাজে তাড়াতাড়ি আসার তাগিদ দিয়ে বলেন–

أتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم

তোমরা আমাকে দেখে আমার অনুসরণ করো, যাতে পরবর্তী লোকেরা তোমাদের দেখে দেখে অনুসরণ করতে পারে। (সহীহ বুখারি; কিতাবুল আযান)

বর্ণিত হাদীসের এক ব্যাখ্যা হতে পারে– প্রথম কাতারে মুসল্লিরা নবিজি সা. কে দেখে তাঁর অনুসরণ করবে আর পেছনের লোকেরা প্রথম কাতারের লোকদের দেখে অনুসরণ করবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে– সাহাবিদের তাড়াতাড়ি নামাজে আসা উচিৎ। যাতে তাঁরা নবিজি সা. থেকে ভালোভাবে নামাজ শিখে নিতে পারে। যেন পরবর্তীরা সাহাবিদের থেকে নামাজ শিখতে পারে। তাই ইবনে হাজর রাহ. বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা লিখেছেন– অনেকের মতে হাদীসের অর্থ হচ্ছে, তোমরা আমার থেকে শরীয়তের বিধিবিধান শিখে নাও। আর তোমাদের পর আগত তাবেয়িগণ শিখবে তোমাদের কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে শিখবে তাদের পরবর্তীরা। অতঃপর এই ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (ফাতহুল বারী)

আমরা যদি ইসলামের প্রথম যুগের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব সে সময় থেকেই এই দুটি পন্থায় কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের রীতি চলে আসছে। নবি সা. এর জীবদ্দশায় তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেসব এলাকায় এমন অনেক লোক ছিলেন, যারা প্রেরিত সাহাবিদের সীরাহ ও ইজতিহাদ অনুসারে দ্বীনের উপর চলেছেন। নবিজি সা. এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপকভাবে এ দুটি পন্থার প্রচলন ছিল। এ সময় অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়িন সীমিত সংখ্যক জ্ঞানী ও ফকীহ সাহাবির ফিকহ ও ফতোয়ার উপর আমল করতেন। মদীনাতে হযরত আয়শা, ইবনে উমর, যায়েদ বিন সাবিত রাযি. ও অন্যান্য ফকীহ সাহাবির তাকলীদ করা হত। মক্কা নগরীতে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., কুফা নগরীতে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর ফতোয়ার উপর আমল করা হতো। ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন– লক্ষ সাহাবির মধ্যে যাঁরা ফতোয়া প্রদান করতেন, তাঁদের সংখ্যা একশ ত্রিশের কিছু বেশি হবে। তন্মধ্যে মাত্র সাতজন সাহাবি এমন ছিলেন, যারা ব্যাপকভাবে ফতোয়া প্রদান করতেন। বিশজন সাহাবি ছিলেন, যারা ফতোয়া প্রদানে মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিলেন। বাকিদের কাছ থেকে একটি বা দুটি মাসআলায় ফতোয়া পাওয়া যায়। সুতরাং বাকি সবাই সাধারণভাবে এসব ফকীহ সাহাবির ফিকহ ও ফতোয়ার অনুসরণ করেই গেছেন।

উপসংহার : এতক্ষণের আলোচনায় মোটামোটিভাবে হলেও এ সত্য পরিস্ফুট হয়েছে যে, তাকলীদ করার নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। এই সত্য অনুধাবন করার জন্য কাড়ি কাড়ি মেধা ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই সর্বসম্মত কর্মধারার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দলবদ্ধ আওয়াজ ওঠে; রাসূল সা. এর যুগের সাড়ে বারোশো বছর পরে। আর তাও এই উপমহাদেশে এবং ইংরেজদের শাসনামলে। যাদের রাজ্য শাসনের পলিসিই ছিলো Divide and rule বিভেদ সৃষ্টি করা এবং রাজ্য শাসন করা।

পরিশেষে তাকি উসমানি হাফি. এর বক্তব্য দিয়েই কলাম গুটিয়ে নিব।

তিনি লিখেছেন- এই যুগসন্ধিক্ষণে যখন ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চতুর্দিক থেকে বিপর্যয়ের তুফান বইছে। উৎখাত ও ষড়যন্ত্রের তীব্র আক্রমণ চলছে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী আর কিছুই হতে পারে না যে, আমরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করব এবং সামান্য কথা নিয়ে একে অন্যকে কাফির-মুশরিক বলব। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ অসংখ্য ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট যে, মুসলমানদের ইজ্জত, সম্মান, শক্তি ও সাহসের সোপান-কোন দুশমন অবদমিত করতে পারেনি, বরং নিজেদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেই আমরা একে একে সব হারিয়েছি। ইতিহাস সাক্ষী, যখন মুসলমানদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে হাঙ্গামা বেঁধেছে, তখন এ থেকে ইসলামের প্রকৃত দুশমনরা উপকৃত হয়েছে। সুতরাং উম্মতে মুসলিমার সিংহভাগের ইবাদত বন্দেগী– যা প্রকৃত অর্থে শরীয়ত মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে, তাকে বাতিল বলা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি।

লেখক: শিক্ষার্থী, ফযীলত ১ম বর্ষ

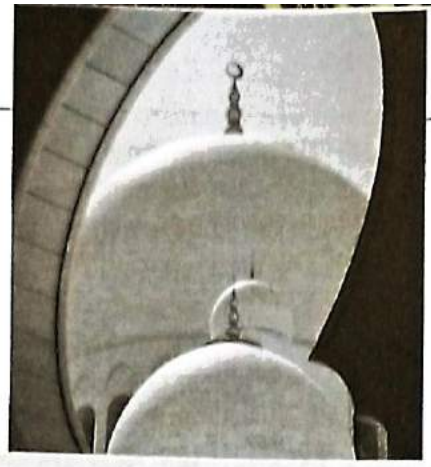

সুবাসিত ফুল বিশ্ব রাসূল

আফফান মীম আব্দুর রহমান

নবি মুহাম্মদ সা. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মহান চরিত্রের অধিকারি, আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। সত্য, নিষ্ঠা, মহানুভবতা, পরোপকার আমানতদারী এক কথায় সর্বাধিক চারিত্রিক সৌন্দর্য ও শোভায় পূর্ণ ছিল তার পবিত্র সত্ত্বা। জন্মের পর থেকে তিনি সবার আদর্শ-অনুকরণীয় ব্যক্তি। শিশুকালে শিশুদের জন্য, কিশোর ও যুব বয়সে কিশোর ও যুবকদের জন্য, স্বামী হিসেবে স্বামীদের জন্য, রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে রাষ্ট্রপতিদের জন্য, রাজনীতিবিদ হিসেবে রাজনীতিবিদদের জন্য, যোদ্ধা হিসেবে সেনাপ্রধান ও সাধারণ সৈন্যদের জন্য, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকদের জন্য তিনি আদর্শের মূর্ত প্রতীক, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

পবিত্র কালামে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

''তোমাদের জন্য রাসূলে খোদার জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'' (আহযাব২১-)

অন্য আয়াতে রয়েছে-

إنك لعلى خلق عظيم

''নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'' (সূরা কলম- ৪)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন–

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

''আমাকে সচ্চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই প্রেরণ করা হয়েছে।'' (সহীহ বুখারি-২৭৩)

হযরত মুহাম্মাদ সা. যে জগতের শ্রেষ্ঠতম মহামানব তা শুধু কোরআন-হাদীসের স্বীকৃতিই নয়; বরং যুগে যুগে বিশ্বের বরেণ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন এক বাক্যে।

বিখ্যাত লেখক মাইকেল এইচ হার্ট ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তার ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'দ্য হান্ড্রেড' গ্রন্থে মহানবি সা.কে স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে।

রাসূলের চরম বিরোধী আবু সুফিয়ান তো নিজেই সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সম্মুখে নবি সা. এর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক-চিন্তাবিদ গীবনের ভাষায়- 'ইসলামের অভ্যুত্থানে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে। মানব সমাজে যার প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী।'

থমাস কারলা জেক্স বলেন– যদি কোনো মানুষের গোটা জীবনটাকেই বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তবে তিনি মুহাম্মদ সা.। যে মুহাম্মদকে লোভী, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্সু বলে, তার সাথে আমার তীব্র বিরোধ ও ভিন্নমত। যখন বিশ্বজাহানের সম্পদ ও নেয়ামতসমূহ তার পদতলে ছিল তখনো তিনি চোখ তুলে তাকাননি এ সবের দিকে। নিজের প্রয়োজনের খাতিরে যা নিতেন তাও হতো খুবই সাধারণ ও নগণ্য, অথচ সে যুগে রাজাগণ রাজ্যের সম্পদ নিজেদের কাজে ব্যয় করতো।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন– হযরত মুহাম্মাদ সা. এর জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিৎ তার আদর্শকে অনুসরণ করা।

যুবকদের আদর্শ: রাসূল সা. এর যৌবনকালীন সময়ে যুদ্ধ ছিল আরবদের নেশা। যুদ্ধের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল শত শত পরিবার। আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কাটতো দিন। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ছিল না।

আয যুবাইর ইবনু আব্দিল মুত্তালিব একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি। তিনি আরবদের এই করুণ পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতির জন্য বিভিন্ন লোকের সাথে মতবিনিময় করলেন। অনুকূল সাড়াও পেলেন। স্বল্প সময়ে গড়ে তুললেন একটি সংগঠন– 'হিলফুল ফুযুল'। হুজুর সা. এর বয়স তখন ১৭ বছর। তিনি সানন্দে এ সংগঠনে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ৫৯১ সালে।

হিলফুল ফুযুলের পাঁচ দফা- ১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করব। ২. পথিকের জানমালের হেফাজত করব। ৩. অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করব। ৪. মাযলুমের সাহায্য করব। ৫. কোনো যালিমকে মক্কায় আশ্রয় দেব না।

কয়েক দশক পরে 'হিলফুল ফুযুলের' আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূল সা. বলেছিলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে সম্পাদিত অঙ্গীকারের সময় উপস্থিত ছিলাম। এর বদলে অনেকগুলো লাল উটও আমি পছন্দ করব না। ইসলামে যদি এ জাতীয় কোনো অঙ্গীকারে আমাকে ডাকা হয়, তবে অবশ্যই আমি সাড়া দেব।

রাজনীতিবিদদের আদর্শ : কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
''তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়ত ও দ্বীনে হক সহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দ্বীনের উপর এ (দ্বীনে হক)কে বিজয়ী করে তোলেন। এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।'' (সূরা ফাতহ - ২৮)

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে মহানবি সা. এর রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝে আসে। তার রাজনীতি ছিল ইসলামের জন্য। দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য। মানুষের হৃদয় মুকুরে ধর্মীয় চেতনা বোধকে বদ্ধমূল করে খোদাভীরু ও চরিত্রবান মানুষ গঠনে তিনি নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। কেননা এর মাধ্যমেই সমাজের বর্বরতা ও নৈরাজ্য দূর করে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

মহানবির রাজনীতির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য :

১. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি : আম্বিয়া আ. এর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। তাদের নিষ্কলুষ জীবন যাপন যে নিঃস্বার্থপরতার প্রমাণ বহন করে তা অন্য কারো মাঝে পাওয়া দুষ্কর। এ জন্যই তাঁর উৎকৃষ্ট চরিত্র মাধুর্যের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

২. উপায় উপকরণের পবিত্রতা : তিনি কোনো অন্যায় ও অশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর দুশমনদের সাথেও ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করতেন না। চরম শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তার নেতৃত্ব মেনে নিত, তাহলে তার পূর্বের যাবতীয় অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিতেন

৩. উদ্দেশ্যের নিষ্কলুষতা : ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তার কাম্য বস্তু ছিল। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা নয়। যদি এমন হতো তাহলে শুরুতেই মক্কার নেতৃত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারতেন।

এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রাসূলের রাজনীতিকে স্বার্থপর দুনিয়া লোভীদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে।

যুদ্ধাদের আদর্শ : রাসূল সা. এর পৃথিবীতে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করা একত্ববাদকে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেওয়া। এ পথে তাকে বহু শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহু যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়েছে। মক্কি জীবনে যুদ্ধের সম্মুখীন না হলেও মাদানি জীবনে বেশ কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। হিজরতের পরে মাদানি জীবনে ছোট বড় তেইশটি মতান্তরে সাতাইশ বা উনত্রিশটি যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেগুলোকে গাযওয়া বলা হয়। আর তেতাল্লিশটি মতান্তরে ষাট বা তেষট্টিটি যুদ্ধে নিজের পক্ষ থেকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। এগুলো হলো সারিয়্যা।

পরিসংখ্যানে এতোগুলো যুদ্ধ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও রক্তপাত ছাড়াই সমাধান হয়েছে। কেননা নবি সা. ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ। তিনি রহমতের নবি। নিজ হাতে তিনি কোনো অমুসলিমকেও হত্যা করেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তার নির্দেশ ছিলো,- যারা যুদ্ধে নেই, বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলাদের হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধে শত্রুর মৃত্যুর পর তার দেহকে বিকলাঙ্গ করা যাবে না। যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিতেন। এতেও সম্মত না হলে যুদ্ধের অবতারণা হতো। যুদ্ধে রাসূল সা. খুব কৌশলী ছিলেন। স্থান নির্ধারণ, সৈন্য সাজানোসহ সর্বক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুকসহ বিভিন্ন যুদ্ধের দিকে তাকালে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিপুণ কৌশলী হওয়ার কারণে দেখা যায় অল্প সংখ্যক যুদ্ধা, যৎসামান্য বাহন, স্বল্প পরিমাণ অস্ত্র আর আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র বিরাট বড় বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।

শত্রুকে কীভাবে পরাস্ত করতে হয় তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের কাজ। যার ফলে শত্রুপক্ষ ইসলামকে দমানোর ঘৃণ্য আশাকে অন্তরে কবর দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। তাছাড়া যুদ্ধ ব্যতিরেকে সন্ধির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রচারে ছিলেন সুদূর প্রসারী চিন্তার অধিকারী। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে এর যথাযোগ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। যুদ্ধটি বাহ্যিক মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীতে দেখা গেলেও তা ছিল মক্কা বিজয়ের পটভূমি। আল্লাহ তাআলা এই সন্ধিকে 'ফতহুম মুবীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শিক্ষকদের আদর্শ : হযরত আনাস রাযি. বলেন- আমরা রাসূল সা. এর সাথে মসজিদে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ এক বেদুঈন মসজিদে এসে প্রস্রাব করে দিলো। সাহাবিগণ তাকে বিরত করতে চাইলে হযরত সা. বললেন- তাকে কষ্ট দিও না, তাকে ছেড়ে দাও। সাহাবিরা তাকে প্রস্রাব করতে দিলেন। প্রস্রাব করার পর রাসূল সা. তাকে ডেকে বললেন- ''এই মসজিদগুলো এ সমস্ত প্রস্রাব এবং নোংরার উপযুক্ত জায়গা নয়; এগুলো আল্লাহর যিকির নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের জন্য।''

রাবী বলেন- অতঃপর রাসূল সা. কোনো এক ব্যক্তিকে প্রস্রাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়ার নিদেশ দিলেন। সে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দিল। (বুখারি-৬০২৫, মুসলিম-২৮৫)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূল সা. চাইলে এই বেদুঈনকে তার কর্মের দরুন তিরস্কার করতে পারতেন! কিন্তু তিনি তা না করে তার নম্রতা ও অমায়িকতা দ্বারা উক্ত বেদুইনের সামনে মসজিদের উপযোগিতা ও গুরুত্ব তোলে ধরেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী : ফযীলত ১ম বর্ষ

(আকাবির)

তাঁর মতো বটবৃক্ষ হবো; হবো কবিতা

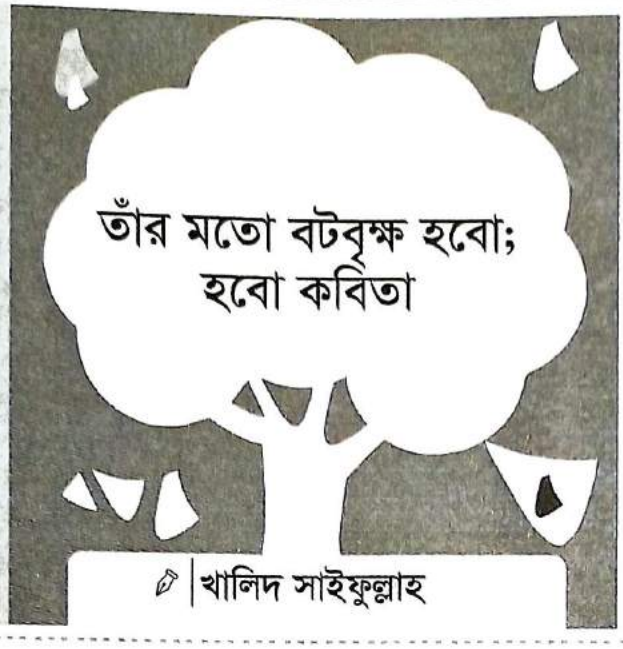

✍ | খালিদ সাইফুল্লাহ

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে খুতবা প্রদান করছিলেন। হঠাৎ হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. এলেন। উভয়ে ছিলেন লাল পোশাক পরিহিত। ছোট্ট দৌহিত্রদ্বয় উঠতে উঠতে আর পড়তে পড়তে আসছিলেন। নবিজি সা. মিম্বার থেকে নেমে গেলেন। মমতাভরা হাত প্রসারিত করে আদরের দৌহিত্রদেরকে কোলে তুলে নিলেন নবিজি সা.।

বললেন-

صدق الله تعالى –إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين، فلم أصبر

'আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন- "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বস্তু। আমি ওদের দুজনকে দেখে বসে থাকতে পারিনি।" তারপর নবিজি সা. খুতবা আরম্ভ করলেন। (সুনানু আবি দাউদ, হাদীস- ১১০৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস, ৩৬০০ এর সূত্রে নবিজি- যার আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী: ডা. রাগিব সারজানি, পৃষ্ঠা: ১০৯)

নবিজির কোলজুড়ে দিব্যি বসে থাকা এই যে হাসান এই মহান আদর্শপুরুষ হাসান ইবনু আলি রাযি. এর ভাগ্যবান বংশধর হলেন আমাদের সায়্যিদ- আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ।

সায়্যিদা খাইরুন নিসা। আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর মুহতারামা আম্মা। শায়খ নাদাবির মুহতারাম আব্বা মাওলানা হাকিম সায়্যিদ আবদুল হাই রাহিমাহুল্লাহর সাথে যখন তাঁর নিকাহের কথাবার্তা চলছিলো, তখন তিনি স্বপ্নে একটি আয়াত শুনতে পান। ভোর পর্যন্ত ঐ আয়াত তাঁর কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলো! আয়াতটি ছিলো -

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

"কেউই জানে না, তাঁদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। (সূরাতুস সাজদাহ)

সায়্যিদা খাইরুন নিসার সেই "قرةأعين" যে তাঁর সুপুত্র, তৃষ্ণার্ত উম্মাহর উচ্ছলিত ঝর্ণাধারা সায়্যিদ আলি নাদাবি- এ বিষয়ে কি এতটুকুন সন্দেহও আছে? (কারওয়ানে যিন্দেগী: ৩৩-৩২/১ পৃষ্ঠা এর সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই: যাইনুল আবিদীন, পৃষ্ঠা: ১২১)

শায়খ নাদাবি মাত্র দশ বছর বয়সেই হারিয়েছিলেন প্রিয় বাবাকে। প্রতিভাবান পুত্রকে ঘিরে অনেক আশা-স্বপ্ন ছিলো উচ্চাভিলাষী বাবার। কিন্তু সায়্যিদ আবদুল হাই রাহ. দেখে যেতে পারলেন না আপন স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন। অঙ্কুরে এতিম হয়ে গেলেন আলি নাদাবি! তবে তাঁর জীবনের এই উন্মেষকাল অভিভাবকশূন্য ছিলো না; নয়তো আলি নাদাবি- আলি নাদাবি হতে পারতেন না।

মাওলানা ডাক্তার সায়্যিদ আব্দুল আলি রাহিমাহুল্লাহ। শায়খ নাদাবির প্রিয় বড় ভাই। আজীবন শীতল ছায়া হয়ে মাথার উপর ছিলেন। আর সেই নিবিড় ছায়ার দানে বেড়ে উঠেছিলেন শায়খ আলি নাদাবি রাহ.। বাবার স্নেহ আর ভাইয়ের শাসন সবটাই পেয়েছিলেন শায়খ আলি নাদাবি এই প্রিয় ভাইয়ের কাছে।

শায়খ আলি নাদাবি লিখেছেন- 'সেকালে উধ-এ কবিতা উৎসবের বেশ জোর ছিলো আমাদের ছোট গ্রামে পর্যন্ত কয়েকবার কবিতা উৎসব হতো। দেখাদেখি আমিও কিছু ছন্দ বয়নের চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা আমার বড় ভাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাকে বাধা দেন। ফলে এই অনর্থক সাধনা আর চলতে পারে নি। (মেরী ইলমী আওর মুতালায়াতী যিন্দেগী, খুতুবাতে আলি মিয়া: ২৯-২৮/৬ এর সূত্রে "প্রিয় লেখক প্রিয় বই; পৃষ্ঠা: ১২৪)

কী হতো- যদি তিনি ভাইয়ের ডাক ও শাসনকে উপেক্ষা করে ওই কবিওয়ালাদের দলে পড়ে থাকতেন? স্বভাবজাত সাধনা ও শাণিত প্রতিভার জোরে তিনিও হতেন তাঁর কালের হালী, আকবর এলাহাবাদি, জিগার মুরাদাবাদি কিংবা ইকবাল! আর ভাইয়ের শাসন মেনে কবি হননি; হয়েছেন পৃথিবীর লক্ষ-কোটি বিদ্বান মানুষের হৃদয়ের কবিতা।

পৃথিবীর লক্ষ-কোটি বিদ্বান মানুষের হৃদয়ের কবিতা। পরিণত হয়েছিলেন উম্মাহর চির স্মরিত-বরিত রাহবারে !! আর সবাই জানে কবি হারিয়ে যান কালের আবর্তে; কিন্তু কবিতা হারায় না। তাই তো জগতে যত মানুষ কবি হয়, তত মানুষ কবিতা হতে পারে না। কবি ও কবিতার বিপ্লবী পার্থক্য বুঝতে সন্ধানী পাঠক মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন দা. বা. এর অমূল্য সাক্ষাতকার কবি না কবিতা হবো পড়ে নিতে পারেন। জীবনের নিরাপদ লক্ষ্যনির্ধারণে বইটি যেন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু!

বড়ভাই সায়্যিদ আবদুল আলি সযত্নে শক্ত হাতে কবিতামুখী স্নেহের ছোট ভাইয়ের সবটুকু মনোযোগ নিবিষ্ট করেন প্রচুর অধ্যয়নে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধতায়। মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মাকতুবাত ও হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির "ইযালাতুল খাফা" গ্রন্থদুটি পড়ার তাগিদ করলেন। এখানে ফলাফল দিনের মতো উজ্জ্বল! মুজাদ্দিদে আলফে সানীর পত্রাবলী পড়ে হৃদয়ে ধরেছেন একজন মানিত-বরিত সংস্কারকের আলোকবাণী। সংস্কারকের আধ্যাত্মসাধনার হৃদয়ে নূর ছড়ানো ওইসব পত্রাবলী পড়ে আবুল হাসান আলি নাদাবি শতাব্দির সংস্কারক না হলেও তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়েছিলো সংস্কারের শ্লোগানে, আর লেখালেখির বিস্তৃত সুপরিসর ময়দান অলঙ্কৃত হয়েছিলো সংস্কারের মণিমুক্তায়! "ইযালাতুল খাফার" এই খুদে পাঠক উম্মাহর মন-মননে গেঁথে দিয়েছিলেন বিমল বিশুদ্ধ ওয়ালিউল্লাহি চেতনা!

শায়খ নাদাবি রাহ. লিখেছেন- আমি মাকতুবাত এবং ইযালাতুল খাফার মতো মানবরচিত আর কোন রচনা পড়ে এতটা প্রভাবিত হই নি। (মুতালায়াতী যিন্দেগী, পৃষ্ঠা- ৪৪ এর সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই- ১২৭)

শায়খ আলি নাদাবি- অনারব হয়েও আরবি সাহিত্যে ছঁড়ি ঘুরিয়েছেন অকম্পিত হাতে। শক্তিশালী ভাষা, কান্তিময় সাহিত্য, দীপ্তিময় চিন্তা, দরদী হৃদয় আর সম্মোহনী উপস্থাপনাশিল্পে আলি নাদাবি জয় করেছিলেন আরব আজমের লাখ লাখ বিদ্বান মানুষের মন ও মস্তিষ্ক। আলি নাদাবির কলম যখন আরবি ভাষায় ছোট-বড় মিলিয়ে ১৯৯টি আর উর্দু ভাষায় ৩০৪টি গ্রন্থ সৃজন করে- তখন কি অবাক না হয়ে পারা যায়? অমন অসাধ্য কীভাবে সাধন করলেন আমাদের আলি নাদাবি? এই রহস্য সন্ধানে আলি নাদাবির মতো হওয়ার অপ্রতিরোধ্য প্রত্যাশা আর দুর্বিনীত অঙ্গীকারে এবার শুরু হোক তাহলে শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান।

আলি নাদাবি রাহ. এর ঘরের পরিবেশ ছিলো জ্ঞানবান্ধব। শাইখের মুহতারাম দাদা ও আব্বা ছিলেন লেখক, সাহিত্যিক ও সমালোচক। শায়খ নাদারির ভাষায়- 'একেবারে শিশুকাল থেকেই উর্দু সাহিত্যের পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত গদ্য-পদ্য আমরা ভাই-বোনেরা নিয়মিত পড়তাম। অবচেতন মনে সাহিত্যপাঠের ফায়েদা হয়েছে- এই ভাষার স্বাদ ও রস জীবনের কোনো কালেই হারাইনি। রচনা ও সাহিত্যকর্মে কখনো পন্ডিতের বিশুষ্কতা পায় নি। আমি মনে করি- সরল ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত উন্নত লেখকদের রচনাবলী এবং প্রাঞ্জল ও সৃজনশীল লেখা পাঠ প্রাথমিক জীবনে খুববই উপকারী এবং অনেকটা আবশ্যক। (আমরা যারা দাঈ হতে চাই - শাইখের সামনের কথাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার কথা) অন্যথায় নতুন প্রজন্ম এবং নতুন কালের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠে না। যার ফলে দাওয়াত ও উপদেশ যথাযথ ফলবান হয় না। (মুতালায়াতী যিন্দেগী: পৃষ্ঠা- ২৬/৬ -এর সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই- ১২৩)

তার মানে কি এটা যে, আলি নাদাবির ঘরের এই সাহিত্যপাঠ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বাঁধনমুক্ত ছিলো? মোটেই না; বরং অনিবার্যভাবেই বড় ভাই সায়্যিদ আব্দুল আলির মতো চৌকস অভিভাবকের সতর্ক তত্ত্বাবধান ছিলো সদা নিয়োজিত! তাই তো কবিদের আড্ডা থেকে তুলে এনে ভাই আলি নাদাবিকে বসিয়েছিলেন মাকতুবাত ও ইযালাতুল খাফার দারসে।

শায়খ খলীল আরব ইয়ামানি রাহ. এবং শায়খ তাকি উদ্দীন হিলালি মারাকেশি রাহ.শায়খ আলি নাদাবির আরবি ভাষা ও সাহিত্যের মান্যবর উস্তায। উভয় শায়খই রক্তে মাংসে আরব। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের মানিত সমঝদার সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রেমিক। শায়খ নাদাবির আরবি শিক্ষক হিসেবে এই দুই আল আদীবুন নাক্কাদ মনীষাকে নির্বাচন করেন বড় ভাই ডাক্তার সায়্যিদ আব্দুল আলি রাহ.। শায়খ খলীল আরব ইয়ামানি ছিলেন শায়খ নাদাবির প্রথম আরবি শিক্ষক। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর আরবস্বভাব, মাধুর্যপূর্ণ কথাবার্তা, মিষ্টি ভাষা, উদার স্বভাব ও সরল আচরণের কারণে ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। তিনি লাখনৌ ইউনিভার্সিটির আরবি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ইউনিভার্সিটি ক্লাসের আগে তাঁর ঘরেই মাদরাসা বসতো। ছাত্র মাত্র দু'জন! খলীল আরব সাহেবের ছোট ভাই হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ এবং শায়খ নাদাবি। শায়খ লিখেছেন- "দুইজন মাত্র ছাত্র হওয়ায় আমরা প্রত্যেকেই তাঁর পঞ্চাশ পার্সেন্ট করে মনোযোগ ও প্রচেষ্টা ভাগে পেয়েছি। ছাত্রের জন্য এটা অনেক বড় সৌভাগ্য। (কারওয়ানে যিদেগী: -৮৯-৮৮/১ সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই; পৃ- ১২৯)

"আরবি সাহিত্যে শায়খ খলীল আরবের নিজস্ব সিলেবাস ছিলো। ভারতবর্ষের সিলেবাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সরফ ও ইনশা-র প্রাথমিক বিষয়গুলো অনুশীলনসহ পড়াবার পর নিম্নোক্ত কিতাবগুলো আমাদেরকে পড়িয়েছেন। المبتكره الطريقة العربية

১. (মিসরের আরবি রিডিং সিরিজ)

খ. ১ম খন্ড مدارج القراءة

গ. এরপর ইবনুল মুকাফফার كليلة ودمنة (এই কিতাবটি শতবার পড়েছিলেন আলি নাদাবি)

ঘ. مجموعة النظم والنثر এর গদ্যাংশের একখণ্ড মুখস্থ এবং পদ্যাংশের একখণ্ড।

ঙ. نهج البلاغه

চ. পদ্যে دلائل الإعجاز للجرجاني وسقط الزند وحماسة

ছ. مختصر تاريخ أدب اللغة العربية পরম আবেগে ও উচ্ছ্বাসে পড়িয়েছেন।

জ. আবুল হাসান আলি আদ-দারিরির (الضريري) আরবি ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা। কয়েক পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি তিনি বাস্তব অনুশীলনসহ পড়িয়েছেন। সেই অনুশীলন এখনো আমাকে পথ চলতে সাহায্য করছে।

ঞ. শেষ পর্যায়ে এসে আরব সাহেব আমাদেরকে মিশরের খ্যাতিমান গদ্যশিল্পী, শক্তিমান, স্বতন্ত্রশৈলীর জনক সায়্যিদমুস্তফা লুতফী মানফালুতি-র 'আন নাযরাত' পড়তে দেন। এই গ্রন্থ পাঠ করার পর এই শতাব্দির এই জাদুকরী সাহিত্যিকের নানা শিরোনাম ধার করে নিয়ে সৃজন করেছি কত রচনা। লাভ করেছি কলমের ঘোড়গতি। তার পিছনে দৌড়াতে গিয়ে উড়িয়েছি সৃজনের বিপুল ধুলো। এই পাঠদানের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো- একই সময় বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠদান- ছিলো না। শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্যই ছিলো পাঠের বিষয়। ফলে এটাই ছিলো আমাদের সদা চর্চার বিষয়। ওটাই ছিলো জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। (মুতালায়াতী যিন্দেগী: ৩১/২৯ পৃষ্ঠার সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই- ১৩১)

শায়খ তাকি উদ্দীন হিলালি। আলি নাদাবির আরেকজন প্রিয় শিক্ষক। বিশ্ব সাহিত্যসভায় আলি নাদাবির বরিত মনীষা হয়ে ওঠার পেছনে শায়খ তাকি উদ্দিন রাহ. এর অবদান ছিলো অনন্য। আলি নাদাবি লিখেছেন- আরবি তো বলতেন না, যেন মুখ থেকে ফুল ঝরতো। আমি যদি আল্লামা হিলালি সাহেবকে না দেখতাম, তাহলে হয়তো আমার আরবি লেখায় অনারবি এবং ভারতীয় প্রভাব ও দাগ থেকে মুক্ত হতে পারতাম না। যদি তাকে না দেখতাম, তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দির ভাষাকে মৃত এবং শুধু কাগজে অঙ্কিত চিত্র মনে করতাম। (কারওয়ানে যিন্দেগী: ১১৬/১, মুতালায়াতী যিন্দেগী: ৩৪-৩২/৬ পৃষ্ঠার সূত্রে প্রিয় লেখক প্রিয় বই; পৃষ্ঠা- ১৩৪)

নাদাবির ভাগ্যে জুটেছিল দু'জন পরম হিতাকাঙ্খী ও দক্ষ আরব শিক্ষক, যারা শায়খ নাদাবিকে নির্মাণে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যাদের পাঠদান ছিল অনুশীলননির্ভর। একই সময়ে যারা একটি মাত্র বিষয়কেই পাঠদান করতেন। কতগুলো বিষয়কে একসাথে গুলিয়ে ফেলতেন না। এইভাবে ধারাবাহিক দুই বছর প্রতিযোগিতামূলক অনিঃশেষ পাঠ-ই শায়খ নাদাবিকে এনে দিয়েছিলো- আরবি ভাষায় ঈর্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠার স্বর্ণমুকুট। তাই তো সমকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আরব-অনারব সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে মাওলানা নাদাবির লেখালেখি, সাহিত্য ও চিন্তার গভীরতা, উচ্চতা ও নান্দনিকতা ছিলো সর্বজনবিদিত; বরং এখনো তা বিশ্বময় আলোচিত। সায়্যিদ কুতুব শহীদ, ড. আলি তানতাবি ও সায়্যিদ রশীদ রিযা মিসরির মত মানুষ শায়খ আলি নাদাবির আরবি রচনা পড়ে মুগ্ধতা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আলি তানতাবি রাহ. আপন আবেগ ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এভাবেই চিত্রিত করেছেন-

وكنت افقد ثقتي بالأدب حين لما عدا جدعند الأدباء هذه النغمة العلوية التيغنيها الشعراء من لدن الشريف الرضي السالبرعي، فلما قرأت كتابك وجدتها في نثري هوالشعر إلا أنه بغيرنظام، فيا أبا الحسن! لك الشكر على أن رددت الي ثقتي بنفسي، وثقتي بأدب لغتي

আহা, পুরো আরব দুনিয়াকে কতটা মুগ্ধ করেছিলো আলি নাদাবির সাহিত্য মদিরা।

প্রিয় পাঠক! ইনশাআল্লাহ! আবার ফিরে আসবো আমরা বটবৃক্ষের ছায়ায়; যদি জীবন সঙ্গ দেয় আর মৃত্যু বিশ্বাস ভঙ্গ না করে! আমরা আর কিছু হই বা না হই; আমাদেরকে বটবৃক্ষ এবং কবিতা হতেই হবে।

লেখক: শিক্ষার্থী,সানাবিয়াহ উলয়া ১ম বর্ষ

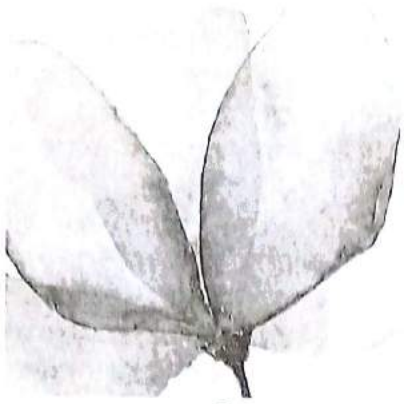

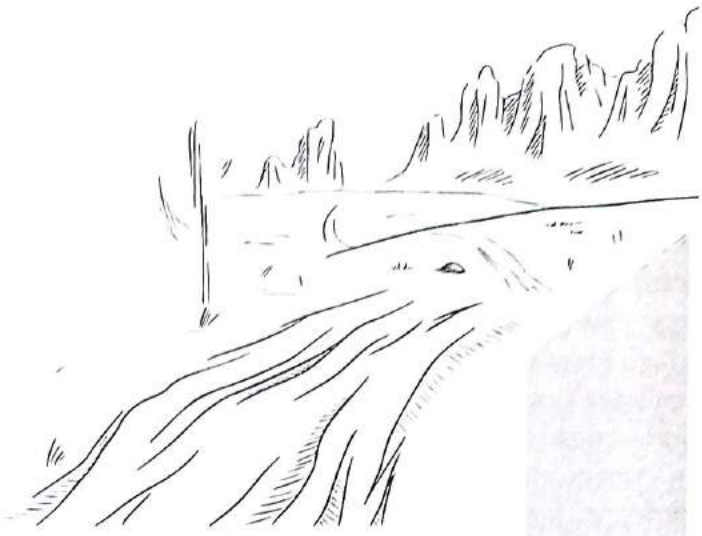

প্রেমময় রিহলাহ্

মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির

মক্কার বাজার আজ সরগরম। লোকে লোকারণ্য। সুঁই ফেলবার কুদরতটুকুন নেই যেন। তীরন্দাজরা আজ বাজারে উঠাবে হাদায়া থেকে ধরে আনা তাদের চিরশত্রু মুহাম্মদের দুই সহচরকে। সেদিন যখন তাদেরকে ধরে আনা হলো; সংবাদ চাউর হয়ে গেলো। বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো পুরো মক্কায়। মুহাম্মদের সহচরদ্বয়কে ধরে আনার সংবাদ পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলো মক্কার কাফের সম্প্রদায়। খুশি হবার যুক্তি অবশ্য আছে; কেনই-বা ওরা সুখে উল্লাসে ভাসবে না! এখনও তো ওদেরকে দগ্ধ করে নিকট অতীতে হেরে যাওয়ার সেই বিষক্রিয়া। গা পুড়ে যায়- পরাজয়ের সেই দৃশ্য স্মৃতিপটে এলে। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ওদের অনেকেরই। ওদের বুকে-পিঠে তো এখনও মওজুদ আঘাতের ক্ষতচিহ্ন...

চলো বিসমিল্লাহ-

চতুর্থ হিজরির সফর মাস চলছে। আদাল ও কারাহ গোত্রের সাতজন লোক নবিজির দরবারে হাজির হয় সাধু পুরুষ সেজে। তাদের একজন নবিজিকে আরজ করলেন- "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও আমরা চাই আপনি আমাদের দ্বীন শেখানোর জন্য কয়েকজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা পাঠান; যাতে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্বীনের জ্ঞান হাসেল করতে সক্ষম হই।" রাসূল তাদের সাধুতাকে গ্রহণ করলেন; তাদের আবদার অনুযায়ী রাসূল সা. তাদের জন্য আসেম ইবনে সাবেত এর নেতৃত্বে ছ'জন মুহাজির ও চারজন আনসারের একটি দল প্রেরণ করলেন। মূলত এটা ছিলো কুরাইশদের ষড়যন্ত্রেরই অংশ। ইয়াসরিব থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো দশজনের এক ছোট্ট কাফেলা।

পথের প্যাঁচাল-

ইয়াসরিব। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা রঙিন প্রচ্ছদ। সেই ইয়াসরিব থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে দশজনের কাফেলা- আরব মরুর বালিয়াড়ি মাড়িয়ে। মক্কার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে কাফেলা। রাজীতে পৌঁছেছে। রাজী হলো হাদায়া থেকে ফেরার পথে হিজায প্রান্তের এক কুয়ো। উসফান আর মক্কার মাঝামাঝি স্থান এটি। কাফেলার পেছনে রয়েছে তীরন্দাজের দল, লাহইয়ান গোত্রের। লাহইয়ান; বনু হুযাইলের শাখাগোত্র। বনু হুযায়েল তাদেরকে পাঠিয়েছে আগত কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর স্বাচ্ছন্দ্যের স্থান পেয়ে যাত্রা-বিরতি করেছে কাফেলা। বসে পড়েছেন সাহাবারা। পুটলি থেকে বের করছেন সফরের পাথেয় হিসেবে সঙ্গে

থাকা ইয়াসরিবের খেজুর। ক্লান্তি দূর করে, আহার সেরে, কর্তব্যকর্ম গুছিয়ে উঠে গেলো কাফেলা। ওদিকে কাফেলার মাড়িয়ে আসা পথ ধরে গভীরতর তলবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে- লাহইয়ানের তীরন্দাজরা। তারা আসছে পদরেখা অনুসরণ করে, পদচিহ্নের অনুগামী হয়ে। সাহাবিরা স্থানটি ত্যাগ করামাত্র এখানে এসে পা ফেলল তারা। আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে; যদি কোনো আলামত মিলে যায়। খুঁজছে দক্ষ রক্তখেকো হয়ে। মন-তন সব একমুখো করে। আচমকা একজন বলে উঠলো- 'ইয়াসরিবের খেজুর, ইয়াসরিবের খেজুর'। সে পেয়েছিল খেজুরের আঁটি। চিনতে দেরি হয়নি একটুও- ইয়াসরিবের খেজুর। সাহাবিরা খেজুর খেয়ে আঁটি ফেলেছিলেন সেখানটায়। সাহাবিদের রাস্তা ধরে জোর কদমে এগোলো তারা। দু'টো দল মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে টের পেলেন সাহাবিরা। দলনেতা আসেম ইবনে সাবেত সাথীদেরকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন 'ফদফদ' নামক উঁচু টিলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছুলো ধাওয়ারত তীরন্দাজ দলটি। ঘিরে ফেললো পুরো কাফেলাকে। সাহাবিদেরকে বলতে থাকলো- "তোমরা যদি স্বেচ্ছায় নেমে এসে বন্দিত্ব বরণ করো, তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদেরকে কিছুই করবো না।" কথাটি শেষ হলে আওয়াজ ছাড়লেন দলনেতা -আসেম ইবনে সাবেত রা.। ঈমানদীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন- "আল্লাহর কসম! আমি আজ কিছুতেই কাফেরদের নিরাপত্তা গ্রহণ করবো না। ইয়া রাব্বি! আমাদের তরফ থেকে আপনার রাসূলকে অবগত করুন।" আসেমের দৃপ্তকণ্ঠ শুনে কাফেরদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। মূহুর্তেই শুরু করলো তীর ছুঁড়া। নৃশংস ইতিহাস রচনা করে দলনেতা আসেমসহ দশজনের সাতজনকেই বানিয়ে দিলো- জান্নাতের মেহমান। বাকী রইলেন তিনজন; খুবাইব, যায়েদ ইবনু দাছিনা ও আব্দুল্লাহ ইবনু তারিক। কাফেরদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর ভর করে নেমে এলেন তাঁরা। কাফেররা তাঁদেরকে বেঁধে ফেললো ধনুকের রশি খুলে। ততক্ষনাৎ হাঁক ছাড়লেন তৃতীয়জন- "এরা তো গোড়াতেই দ্বিমুখী আচরণ দেখালো। রবের কসম কেটে বলছি- আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না, যারা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদের রাহ-ই অনুসরণ করবো।" কাফেররা তাঁকেও শহীদ করে ফেলল। খুবাইব ও ইবনুদ দাছিনাকে নিয়ে পথ ধরলো মক্কার...

কলজে পোড়ার গন্ধ-

দীর্ঘ রিহলার পর এই ক্ষণে এসে আমরা খুঁজে নেবো আমাদের গল্পনায়ককে। আমরা যে পথটি ধরে এতোদূর এসেছি, তিনিও সেই পথেই এসেছেন। আমরা এসেছি তাঁকে অনুসরণ করেই। সচেতন পাঠক অবশ্য এতক্ষণে চিনে ফেলেছেন তাঁকে। হাদায়া থেকে ধরে আনা দুইজনের একজন আমাদের কাঙ্ক্ষিত নায়ক। তিনি হলেন- খুবাইব। খুবাইব ইবনে আদি রা.। তাঁকে আজ বাজারে তুলা হবে। মক্কার বাজারে। বিক্রির জন্য। সাথে তাঁর সফরসঙ্গী যায়েদ ইবনু দাছিনাকেও। হুলুস্থুল অবস্থা বাজারজুড়ে। হুলুস্থুল পুরো মক্কায়। ক্রেতারাও নিজ দায়িত্বে হাজির ঠিক সময়ে। কেউ কেউ তো বেঁধে দেওয়া সময়ের আগেভাগেই চলে এসেছেন। এর মধ্যে বেশিভাগ ক্রেতাদের ভেতরেই প্রজ্বলিত -প্রতিশোধের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে যেন পুড়ে যাচ্ছে তাদের বুক-পিঠ। যেনো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের কলজে পোড়ার উদ্ভট গন্ধ। ওদিকে উপস্থিত ক্রেতাদের সমূহ রাগের আগুনকে ছাপিয়ে আকাশ ছুঁতে চলেছে একটি গোত্রের ক্রোধ আর প্রতিশোধের আগ্নেয়গিরি। সেই গোত্রটি- বনু হারেস। বনু হারেসের লোকেরা অনিমেষ চক্ষে তাকিয়ে আছে খুববাইবের দিকে। এমনভাবে পরখ করছে খুববাইকে; যেন চোখের পলক ফেলা নিষেধ। তারা আজ দৃঢ় প্রত্যয়ী, অনড় আপন সিদ্ধান্তে; যতো হিরে-জহরত আর দিরহাম-আশরাফীই লাগুক- আজ তারা খুবাইবকে কিনবেই। কারণ বদরযুদ্ধে খুবাইব হত্যা করেছিলেন তাদের গর্বের ধন হারেসকে। হারেস ইবনু আমরকে। দীর্ঘ দরকষাকষির পর তারা ক্রয় করলো খুবাইবকে। কিনলো আকাশছোঁয়া মূল্য- ৮০ মিছকাল আশরাফী বা ৫০ টি উঠের বিনিময়ে। নির্ধারিত দিনের প্রতীক্ষায় তারা তাঁকে ঠেলে দিলো বন্দিশালায়। খুবাইব এখন বন্দিশালায়...

তাঁরে দেখে চাঁদে হাসে-

পুবের আকাশে সূর্য উদিত হয়। সময়ের স্রোতে সূর্য যৌবন পায়। তখন ভরদুপুর। শেষমেশ তারুণ্য খুইয়ে সূর্য ঢলে যায় বার্ধক্যের কোলে। সূর্যের বার্ধক্যে গোধূলি আসে। এভাবেই নিয়মকরে শেষ হয় দিন। যোগ হয় যাপনের ভস্মীভূত পারচাতে। অবশেষে হাজির হত্যার দিন। খুববাইবের হত্যার দিন। বাতাসে সংবাদটি পৌঁছে খুববাইবের কর্ণকুহরে। নাহ্, এই খবর শ্রবণের পর খানিকটাও পরিবর্তন হয় না খুববাইবের মাঝে। দুঃসংবাদের কালো ছায়া দেখা যায়নি তার চোখমুখে। খুবাইব যেইসেই; আপন গতিতে, আপন হাল-অবস্থাতে। যদিও বনু হারেসের গরজ ছিলো- তাঁকে ভীত করে তোলা। দিনকাল ঘনিয়ে এলে প্রস্তুতি হিসেবে হারিসের কোনো এক কন্যার থেকে চেয়ে আনেন- একখানা ক্ষুর। ক্ষুর হাতে বসা আছেন খুবাইব। একে একে সম্পাদন করছেন ক্ষৌরকর্ম; বন্দিশালায় বসে। আচমকা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলো এক শিশু। হারেস-কন্যার পুতুলের মত শিশু। খুবাইব স্মিতহাস্যে তাকান শিশুটির দিকে। সেও তাকায় পিটপিট করে। কাছে আসার আহ্বান করলে দু'পা এগোয় সে। তিনি শিশুটির ডানায় আলতো করে ধরেন, উরুতে বসান আদর করে। চুমু খান শিশুটির কপালে, গালে। ইত্যবসরেই সেখানে পা পড়ে হারেস-কন্যার। আঁতকে ওঠেন হারেসকন্যা। কাণ্ড দেখে ডরভয় আর বিস্ময়ে থ বনে যান তিনি। কে দেখে তার বুকের ধুকপুকানি!

হারেস-কন্যা ভাবেন- আহা একি! শত্রুর হাতে পুত্রধন, শত্রুর হাতেই অস্ত্র। এটা কেমন ভুল করে বসলাম; একটুখানি বেখেয়ালির কারণে আজীবন বয়ে যেতে হবে পুত্রশোক। বুকের মানিকের প্রাণ বুঝি শত্রুর হাতেই উড়াল দেবে; ভাবেন তিনি। ভাবনায় ছেদ পড়ে খুবাইবের কথায়- "আপনি কি শঙ্কা করছেন- যে আমি তাকে হত্যা করবো? নাহ্, আমি তা কখনই করবো না। আমি তো হত্যাকারী

নই!" আমাদের গল্পনায়কের এই কোমল আচরণটি আমরা জানতে পারি- প্রত্যক্ষদর্শী সেই শিশুমাতা হারেস-কন্যার মুখ থেকেই। ইসলামে গ্রহণের পর হারেস-কন্যা এই কাহিনী রেওয়ায়েত করেন। তিনি এই কাহিনীর শেষার্ধে গিয়ে বলতেন- "আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো বন্দিকে দেখিনি।" আর এই শেষ বাক্যটা তিনি প্রায়সময়ই বলতেন। যখন খুবাইবের কথা আসতো, তখন তো বলতেনই।

তিনি স্বর্গের সবুজ পাখি-

বনু হারেস হারাম ত্যাগ করে এগিয়ে যাচ্ছে হিলের দিকে। সাথে খুবাইব। আজ তাদের বদলা গ্রহণের দিন। আজ হত্যার দিন। প্রতিশোধের পালা। বনু হারেস তাদের কাঙ্ক্ষিত এই দিনে আকাঙ্ক্ষিত শত্রুকে শূলে চড়িয়ে হত্যার জন্য মনস্থ করেছে। বিরামহীন পথচলার এক পর্যায়ে এসে মুখ খুললেন আমাদের গল্পের নায়ক। তাঁর মুখ খোলার দিকে সকলের উৎসুক দৃষ্টি। সবার ভাবনা- কী বলবে খুবাইব? এই বুঝি করজোড়ে ক্ষমা চাইবে। দাঁড়াবে নত মস্তকে। শির লুটাবে বনু হারেসের সামনে। না বন্ধু! ওদের ভাবনার সাথে আমাদের গল্পনায়কের তিল পরিমাণ সামঞ্জস্য নেই। ওরা চিনতে পারেনি আমাদের নায়ককে। খুবাইব মৃত্যুপাড়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে আবৃত্তি করেন-

"শত্রুর তরে নত হবো কেন?
ভীত হবো কেন?
পরোয়া কীসের মোর?
কুরবান হবো আল্লার তরে
দিলখোশ করে
মোর হৃদে তাঁর সুর।"
(অনুবাদ)

খানিক পরেই যিনি রচনা করবেন এমন জাগরণী কবিতার চরণ। আবৃত্তি করবেন তেজস্বী কণ্ঠে শরীরের সমূহ জোরবল মিশিয়ে। তিনি কী করে নত হবেন মূর্তিমানবদের কাছে? বিশ্বাসীদের এটা ভাবাও পাপ বন্ধু! খুবাইব বললেন-"আমাকে দু'রাকাত নামাজের সুযোগ দাও।" তারা কবুল করলো তাঁর আবদার। তিনি সালাত শেষ করে এলেন তাদের সম্মুখে। রাব্বে কাবার সাথে মিলিত হবার পূর্বক্ষণে আবেগের সম্পূর্ণটা আর ভালোবাসার শেষ বিন্দুকণার মিশেলে আবৃত্তি করলেন-

"নেই পরোয়া দিল কিবা মনে
পাক্কা সাচ্চা মুসলিম আমি
কোন পাশটায় পড়বো ঢলে
এই ভাবনায় কেন বা থামি!

রবের তরে কুরবান হবো
দেহ-আত্মা তো তাঁরই লাগি
তাঁর রাজিতে বারাকাহ পাবো
হবোই হবো মুক্তির ভাগী।"
(অনুবাদ)

পৃথিবীর নৃশংসতার ইতিহাসকে স্তম্ভিত করে শূলে উঠানো হলো আমাদের গল্পের নায়ককে। তীর ছুঁড়া হলো। বর্ষা ছুঁড়া হলো। অগণিত বর্ষার ফলক দিয়ে অবিশ্বাসীরা ঝাঁঝরা করলো এক বিশ্বাসীকে। শেষমেশ উকবা ইবনু হারেসের বর্ষার আঘাতে দুনিয়া ত্যাগ করলেন খুবাইব। এক্ষণে তিনি বলছিলেন-"ওগো প্রভু, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাতকে পৌঁছে দিয়েছি। যখন আমাদের এমন অবস্থা, তখন আপনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার রাসূলকে অবগণ করুন।" মৃত্যু তাঁকে আলিঙ্গন করে, তিনি মৃত্যুকে। পান করেন শাহাদাতের অমৃত সুধা। মুলাকাত ঘটে রফীকে আ'লার সাথে। তিনি উড়ে বেড়ান জান্নাতে, স্বর্গের সবুজ পাখি হয়ে। রাযিয়াল্লাহু আনহু...

শিক্ষার্থী, সানাবিয়া উলিয়া ১ম বর্ষ

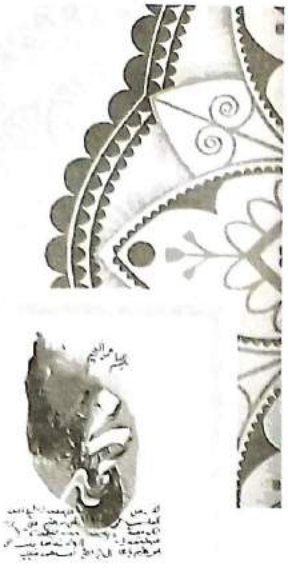

নবিজির দাওয়াতী জীবন

নাঈম উদ্দিন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন রমযান মাসের ১৭ তারিখ সোমবার- অপর এক বর্ণনায় ২৪ রমযান তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবুওত দান করেন।

দাওয়াতের সূচনা: নবুওতের প্রারম্ভে নবিজি সা. প্রকাশ্যে দ্বীন-প্রচারে আদেশ প্রাপ্ত হননি, তখন কেবল তাঁর কাছে ওহি আসত। অতঃপর কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুণরায় যখন ওহির অবতরণ শুরু হলো- তখন তাঁকে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের আদেশ দেওয়া হয়। এটা ছিলো নবিজির পরিচিত ও প্রিয়ভাজনদের নিকট দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা। তাই নবিজি সা. যাদের মাঝে কল্যাণ ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখতে পেতেন, তাদেরকেই ইসলামের দাওয়াত দিতেন। প্রথমেই প্রকাশ্যে দ্বীনপ্রচারের আদেশ দেওয়া হয়নি। কারণ কুরাইশের মূর্খ লোকেরা যখন তাওহীদের সুমহান বাণী শ্রবণ করবে, তখন তারা হইচই ও বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেবে। এজন্য নবি সা. প্রথম তিন বছর গোপনভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন ।

এরপর আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে প্রকাশ্যে দ্বীনপ্রচারের আদেশ দেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়-

وأنذر عشيرتك الأقربين

"আর আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করুন। (সূরা শুআরা, আয়াত- ২১৪)

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে নবিজি সা.সমগ্র কুরাইশ এমনকি নিজ ফুফু, চাচা ও কন্যাদের পর্যন্ত ডেকে শুনিয়ে দিলেন যে, নিজেদের মুক্তির চিন্তা তোমরা নিজেরা করো। আল্লাহর দরবারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। (তাফসীরে উসমানী ৭৯৪)

স্বগোত্র নিয়ে নবিজির সভা: সূরা শুআরার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে নবিজি আপন গোত্রের লোকদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। এতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। এই সভায় আবু লাহাবের উগ্রতার কারণে নবিজি নীরব থাকেন। এরপর আবার সভার আয়োজন করেন এবং উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, আলহামদুল্লিাহ! আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি এক ও অদ্বিতীয়,তাঁর কোন অংশীদার নেই। বিশেষ করে আমি তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। (আর রাহীকুল মাখতুম- ১৪৪)

তাঁর বক্তৃতার পর আবু লাহাব বলল- আল্লাহর কসম! এ হলো অন্যায়, দুষ্টামি-নষ্টামি। তার এমন ন্যাক্কারজনক কথার জবাবে আবু তালিব বলে উঠলেন- আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে- আমি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব। (আর রাহীকুল মাখতুম ১৪৫)

সাফা পর্বতে নবিজির পয়গাম: রাসূল যখন নিশ্চিত হলেন যে, আবু তালিব তাঁর এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন- তখন একদিন ছাফা পর্বতের শিখরে আরোহণ করে জনসাধারণকে আহ্বান করলেন। ياصباحاه

এটি শোনার পর কুরাইশের লোকেরা সেখানে সমেবেত হলেন। তখন তিনি আল্লাহর তাওহীদ, স্বীয় রিসালাত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সবাইকে দাওয়াত দিলেন। ভীতি প্রদর্শনমূলক বক্তৃতা শেষ হলে লোকজন যার যার মতে চলে যায়। কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু আবু লাহাব তাঁর নিকটে এসে বলে- তোর সর্বনাশ হোক। এজন্য কি তুই আমাদের সমবেত করে ছিলে? এর জবাবে সূরা লাহাব নাজিল হয়।

যখন মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তাঁরা একটি দলে রূপ নিল- এ সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা স্বীয় রাসূলকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য

নির্দেশ করে আয়াত নাযিল করেন-

فاصدع بما تؤمرو أعرض عن المشركين.

হে মুহাম্মদ, আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন। অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াত জনসম্মুখে প্রচার করুন। আর পৌত্তলিকদের উপেক্ষা করুন। (সূরা হিজর আয়াত ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে নবিজি সা. মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে দ্বীনের এ বার্তা সকলের নিকটে পৌঁছে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কালাম পড়ে শোনান। অন্যান্য নবিরাসূল যেসত্য বাণী প্রচার করেছিলেন, তিনিও তার অনুরূপ করেন। তিনি বলতে থাকেন-

يا قوم اعبدالله ما لكم من اله غيره

হে মানবজাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। (সূরা আরাফ, আয়াত- ৫৯)

তাঁর এ দাওয়াত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যার ফলশ্রুতিতে বহুলোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। নবিজি সা. প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গনে সালাত আদায় করেন। এ দৃশ্যপট দেখে কাফেরদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ক্রমে ক্রমেই বাড়তে শুরু করে এবং তারা মুসলমানদের উপর নানা রকম কষ্ট ও নির্যাতন করতে থাকে।

হাজিদের দ্বারে দ্বারে নবিজি: হজের মৌসুমে নবিজি সা. হাজিদের শিবিরে, উকায, যুল মাযাজ ও মাযিন্নাহ বাজারে আল্লাহর একত্ববাদ ও দ্বীনের তাবলীগ করেন। কিছুসংখ্যক কাফের তাঁর এ কাজ বাধাগ্রস্থ করার লক্ষ্যে পথের পাশে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়েজটলা বেঁধে বসে যা ইচ্ছা তাই বলতো। বিশেষ করে আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বলতো- এতো মিথ্যুক ও বেদ্বীন হয়ে গেছে। তোমরা তাঁর কথায় দৃষ্টিপাত করো না। (আররাহীকুল মাখতুম- ১৫১)

এই পদ্ধতিতে নবিজি সা. হাজিদের মাধ্যমে সমগ্র আরবে ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াত পৌঁছে দেন।

মক্কার মুশরিকদের উপহাস; নবিজির প্রশান্তি :

মক্কার মুশরিকরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো এবং বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিতো। তাদের কষ্টের মাত্রা এতই বেড়ে গেল- যা তাঁর হৃদয়কে মর্মাহত করে তুলল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ব্যথা-বেদনা লাঘব করার লক্ষ্যে এ আয়াত নাযিল করেন-

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين

প্রশংসা সহকারে তুমি তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হও। (সূরা হিজর আয়াত ৯৮)

মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত চিত্র :

তারা যখন দেখল ইসলাম ধর্ম বিজয়ী হতে চলেছে এবং তাদের সকল চেষ্টা তদবীর ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তারা বনু হাশীমের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলো। নবিজি ও তাঁর অনুসারীদের একটি পাহাড়ের ঘাঁটিতে তিন বছর বন্দি করে রাখলো। এরপর আল্লাহর সাহায্যে নবিজি তা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

তায়েফের পথে নবিজি: নবুওতের দশম বছর তায়েফবাসীর নিকট নবিজি পুরো একমাস দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ হতভাগারা তাঁর দাওয়াত কবুল না করে উল্টো কিছু বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিলো। তারা তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। ফলে তার পা মুবারক জখমি হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি বদদোয়ার একটি বাণীও উচ্চারণ করেননি।

মদিনায় নবিজির দাওয়াত : হিজরতের পর নবিজিতাঁর দাওয়াত নতুন আঙ্গিকে আরম্ভ করেন। এতে যুক্ত হল জিহাদ। রাসূল সা. নিজেই কয়েকটি জিহাদে সেনাপ্রধান ছিলেন। আবার কিছু যুদ্ধে বিশেষ বিশেষ সাহাবাদের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলমানগণ সহায় সম্বলহীন হওয়ার পরও প্রায় সবকটি যুদ্ধে বিজয় ও রবের অনুগ্রহ লাভ করেন।

অতঃপর নবিজি সা. বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্র মারফত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছান। এদের অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত হন।

এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম-সাধনার মধ্য দিয়ে নবিজি সা. গোটা আরবের বুক থেকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করে ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করেন এবং মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন। আমরাও যদি তাঁর আদর্শ লালন করি এবং ইসলামের সৌন্দর্য সমাজের মানুষের নিকট পেশ করি, তাহলে আমরা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো।

লেখক: শিক্ষার্থী, সানবিয়া আম্মাহ ২য়

তাবিজ-ঝাড়ফুঁক: বৈধ না নিষিদ্ধ

হুসনে মারুফ সাদী

তাবিজ-ঝাড়ফুঁক বৈধও নয়, নিষিদ্ধও নয়। আবার তা বৈধ এবং নিষিদ্ধও বটে। কথাটা হয়তো পাঠকের নিকট গোলক ধাঁধার ন্যায় একটু প্যাঁচালো হয়ে গেছে। যাই হোক, কথাটার সারবস্তু হল কিছু তাবিজ-ঝাড়ফুঁক এমন আছে যেগুলো বৈধ, শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। আর কিছু এমন আছে যেগুলো নিষিদ্ধ, শরীয়তসিদ্ধ নয়।

যে তাবিজ-ঝাড়ফুঁক শিরকমুক্ত তা বৈধ। আর যে তাবিজ-ঝাড়ফুঁক শিরকযুক্ত তা নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে প্রায় সব আলেম একমত। এটা অজ্ঞাত কোন কথা নয়, এটা সবার কাছেই সুবিদিত। কিন্তু, অধুনা আমাদেরই কিছু অবুঝ ভাই এ দুটোকে নিষিদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, তারা এক্ষেত্রে বেশ একটা বাড়াবাড়ি করছেন। সীমা তো অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছেন। সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার আর অভিজ্ঞতার সম্ভারের দিকে তাকানোর ফুরসতও বোধহয় পান নি। তারা ঢালাওভাবে এ দুটোকে শিরক বলে প্রকারান্তরে সমাজের মাঝে ফেতনা ছড়ানোর পাঁয়তারা করছেন। সত্যের দিশা দেওয়ার কথা বলে জাতিকে তারা ঘোর অমানিশার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারা অনেক ফেতনার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন। বহু কুসংস্কারের বীজ বপন করে চলেছেন। তাদের এই মন্দকর্মের ফসল এখন আমরা সমাজের জায়গায় জায়গায় প্রত্যক্ষ করছি।

আলহামদুলিল্লাহ! তাদের সকল অহেতুক, বানোয়াট অসৎকর্মের বিরুদ্ধে বহু আহলে ইলম এগিয়ে আসছেন। দলিল আদিল্লাহর ভিত্তিতে সফলভাবে তাদের মোকাবেলা করছেন। কোমল সুরে, প্রাঞ্জল ভাষায়, যুক্তির আলোকে জাতিকে এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করছেন। বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন।

ইনশাআল্লাহ, উলামায়ে কেরাম আমৃত্যু এরকম গজিয়ে উঠা ফেতনার মোকাবেলা করে যাবেন। এরকম কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করবেন। এমনকি শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন। ওদের এক ফেতনার নাম হল- "তাবিজ-ঝাড়ফুঁক শিরক"। যদি আল্লাহর তাওফীক শামিলে হাল হয়, তাহলে এ বিষয়ে স্বল্প ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

ঝাড়ফুঁক: সেই জাহিলি যুগ থেকে রোগ-বালাই থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে লোকেরা ঝাড়ফুঁক করত। ঝাড়ফুঁক মানে হচ্ছে কোনো কিছু পড়ে রোগীর গায়ে দম করা। আরবিতে তাকে বলা হয় الرقية। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাহিলি যুগের এসব তন্ত্র-মন্ত্রের সিংহভাগই ছিল কুফর আর শিরকে ঠাসা। আর ইসলামের বুনিয়াদ হল তাওহীদ। তাই ইসলাম এসে কোন শর্তারোপ ছাড়াই এধরনের সকল ঝাড়ফুঁককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নবিজি তখন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন-

إن الرقى والتمائم والتولة شرك

নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক তামীমা (পাথর বিশেষ) ও তিওয়ালা (স্বামীকে আকৃষ্ট করার যন্ত্রবিশেষ) শিরক। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস- ২৮৮৩)

ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন যে, এতে শিরকি কালাম থাকতে পারবে না। শিরকি কালাম না থাকলে নবিজি তার অনুমোদন দিতেন। সাথে সাথে তা অন্যদেরকে চালিয়ে যেতে বলতেন।

হযরত আউফ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমরা জাহিলি যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। আমরা নবিজিকে বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বিষয়টি কেমন মনে করেন? তখন নবিজি বললেন-

عليّ رُقاكم . لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شِركٌ

তোমরা ঝাড়ফুঁকে কী বল? তা আমাকে শোনাও। যতক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক শিরকমুক্ত হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৮৮৬)

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বলেন- আমি জাহিলি যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন নবিজিকে বিষয়টি বলি। নবিজি বললেন- তুমি যা বলে ঝাড়ফুঁক কর, তা আমাকে শোনাও। আমি তাকে শোনালাম। তখন নবিজি বললেন- অসুবিধা নেই। এ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে পার। আল্লাহর কসম, নবিজি আমাকে অনুমতি না দিলে কোনো এক লোককেও ঝাড়ফুঁক করতাম না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস-৮৪৪৪ (তাবারানীর বরাতে) হায়সামী বলেন, এর সনদ হাসান।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة

নবিজি আনসারি এক পরিবারকে বিষাক্ত প্রাণীর ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২১৯৩)

হযরত আয়েশা রাযি. আরো বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين .

নবিজি আমাকে বদ নজরের জন্য ঝাড়ফুঁক নিতে বলেছিলেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২১৯৫)

একবার উম্মে সালামার বাদীর মুখ হলদে বর্ণ হয়ে যায়। তখন নবিজি বলেন-

استرقوا لها فإن بها النظرة

এর প্রতি কারো বদ নজর লেগেছে, তাই বদ নজরের ঝাড়ফুঁক করাও। (সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২১৯৭)

হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ বলেন-

دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأنا عند حفصة، فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة.

একদা আমি হাফসা রা. এর কাছে বসা ছিলাম, নবিজি ঘরে এলেন এবং আমাকে বললেন- তুমি হাফসাকে যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, তাকে সেভাবে নামলা (এক ধরণের গোটা বিশেষ) এর ঝাড়ফুঁক শিখিয়ে দাও। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস- ৩৮৮৭)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন- নবিজি যখন রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় আসতেন, তখন সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে দুহাতে ফুঁ দিতেন। অতঃপর উভয় হাত, মুখ ও শরীরের যে পর্যন্ত হাত পৌছে, সে পর্যন্ত বুলাতেন, ইন্তেকালের পূর্বে যখন নবিজি অসুস্থ হন, তখন আমাকে তা পড়ে তাঁর গায়ে এমন করে দিতে বলতেন। (সহীহ বুখারি হাদীস- ৫৭৪৮)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, কুফর-শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁক জায়েয ও শরীয়তে বৈধ। আর শিরক সম্বলিত কোনো ঝাড়ফুঁক মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়, বরং স্পষ্ট হারাম। এতে তার ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে। নবিজি ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম করলে তার সমর্থনও করেছেন। এর বহু বর্ণনা ও ঘটনা হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান আছে। আপাতত এ হাদীসগুলোর উল্লেখ পূর্বক প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. বলেন- এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে তিনটি শর্তে ঝাড়ফুঁক বৈধ। এক. আল্লাহর কালাম বা তার নাম-সিফাত দিয়ে হতে হবে। দুই. (তা দিয়ে না হলে) আরবি ভাষায় বা এমন শব্দাবলি দ্বারা হতে হবে, যার অর্থ বুঝা যায় (এবং তাতে মুনকার কিছুই নেই)। তিন. এমন বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহই সুস্থতা দানকারী ঝাড়ফুঁক নয়। (ফাতহুল বারী ২৪০/১০)

আজকাল মানুষকে দেখা যায়- দেদারসে শিরক সম্বলিত তাবিজ গ্রহণ করছে আর খেয়াল খুশিমতো তা ব্যবহার করছে। এটা কিন্তু মুসলামনদের জন্য অনুচিত, বরং গর্হিত একটি কাজ।

তাবিজঃ পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক করা বৈধ ও মুস্তাহাব। উলামায়ে কেরাম এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এর উপর সর্বযুগে আমল হয়ে আসছে। ঠিক তদ্রূপ তাবিজও বৈধ; শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। সাহাবি, তাবেয়ি যুগেও তাবিজের ব্যবহার ছিল।

বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট তাবেয়িগণের কাছ থেকে এর ব্যবহারের কথা হাদীসের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত নবিজি সা. বলেন- তোমাদের কেউ ঘুমে ভয় পেলে সে যেন এই দুয়া পড়ে,

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرّ عباده ومن همزات الشياطين

বর্ণনাকারী সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে এ দুয়াটি শিখিয়ে দিতেন। আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক তাদের জন্য দুয়াটি লিখে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। (সুনানে আবু দাউদঃ ৩৮৯৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাঃ ২৩৫৪৭; জামে তিরমিযিঃ ৩৫২৮; মুসনাদে আহমদ ২/১৮১; মুসতাদরাকে হাকিমঃ ২০১০)

তাবিজ শব্দটি মূলত আরবি। عوذ ধাতু থেকে উদগত। তার অর্থ হল আশ্রয়প্রার্থনা করা।

তাবিজ ব্যবহারকারী যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নিয়তে তাবিজ ব্যবহার করে এবং তাতে কুরআন হাদীসের কোন দুয়াই লেখা হয়ে থাকে, তাহলে এই তাবিজ ব্যবহার 'মুবাহ' হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু তাবিজ ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে এর নিজস্ব কোনো আমল পাওয়া যায় না অধিকন্তু এই আশঙ্কাও থাকে যে, সে অবচেতনভাবে তাবিজের উপরই ভরসা করে বসবে, তাই সালাফের কতক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব একে পছন্দ করেননি। এ থেকে সর্তকতা অবলম্বন করতে বলেছেন। কিন্তু এমনটা নয় যে, তারা একে নাজায়েয বলেছেন। তাইতো সালাফের বিরাট এক জামাত এটি মুবাহ হওয়ার প্রবক্তা। শুধু সালাফ নয়, আমাদের আসলাফেরই প্রায় সবাই এটি জায়েয হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এছাড়া তাবেয়িদের মধ্যে শ্রেষ্টতম যারা, তাদের কাছ থেকেও এর আমল পাওয়া যায়।

হাজ্জাজ বলেন, বিশিষ্ট তাবেয়ি সাঈদ ইবনে জুবাইর নিজে তাবিজ লিখতেন। বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে তাবিজ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এতে কোন অসুবিধার কথা আমরা শুনিনি। কেউ কিছু বললে তোমাকে ইরাকের কেউ বলতে পারে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ২৩৯৭৭)

ইবরাহীম নাখায়ি বিষয়টি নিষেধ করতেন। তিনি ইরাকের। আতা রহ. সেদিকেই ইশারা করেছেন। হযরত আবু ইসমা বলেন- আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে তাবিজ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করি, জবাবে- তিনি বলেন, কোনো অসুবিধা নেই।

যদি চামড়ায় মোড়ানো থাকে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ২৪০০৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর বিশিষ্ট ছাত্র প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হযরত মুজাহিদ রাহ. মানুষের জন্য তাবিজ লিখতেন। অতঃপর তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ২৪০১১)

হযরত ইসমাঈল ইবনে মুসলিম রহ. বিশিষ্ট তাবেয়ি ইবনে সীরীন রহ. এর ফতোয়া বর্ণনা করেন যে, ইবনে সীরীন রহ. কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাবিজ লেখাকে দোষণীয় মনে করতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ২৪০১৪)

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো বিশিষ্ট সাহাবি ও তাবেয়িগণের। এ থেকে দিবালোকের ন্যায় এটা সুস্পষ্ট যে, সে যুগে রোগ-বালাই থেকে মুক্তি বা নিরাপত্তার জন্য ঝাড়ফুঁকের ন্যায় তাবিজও ব্যবহার করা হত। আরো স্পষ্ট হলো যে, সে যুগেও তাবিজের প্রচলন ছিল। সুতরাং বুঝা যায় যে, শিরকমুক্ত তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ। মুসলিম যেহেতু তাওহীদে বিশ্বাসী, তাই সে সুস্থতা-অসুস্থতা, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ আল্লাহ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করে। ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সে এই বিশ্বাস মনে জাগরূক রাখবে। এই বিশ্বাস মনে জাগরূক রেখেই মুমিন একটি ওসীলা হিসেবে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ গ্রহণ করবে এবং পূর্ণ লক্ষ্য রাখবে যাতে তা শিরকমুক্ত ও সকল নাজায়েয কর্মকান্ড থেকে মুক্ত হয়।

কিন্তু আজকাল মানুষকে দেখা যায়- দেদারসে শিরক সম্বলিত তাবিজ গ্রহণ করছে আর খেয়াল খুশিমতো তা ব্যবহার করছে। এটা কিন্তু মুসলামনদের জন্য অনুচিত, বরং গর্হিত একটি কাজ। আমাদের কিছু সুহৃদ বন্ধু বলেন যে তাবিজ-ঝাড়ফুঁক করা তাওহীদের পরিপন্থী। আসলে কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে একটু নিম্নস্তরের, সেগুলোর একটি হল তাবিজ-ঝাড়ফুঁক। তো এগুলোতে যতটুকু কমতি আছে, বলার ক্ষেত্রে সেই কমতিটুকু বলা উচিত। কিছু বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে বলা বিদআতকে শিরক বলে চালিয়ে দেওয়া, তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিপন্থী বিষয়কে তাওহীদের পরিপন্থী বলে আখ্যা দেওয়া- এগুলো শোভনীয় নয়। তা বড় লোকসানের কারণ এবং মূর্খতার পরিচায়ক। তবে একথা মানতে হবে যে, আমরা এখনো এ দুটোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা জানি না তার সঠিক শরয়ী হুকুম। তাই বিধর্মীদের কাছ থেকেও তাবিজ-ঝাড়ফুঁক নিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। অথচ জানা কথা যে, এদের কথায়-লেখায় প্রচুর শিরকি-কুফরি বাক্য থাকে। আর তাবিজ-ঝাড়ফুঁকে শিরকি কালাম থাকলে তা সুস্পষ্ট শিরক। শিরকের ভয়াবহতা ও ঘৃণ্যতার সামান্যতম অনুভূতি থাকলে তো অল্পতেই গা শিউরে উঠার কথা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ সমুঝ দান করুন- আমীন।

খেদমতে খালক: আকাবির ও আমরা

রশীদ আস-সানী

খেদমতে খালক। অবহেলিত এক ইবাদত। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস খেদমতে খালকের আলোকিত অধ্যায় ছাড়া অপূর্ণ। নববি জীবন ছিল খেদমতে খালক দ্বারা পরিপূর্ণ। সাহাবাযুগ, তাবেয়িযুগ, তাবয়ে তাবেয়ি যুগও ছিল ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ এই খেদমতে খালক দ্বারা। মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও আল্লামা কারো জীবনই খালি ছিল না- আর্ত, অনাথ ও দীনহীনদের সহায়তা তথা খেদমতে খালকের দ্যুতিময় গুণ থেকে।

আমরা যদি নবিযুগের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবিচ্ছেদ্য এক গুণ ছিল- মানবতার সেবা। চাই তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হোক কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে হোক। আমরা জানি- প্রথম ওহি নাযিলের পর যখন নবিজি কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলেন আর বলতে লাগলেন- খাদিজা! আমি তো জীবনের আশংকা করছি, তখন খাদিজা রাযি. নবিজিকে এই বলে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন- আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। আপনি তো আর্ত, অসহায় এতিমদের সাহায্য করেন। আপনি তো দুস্থ, অনাথ, অক্ষমদের সহযোগিতা করেন। আপনি তো মেহমানদের যথাযথ খেদমতের ব্যাপারে সজাগ থাকেন। তো আল্লাহ আপনাকে কীভাবে ধ্বংস করবেন?

হযরত খাদিজা রাযি. যখন বললেন- আপনি তো অসহায়, নিঃস্ব, অসচ্ছলদের সাহায্য করেন- তখন তো একথাই প্রতিভাত হয় যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তে মাংসে মিশে গিয়েছিল- অনাথ, দরিদ্র আর দীনহীনদের সেবায়, সাহায্য সহযোগিতায় বিলীন হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। তেমনি এ কথাও পরিস্ফুটিত হয় যে, খেদমতের কাজে যারাই জড়িয়ে থাকেন, দুঃখির দুঃখ মোচনে, অভাবীর অভাব বিদূরনে যারাই সচেষ্ট থাকেন, তারা কখনো ব্যর্থ হতে পারেন না। কখনো ধ্বংস হতে পারেন না। করে তো দেখিয়েছেনই; বলেও গেছেন খেদমতের বিস্ময়কর ফযীলতের কথা-

سيد القوم في السفرخادمهم، فمن سبقهم بخدمة لا يسبقه بعمل إلا الشهادة

অর্থাৎ, কওমের নেতা তো সেই, যে খেদমত করে। খেদমতে অগ্রবর্তী ব্যক্তিকে শাহাদাত ছাড়া অন্য কোনো আমল দিয়ে কেউ পেছনে ফেলতে পারে না।

আরো বলেছেন-

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

'তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী: ১৯২৪, আবু দাউদ: ৪৯৪১)

সাহাবাযুগের ইতিহাস তালাশ করলে আমরা খেদমতে খালকের উজ্জ্বল ঝলকই দেখতে পাই। ঐ যে অন্ধ বুড়ির কাহিনী। হযরত উমর রাযি. দেখতে পেলেন- কে যেন বুড়ির সব কাজ সমাধা করে দেন। কেউ জানেও না- কে ঐ ব্যক্তি! উমরের অনুসন্ধানী মন খুঁজতে থাকে। বেশি কষ্ট হলো না উমরের ঐ গুমনাম আদমীর খোঁজ পেতে। তার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন- ভাই আবু বকর! "তোমার আগে যাওয়া হয়তো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" এতো গেলো-খলীফায়ে আউয়ালের জীবনের ক্ষুদ্র চিত্র।

কেমন ছিলেন উমর। উমর সারা রাত ঘুরতেন পুরো মদিনা জুড়ে। ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোথাও কোনো মানব না খেয়ে আছে কি-না। কোথাও কোনো প্রাণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে আছে কি না।

শুধু কি তাই! আঠার বস্তা নিজ কাঁধে বহন করে নিয়ে পৌঁছেও দিতেন অভাবীর কুঁড়েঘরে। খেদমতে খালকের এই চেতনায় সমৃদ্ধ সাহাবাচরিতের বিশাল এক অধ্যায়।

ইমাম আবু হানিফা। আমাদের মাযহাবের মান্যবর ইমাম। আমাদের জানা আছে- অনেক গরিব তালিবে ইলমের ব্যয়ভার তিনি বহন করতেন। দরিদ্র, অসহায়দের প্রতি তার দান, উদারতা আর সহমর্মিতা ছিল অতুলনীয়। একটি উদাহরণ দিই-

কুফা শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন ধনী; কিন্তু কালের কষাঘাতে হয়ে পড়লেন দরিদ্র। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল অসম্ভব ধরনের। একদিন তাঁর মেয়ে তাজা শসা দেখে চিৎকার করতে করতে ঘরে এল। মাকে বলতে লাগলো-

মা! টাকা দাও, শসা খাব! কিন্তু মা টাকা কোথায় পাবেন? পুরো ঘর তো শূন্য। বাবা এই দৃশ্য দেখে কান্না আটকাতে পারলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন- আজ আবু হানিফার দরবারে যাবেন। গেলেনও। কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে বলতে পারলেন না। অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। তবে আবু হানিফা তাঁর মুখে অভাবের লেখা বুঝতে ভুল করলেন না। লোকটি চলে যাওয়ার সময় অতি সতর্কতায় তাঁর পিছু নিলেন। দূর থেকে বাড়ি চিনে ফিরে এলেন।

গভীর রাতে ইমাম আবু হানিফা বের হলেন পাঁচশত দিরহাম বোঝাই একটি থলে নিয়ে। ঐ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে নক করলেন। লোকটি বেরিয়ে আসা মাত্রই ইমাম আবু হানিফা এই বলে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন- দেখো! তোমার দুয়ারে একটি থলে পড়ে আছে- এটা তোমার। (আব্দুল কাইউম ইরানী- দিফায়ে ইমাম আবু হানিফা, ১৭৪)

সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি মাত্র কাহিনী শুনলাম। এমন শতশত উদাহরণ -আমাদের ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে।

বিগত শতকের আকাবিরদের জীবনচরিতের দিকে তাকালেও দেখা যায়- এখানেও সেই সমৃদ্ধতা ও ঋদ্ধতা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। দু'একটি উদাহরণ দিই-

হযরত শাহ আব্দুর রহীম দেহলভি রহ. কে বাদশাহ তাঁর দরবারে আহ্বান জানালেন। সুন্দর পোশাক পরে বেরিয়েছেন- দরবারে যাবেন। পথে দেখতে পেলেন নর্দমায় একটি কুকুর ছানা আটকে আছে। কোনভাবেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। খাদেমকে বললেন- ওকে বের করে আনো। খাদেম ছিলেন- শাহী মেযাজের। তাই ইতঃস্তত করছিলেন। তখন শাহ সাহেব নিজেই জামার হাতা গুটিয়ে সেটি তুলে আনলেন। হাম্মামে এনে গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে গোসল করালেন। ছানাটি শীতে কাঁপছিল। গরম পানি পেয়ে জীবন ফিরে পেলো। এরপর তোয়ালে দিয়ে ছানাটিকে ভালোভাবে মুছে দেওয়া হল। (হযরত আশরাফ আলী থানবি রহ. এর বক্তৃতামালা: ৪১৬-৪১৫)

হযরত শিবলী রহ. এক সফরে কোনো এক দোকান থেকে চিনি কিনলেন। তারপর শক্ত করে গাঁট বেঁধে সঙ্গে নিলেন। ঘরে এসে গাঁট খুলে দেখেন- চিনির মধ্যে একটি পিঁপড়া। গাঁট যেহেতু শক্ত করেই বাঁধাছিল, তাই পথে কোথাও পিঁপড়া ঢুকার সম্ভাবনা ছিলনা। তিনি চিন্তা করলেন- এভাবে পিঁপড়াটা চলে আসায় তার সঙ্গী পিঁপড়া নিশ্চয় কষ্ট পাবে। তাই অনেক দূরের ঐ চিনির দোকানে পিঁপড়াটাকে রেখে এলেন। (আশরাফুল হেকায়াত- ২৪)

এভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি, আল্লামা কাসেম নানুতুবি, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, শায়খুল ইসলাম মাদানি, সায়্যিদ আহমদ কবীর রেফায়ি, মুফতী শফী রাহিমাহুমুল্লাহ সহ আকাবির কাফেলার মহানায়কগণ খেদমতে খালকের সবুজ উদ্যানে অবদান রেখে রেখেই অতিবাহিত হয়েছেন।

সাথে সাথে আমরা এও দেখতে পাই- একেবারে নবিযুগ থেকে নিয়ে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত যারাই মানবতার সেবায় নিজেদের নিবেদিত ও নিবিষ্ট রেখেছেন, সবাই ব্যক্তি, সমাজ ও সকলের হৃদয়ে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে ঠাঁই পেয়েছেন। মানুষ ও সমাজ তাদেরকে ভালোবেসেছে- অতুল ভালবাসা। সেই ভালোবাসা দ্বীন প্রচারে এবং দাওয়াতের ময়দানে তাদের সীমাহীন উপকার করেছে।

কিন্তু দুঃখের সাথেই বলতে হয়- আজ আমরা আকাবিরদের রক্ত ও ঘামে সিক্ত এই মহান গুণটি পারছি না নিজেদের ক্ষেত্রে বাস্তব করে তুলতে। চরম অবহেলা আর বিমুখতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একথা তো বাস্তবসত্য যে, খেদমত এমনই এক জিনিস- যদি বিধর্মীরাও খেদমত করে, তাহলে তারা আখেরাতে কিছু না পেলেও দুনিয়াতে অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে।

আমর ইবনুল আস রাযি. তো বলেই গিয়েছেন- শেষ জামানায় নাসারারা যে কারণে প্রাধান্য লাভ করবে, তার অন্যতম কারণ হল- দুঃস্থ, অসহায় আর বিধবাদের সহায়তা করা।

সুতরাং আসুন! জাঁকজমক, বিলাসিতা আর লৌকিকতা ছেড়ে দ্বীন-ঈমানের অস্তিত্ব রক্ষায় আমরা এখনই খেদমতে খালকের মহান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। খেদমতে খালকের চেতনায় জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়াই হোক আমাদের জীবনের দৃঢ়প্রত্যয়। জীবন, আত্মা ও দেহ সার্থক হোক খেদমত ও সেবার বিচিত্র ময়দানে বিসর্জিত হতে হতে। জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতিফলিত, প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার উদগ্র বাসনা।

লেখক: শিক্ষার্থী, সানাবিয়াহ আম্মাহ ১ম বর্ষ

প্রতিটি সন্তানই হোক
মাতা-পিতার নিরলস খেদমতগার

✍ | মুহাম্মাদ জাফরুল ইসলাম

ভোরের কুয়াশা ভেদ করে পূর্ব দিকে উদিত হওয়া সূর্যের আলো পৃথিবীতে যেমন করে তার কিরণ ছড়ায়, গোধূলির স্নিগ্ধতায় উদিত হওয়া চাঁদের সফেদ আভা যেভাবে সাগরের অন্ধকার পানিকে রৌশন করে তুলে, ঠিক তেমনই সদাসর্বদা প্রত্যেক বাবা মা-ই তাদের সন্তানদের আলোর পথ দেখিয়ে যান।

সন্তানদের ফায় ফরমায়েশ, আবেগ ও অনূভুতি, ইচ্ছা ও বাসনা পূরণে সর্বদা যারা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন- তারাই হলেন বাবা-মা। সন্তানদের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো আবদার, মনের বাসনা অপূরণ থাকুক, তা কোনো বাবা-মা কখনোই চান না।

যখন কোনো সন্তান এই পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখে, তখন সবচেয়ে বেশি যারা খুশি হন, নিরন্তর আনন্দের স্রোতে যারা ভেসে বেড়ান, তারাই হলেন মমতাময়ী মা ও স্নেহশীল বাবা।

একজন নারী কখন সবচেয়ে বেশি খুশি হন জানেন?

যখন তার হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ আবিষ্কার হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালোলাগার মুহূর্তগুলো কাজ করে, যখন সে নারী অনুধাবন করতে পারে আমি মা হতে যাচ্ছি। আমার উদরে বয়ে বেড়াচ্ছি সাত রাজার ধন। আদরের দুলাল বা দুলালী নিয়েই আমি দিন গুজরান করছি।

একজন নারী তার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় যে সংবাদটি পেয়ে থাকে তা হলো; যখন সে শুনতে পায় তার গর্ভে নতুন মেহমানের আবির্ভাব ঘটেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে খুব শীঘ্রই একটা নিয়ামত দিতে চলেছেন। এই যে অনুভূতি, এই যে আনন্দের প্লাবন তার মধ্যে বয়ে যায়, তা একজন 'মা' ব্যতীত কাউকে বলে বুঝানো সম্ভব নয়।

মা একদিকে পরিবারের সাম্রাজ্য দেখে রাখেন আর বাবা সেই সাম্রাজ্যের চার দেয়ালকে নানাভাবে খুবই মজবুতির সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন। বাবা হওয়ার পর প্রতিটি পুরুষের মধ্যে এক বিশাল পরিবর্তন হয়। চোখের মণি কলিজার টুকরো সন্তানদের মুখে এক লুকমা ভালো খাবার তুলে দিতে, তাদের গায়ে ভালো একটা জামা পরিধান করাতে সারাদিন ঘরের বাইরে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে থাকেন। ঘরে আসার পর যখন দেখতে পান সন্তানদের চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক, তখন সমূহ কষ্ট তিনি ভুলে যান। সন্তানদের হাসিতেই তার সকল দুঃখ ব্যথার উপশম হয়ে যায়।

পৃথিবীর সকল বাবা-মার একটি সুপ্ত ইচ্ছা থাকে। লালিত স্বপ্ন থাকে। যেনো তাঁদের আদরের সন্তান, নাড়িছেঁড়া ধন সমাজের মধ্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে। আদর্শ আর যোগ্যতায় সে যেনো হয়ে ওঠে যুগের কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি। তাদের কাছে থেকেই আমরা যেনো জীবনের অন্তিম সময়গুলো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারি। সন্তানদের নিকট এটাই থাকে সকল মা-বাবার আকুল ইচ্ছে।

কিন্তু হায় আফসোস! কতটা নির্লজ্জ হলে একটা সন্তান তার মাতা-পিতার অবদানের কথা এতো সহজে ভুলে যেতে পারে। যে সময়টা আসার পর প্রত্যেক বাবা-মা-ই চায় সন্তানরা তাদের একটু সময় দিবে, তাদের পাশে বসে একটু গল্প করবে, তাদের নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে। এই যখন আশা আর আকাঙ্খা, কামনা আর মানসিক বাসনা, ঠিক তখনই কলিজার টুকরো, নাড়িছেঁড়া ধন, ঔরসজাত সন্তান পিতা-মাতার খেদমত করা তো দূর কি বাত- তাঁদের ফেলে রেখে আসে একাকিত্বের গহ্বরে। নিজের কাছে তাঁদের না রেখে বাড়ি থেকে বের করে- রেখে আসে বৃদ্ধাশ্রমে। এমন গর্হিত আচরণ করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না।

এমন উদ্ভূত পরিস্থিতি, জঘন্যতম আচরণ ও নির্লজ্জতার কারণ হলো- ওই সন্তানের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া। সন্তানদের সঠিক তরবিয়তের সাথে গড়ে তোলা বাবা মায়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

বাবা-মা-ই হলেন সন্তানের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। সন্তানের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক।

হাল যামানায় মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের বিপথগামী হওয়ার নেপথ্যে কারণ হলো পরিবারের অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতা। সন্তানদের সৎ ও ধার্মিক হিসেবে গড়ে তুলা

শুধু অত্যাবশকীয় দায়িত্ব-ই নয়; বরং এটা দুনিয়া ও আখেরাতের পরম সাফল্যও বটে।

মানুষ মারা যাওয়ার পরও তিনটি কারণে সওয়াবের অংশীদার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নেক সন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়া। সন্তানকে সুন্দর, সৎ, আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন করার জন্য কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নিচে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

১। মূল কথা হচ্ছে সন্তানকে ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে তোলার জন্য তার জন্মের পর তাকে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী শুনানো, আযান দেওয়া, ইসলামিক নাম রাখা এবং আকীকা সম্পাদন করা। হাদীসে আছে- 'তোমরা সন্তান জন্মের পর একটা উত্তম নাম রাখ'। (আবু দাউদ)

২। ধর্ম অনুশীলনে অভ্যস্ত কর। সততা, দায়িত্ববোধ, সংকল্প, সমবেদনা, সাক্ষাতে সালাম করা, বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেওয়া। রাসূল সা. বলেছেন– 'যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (আবু দাউদ-৪৯৪৩)

৩। মাতৃকুল হলো সন্তানের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। তাই শৈশবে সন্তানদের আদব আখলাক, সততা, বিনয় নম্রতা ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাসূল সা. বলেছেন– 'সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে সুন্দর আদব শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম কিছু নেই'। (তিরমিযি)

৪। তাদের বন্ধু বান্ধব কারা, তারা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে- সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বর্তমান সময়ে মাদক সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাই ছেলে-মেয়েদের বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে চলা-ফেরার সুযোগ না দেওয়া। অনেক সন্তান এমনও আছে, যারা মায়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে, তার সহানুভূতি কাজে লাগিয়ে বাবাকে বিভিন্নভাবে মোটিভেশন করার চেষ্টা করে থাকে। অভিভাবকদের এ দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিৎ।

৫। এমনভাবে সন্তানকে গড়ে তোলা। যেনো তারা সর্বাবস্থায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ সন্তানকে মধ্যমপন্থী হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে তারা ভোগ বিলাসমুক্ত সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৬। আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখা এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বৈষয়িক নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়াও অতীব প্রয়োজন।

মনে রাখবেন, একজন নেক সন্তান রেখে যদি কোনো মা-বাবার মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁদের মৃত্যু সার্থক। কেননা রাসুল সা. নেক সন্তানকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। (যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।)

সন্তানের প্রতি তাদের মাতা-পিতার যেমন কর্তব্য রয়েছে, ঠিক একইভাবে মাতা-পিতার প্রতিও সন্তানদের কর্তব্য রয়েছে। রাসুল সা. বলেন– 'দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি! দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি!! দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি!!! যে বৃদ্ধ অবস্থায় তার পিতা-মাতা উভয়কে পেয়ে জান্নাত হাসিল করতে পারলো না।'

আমরা আজ আমাদের উদাসীনতার কারণে এমন একটা মহৎ কাজ থেকে বঞ্চিত। আমরা চাইলে আমাদের জান্নাতে থাকার ব্যবস্থাটা দুনিয়াতেই নিশ্চিত করে যেতে পারতাম। কিন্তু আহ...

একবার একলোক রাসূল সা. 'র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো– 'হুযুর! সন্তানের উপর মা-বাবার হক কী পরিমাণ'? হুযুর সা. বললেন– 'মা-বাবাই তোমার বেহেশত আর মা-বাবাই তোমার দোযখ।' অর্থাৎ মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রেখে তাদেরকে একটি আনন্দময় জীবন উপহার দিলে তুমি বেহেশতের অধিকারী হবে আর মা বাবাকে কষ্ট ও অসন্তুষ্টির মধ্যে রাখলে তুমি জাহান্নামের অধিকারী হবে।

একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. দেখতে পেলেন এক ইয়েমেনি যুবক তার মাকে পিঠে নিয়ে তাওয়াফ করছে আর বিড়বিড় করে বলছে, আমি আজ আমার মায়ের জন্য অনুগত উটের মতো। তাওয়াফ শেষে লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বললো- হে আব্দুল্লাহ বিন উমর! আমার মা আমাকে যতোদিন গর্ভে ধারণ করেছেন, আমি তার চেয়ে বেশিদিন তাঁকে আমার পিঠে করে বহন করেছি। আমি কি আমার মায়ের গর্ভধারণের প্রতিদান দিতে পেরেছি? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বললেন- নাহ! আপনি আপনার মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও দিতে পারেন নি, আর পারবেনও না।

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, আমরা যদি ভাবি আমরা আমাদের মাতা-পিতার জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছি, তাহলে সেটা ভুল ভাবনা হবে। আদতে তাঁদের প্রতিদান দেওয়া আমাদের কারো পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এজন্য মা-বাবার হক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টিতে না ভোগাই ভালো। বরং মন উজাড় করে বেশি বেশি তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থেকে তাঁদের খুশি রাখার চেষ্টা করতে পারি। যদি তাঁদের সন্তুষ্টি আমাদের উপর থাকে, তাহলে মহান আল্লাহও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন 'ইনশাআল্লাহ'।

এমন এক সময় আসবে, যখন হাজার ইচ্ছে হলেও মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকার জন্য মাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার বাবা-মা যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তাহলে আপনার জান্নাতে যাওয়ার দু'টো দরজা এখনও আপনার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সুতরাং তাঁদের থেকে যা হাসিল করার করে ফেলুন।

আমার ভাইয়েরা, একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। বৃদ্ধকালে বাবা-মার প্রতি বিরক্তিতে 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। তাহলে তাঁদের সাথে কর্কশকণ্ঠে কথা বলা, তাঁদের সাথে অমার্জিত, অশোভনীয় আচরণ করা কত বড় গোনাহের কাজ তা কি আমরা এখনো বুঝবো না? আমরা যেনো মনপ্রাণ উজাড় করে পিতা-মাতার খেদমতে লেগে থাকতে পারি, মহান প্রভু যেনো সে তাওফীক আমাদের দান করেন। আমীন!

শিক্ষার্থী : মুতা. ৩য় বর্ষ।

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর
Jamia madania angura muhammadpur
স্বাগতম
WELCO

জামিয়া ও অন্যান্য

জামিয়ার বর্তমান শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী

ক্রমিক	নাম	মোবাইল
০১	হযরত মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দিন সাহেব (মুহতামিম ও নাযিম)	০১৮১৯-৬৫৩৭১৯
০২	হযরত মাওলানা শায়খ মুফতী মুজীবুর রহমান সাহেব	০১৭১২-১৩০৮৮৫
০৩	হযরত মাওলানা শায়খ মাহমুদুর রহমান সাহেব	০১৭১৮- ১৩২১০৯
০৪	হযরত মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক সাহেব	০১৭১৫- ৫০৪১৮৯
০৫	হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব (নির্বাহী মুহতামিম)	০১৭১৫- ৩৫৬২০৯
০৬	হযরত মাওলানা আব্দুল হাফীয সাহেব শমসের নগরী	০১৭১২- ৩২৩৬৫৪
০৭	হযরত মাওলানা ফয়যুল হাসান খাদিমানী সাহেব	০১৭১২- ২৮০৮৬৯
০৮	হযরত মাওলানা আসআদ উদ্দিন আল-মাহমুদ সাহেব	০১৭১৫- ১৪২৩৮৭
০৯	হযরত মাওলানা ইয়াকূব আলী সাহেব	০১৭৩৫- ২৮১৫৯৮
১০	হযরত মাওলানা বিলাল আহমদ ইমরান সাহেব	০১৭১২- ৭৪৫০৪৮
১১	হযরত মাওলানা হাফিয আব্দুল খালিক কাসিমী সাহেব	০১৭১৫- ০৬৯৬০০
১২	হযরত মাওলানা মাহফুয আহমদ কাসিমী সাহেব	০১৭৯৫-২১৯০৫৮
১৩	হযরত মাওলানা হাফিয জসীম উদ্দিন সাহেব	০১৭২০-৯৯৯০৬৭
১৪	হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির সাহেব সুরইঘাটী	০১৭১৪-৬০৯৮২৩
১৫	হযরত মাওলানা ইকবাল হুসাইন সাহেব	০১৭৪১-১৫৯৯৯১
১৬	হযরত মাওলানা ইয়াহয়া সাহেব	০১৭৫১ ১৫৭৬৬২
১৭	হযরত মাওলানা জফির উদ্দিন সাহেব	০১৭২৪-৮৮৪৪৭১
১৮	হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া বিন আসআদ সাহেব	০১৭৪৭-২৯৯৪০০
১৯	হযরত মাওলানা হাফিয ফরহাদ আহমদ সাহেব	০১৭৩৮-৩৫১৮২৩
২০	হযরত মাওলানা শামীম আহমদ ক্বাসিমী সাহেব	০১৭১০-৫২৫৪৭২
২১	হযরত মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব	০১৭৯৯ ৩৭৫২৭৬
২২	হযরত মাওলানা মাজেদুল হক সাহেব	০১৭৩৪ ৮৮২৫৫৯
২৩	মাস্টার আনওয়ার হোসাইন সাহেব	০১৭৪১-১০৮১৩৮
২৪	হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেব আকাখাজানি	০১৭৮৬-৪৬৮৫৭৩
২৫	হযরত মাওলানা খায়রুজ্জামান সাহেব	০১৭১২-৪৯৬৯০৩
২৬	হযরত মাওলানা জিল্লুর রহমান চৌধুরী সাহেব	০১৮২৭-৮৭১৪৪১
২৭	হযরত মাওলানা জামিল আহমদ সাহেব	০১৭১৭-৪৬৪৪৪৬
২৮	হযরত মাওলানা হাফিয নাসির আহমদ সাহেব	০১৭৩১-৭৭২৮৮৬
২৯	হযরত মাওলানা হাফিয শিব্বির আহমদ সাহেব	০১৭৪৫-১৩৯৯৯৩
৩০	হযরত মাওলানা হাফিয আব্দুল্লাহ সাহেব	০১৭৪৪-৫০৩৬১১
৩১	হযরত মাওলানা হাফিয জামাল উদ্দিন সাহেব	০১৭২৫-৫৮৫০৫২
৩২	হযরত মাওলানা হাফিজ রুহুল আমীন	০১৬৩৯-৮৬৭১৮৭
৩৩	হযরত মাওলানা হাফিয আফজল হুসাইন সাহেব	০১৭৬৬-৮৭৪২৬৩
৩৪	হযরত মাওলানা আব্দুর রব খাঁন সাহেব	০১৭১১-৭৩৬০০৪

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর

বিয়ানীবাজার, সিলেট-এর

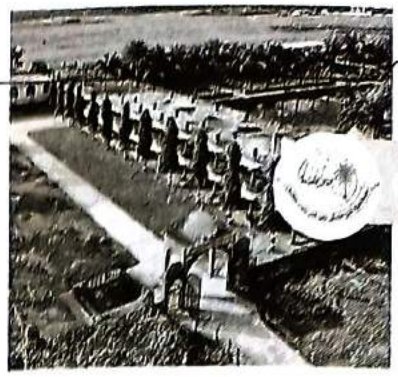

৬২ তম বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ—

পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, হযরাত উলামায়ে কেরাম, এলাকার দ্বীনদরদী সম্মানিত মুরব্বিয়ান ও সর্বস্তরের তাওহীদী জনতা-

মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে অদ্য ০৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ঈসায়ী মুতাবিক ২৪ মাঘ ১৪২৯ বাংলা, রোজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আপনাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারক প্রিয় প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুরের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। কর্মব্যস্ত জীবন পরিক্রমার ফাঁকে জামিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা দ্বীনের অকৃত্রিম মহব্বত এবং জামিয়ার প্রতি নিখাঁদ ভালবাসার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আমাদের আগামীর পথচলায় তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

প্রতিবেদনের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা শায়খ শিহাব উদ্দীন রাহ. সহ প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকবৃন্দ ও স্থানীয় মুরব্বিয়ানের কথা— যাদের মেহনত-মুজাহাদা আর ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বীনের এই বাগান।

আরও স্মরণ করছি তাঁদের কথা, যাঁরা এই বাগানে পানি সিঞ্চন করে গেছেন দরদ, আবেগ আর ভালবাসা নিয়ে পরকালের সুখের আশায়। আল্লাহ সবাইকে কবর জীবনে সুখে শান্তিতে রাখুক, জান্নাতী বিছানায় তাঁদেরকে শায়িত করুক।

মুহতারাম হাযিরীন,

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে অন্যায় অশান্তির পথ হতে শান্তি-সমৃদ্ধি ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। অবতীর্ণ করেছেন অনেক কিতাবও। আম্বিয়ায়ে কেরাম শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে অবিরাম চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন অনেকে তো জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে। তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি।

এই সিলসিলায়ে নবুয়াতের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি আমাদের আত্মার আত্মীয় হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পবিত্র মক্কা নগরীর গারে হেরায় তাঁর হাতে সূচিত ইসলামি শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে মদীনা মুনাওয়ারায়।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-ই-তাবিঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সিঁড়ি বেয়ে বিভিন্ন দেশ ঘুরে এই শিক্ষার আলোর ঝলক এসে পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভি রাহ. এর শিক্ষাদর্শন বুকে লালন করে ইসলামী শিক্ষার দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলে দারুল উলূম দেওবন্দ। দারুল উলূম দেওবন্দকে অনুসরণ করেই অধুনা বিশ্বের দেশে দেশে ইলমে ওহি চর্চিত হয়ে চলেছে। আপনাদের প্রিয় জামিয়া মাদানিয়াও সেই নন্দিত ধারার এক বরিত প্রতিষ্ঠান।

১৯৬১ সালের ৭ই আগস্ট ইসলামি শিক্ষা ও তাহজীব তামাদ্দুন প্রচারের দৃঢ় প্রত্যয় ও দীপ্ত শপথ নিয়ে এলাকাবাসীর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই জামিয়া। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জামিয়া মাদানিয়া বিশ্ব বিশ্রুত দারুল উলূম দেওবন্দের ন্যায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের অপরাজেয় পতাকা সযত্নে নিরলসভাবে বহন করে চলেছে।

সুপ্রিয় উপস্থিতি,

জামিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা হতে ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এদারা নূরানী শাখা, হিফযুল কুরআন শাখাসহ ইবতিদায়ী, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ফযীলত, দাওরায়ে হাদীস ও তাখাসসুস ফিল ইফতা (উচ্চতর ইসলামি আইন অনুষদ) শাখার কার্যক্রম যথারীতি চালু রয়েছে। ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাদান চলছে যথানিয়মে। পড়াশুনায় দুর্বল ছাত্রদের পিছনে বিশেষ তত্ত্বাবধান এবং অমনোযোগী ছাত্রদের মনোযোগী করার তৎপরতা বিদ্যমান আছে। নূরানী ছাত্রদের জন্য ডায়েরী, হিফয বিভাগের ছাত্রদের তথ্য বহি ব্যবহারের সুব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য রয়েছে 'আল-হিলাল ছাত্র সংসদ'।

যার মাধ্যমে ছাত্ররা উস্তাদবৃন্দের তত্ত্বাবধানে আরবি-বাংলা বক্তৃতা ও প্রবন্ধরচনা, কেরাত, হামদ-নাত ইত্যাদির প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভে ধন্য হচ্ছে। তাছাড়া জামিয়ার রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক ফতোয়া বিভাগ। তালাক, ফারাইযসহ জীবন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ বাতলিয়ে দেন জামিয়ার বিদগ্ধ মুফতী সাহেবগণ। ছাত্র সংসদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পৃথক বিশাল পাঠাগার, যেখানে দেশী-বিদেশী পুস্তকের বিপুল সমাহার রয়েছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

জামেয়ার বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১২শ। তন্মধ্যে ৮ শতাধিক ছাত্র বোর্ডিংয়ে অবস্থান করছে। সুদক্ষ ৩২জন শিক্ষক, ২জন শিক্ষাসহকারী এবং ৮জন কর্মচারী এখানে কর্মরত আছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে জামিয়া ৩টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে- ১. আল হাইআতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া, ২.আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, ৩. তানযীমুল মাদারিস সিলেট বিভাগ। উল্লেখ্য, নূরানী শিশুশিক্ষা ব্যবস্থাও আযাদ দ্বীনি এদারার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। বিগত শিক্ষাবর্ষ ১৪৪৩ হিজরীতে উক্ত ৩টি বোর্ডের অধীনে ৫২১ জন তালাবা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪৮৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪৮জন মুমতায (A+), ১৮৬ জন প্রথম বিভাগ, ৮২জন ২য় বিভাগ এবং ৭০ জন তৃতীয় বিভাগ লাভ করেছে। পাশের হার শতকরা ৯৩.২৮%। উল্লেখ্য, আল হাইআতুল উলয়া বোর্ডে জামেয়ার ৩ জন ছাত্র সারা দেশের সেরা ৪০ জনের মধ্যে ৫ম, ১৬তম ও ১৮তম স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশের অধীনে ফযিলত বিভাগে বোর্ডে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান, সানাবী উলয়া ও আম্মাহ উভয় বিভাগে ৪র্থ স্থান, মুতাওয়াসসিতাহ বিভাগে ২য় ও ৩য় স্থান, তাহফিযুল কুরআন বিভাগে ২জন ৫ম স্থান, এবং তানযীমুল মাদারিসের অধীনে সানাবিয়া বিভাগে বোর্ডে ১ম ও ৩য় স্থান, মুতাওয়াসসিতাহ বিভাগে ৪র্থ স্থান লাভ করে জামিয়ার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

সম্মানিত উপস্থিতি,

জামিয়া মাদানিয়ার যাবতীয় আয় রশিদ মাধ্যমে এবং যাবতীয় ব্যয় ব্যয়-ভাউচার মাধ্যমে যথারীতি সংরক্ষণ করা হয়। যা বছরান্তে আযাদ দ্বীনী এদারা কর্তৃক মনোনীত অডিটর এবং মজলিসে শুরা কর্তৃক নির্ধারিত দক্ষ অডিটরবৃন্দের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করানো হয়। নিম্নে বিগত ১৪৪৩ হিজরীর আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব সংক্ষপে উল্লেখ করছি

ক্র.	ফান্ড	মোট আয়	মোট ব্যয়
১	সাধারণ ফান্ড	৮৭,৮৭,২২৯.৯০/-	৮৫,১৩,৭০৪.৯৪/-
২	গোরাবা ফান্ড	১,৩৬,৩৩,০২৫/-	১,১২,১০,০৮৬/-
৩	বিল্ডিং ফান্ড	১৪,৫৫,৪৩৩/-	১৮,০৪,৪৪৩/-
৪	কুতুবখানা ফান্ড	১১,২১,১১০/-	৩,৫৭,১৩৬/-
৫	মসজিদ ফান্ড	১০,৮৪০/-	৯,০৯,৮৪৬/-
	মোট	২,৫০,০৭,৬৩৭.৯০/-	২,২৭,৯৫,২১৫.৯৪/-

সর্বমোট আয় ২,৫০,০৭,৬৩৭.৯০ থেকে
সর্বমোট ব্যয় ২,২৭,৯৫,২১৫.৯৪ টাকা বাদ দিয়ে জামিয়ার বর্তমান তহবিল ২২,১২,৪২১.৯৬ টাকা মাত্র জমা আছে।

আগামী সনের বাজেট

ক্র.	ফান্ড	মোট আয়
১	সাধারণ ফান্ড	১ কোটি টাকা
২	ইমদাদ ফান্ড (গোরাবা)	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
৩	বিল্ডিং ফান্ড	৯০ লক্ষ টাকা
৪	কুতুবখানা ফান্ড	৫ লক্ষ টাকা
৫	মসজিদ ফান্ড	১৫ লক্ষ টাকা
	মোট	৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মাত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার দরবারে জামিয়ার উল্লিখিত বাজেট পূরণের জন্য সিজদাবনত মস্তকে আবেদন জানাচ্ছি। সাথে সাথে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারনা পোষণকারী সচেতন মুসলিম জনতার কাছে বিনীত আরজ— আপনারা অতীতের ন্যায় মৌসুমী ধান, সুপারি, নারকেল, বাঁশ ইত্যাদি দান করাসহ এককালীন, মাসিক ও বার্ষিক দান অনুদানের মাধ্যমে জামিয়ার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন এবং প্রবাসী আত্মীয় স্বজনকে মাদ্রাসায় দান খায়রাত পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করুন। "আসহাবে বায়আতে রিজওয়ান ফান্ডের (আজীবন দাতা) সদস্য হোন এবং বন্ধুবান্ধবকে অনুপ্রাণিত করুন। স্মরণ রাখা উচিৎ, আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের সাহায্য করলে তিনি বান্দাকে সাহায্য করেন এবং দৃঢ়পদ রাখেন।

পরিশেষে আজকের ওয়াজ মাহফিলে অংশ নেওয়া সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের শুকরিয়া আদায় করছি। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যাঁরাই জামিয়ার প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উঁচু মর্যাদা আর যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের সবার ইহ-পরলৌকিক শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছি। আল্লাহ সবাইকে সুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘ-নেক হায়াত দান করুন আমীন।

ইতি
সালামান্তে
(মাওলানা শায়খ) জিয়া উদ্দিন
মুহতামিম, জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
তারিখ : ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ঈসায়ী

Annual Report 2020/2021 AD

Jamia Madania Angura Muhammad Pur

beanibazar, Sylhet, Bangladesh

A Brief description of jami a

Name:

Jamia Madania Angura MuhammadPur

Established- 1961

Education Departments:

1. Al-Jamia Children Academy
2. Tahfizul Quran
(Al-Quran Memorising Section)
3. Ibtedaiyah (primary)
4. Mutawassitah (Secondary)
5. Sanaviah (Higher Secondary)
6. Fazilat (Graduation)
7. Takmil Fil Hadith
8. Takhassus Fil ifta.

Number of students, teachers, assistance

currently we have a about 12 hundred students and more 800 hundred students are studying in our hostel with free of cost. Alhamdulillah, we have 32 teachers teaching Al Quran, Al Hadith, Al fiqh etc. the number of assistants is 10.

Different Funds

1. General
2. Imdad (poor fund)
3. Building
4. Kutub khana (library)
5. Masjid

Annual Cost: More than 2 crore Taka

A Brief Account of the Year 1442Hij / 2020/21AD

S.L.	Name Of Funds	Credit	Debit
1	General	87,229,.90/-	85,13,704.94/-
2	Poor	1,36,33,025/-	1,12,10,086/-
3	Building	14,55,433/-	18,04,443/-
4	Library	11,21,110/-	3,57136/-
5	Masjid	10,840/-	9,09,846/-
	Total Amount	2,50,07,637.90/-	2,27,,95,215.94/-

Sub total Credit of Five Funds	2,50,07,637.90/-
Sub total Credit of Five Funds	2,27,,95,215.94/-
Sub total Cash	22,12,421.96/-

it seems a large amount of cash but this calculation about five months ago. jamia is suffering from financial problem right now.

Budget Of The Year 1443Hij / 2021/22AD

S.L.	Name Of Funds	Amount
1	General	1 Crore
2	Poor	1 Crore 50 Lac
3	Building	90 Lac
4	Library	5 Lac
5	Masjid	15 Lac

Total Tk 3 Crore 60 Lac Only

if you help someone for the sake of Allah Allah will help you if you keep sadaqat Jo Charity it will remove discharge. (Al Hadith)

Principal
(Maulana Shaikh) Zia Uddin
Mobile: +8801819 653719

Bank Details

Rupali Bank
Kurarbazar Branch
Beanibazar, Sylhet
A/C. No. 1982 020000080

Poor fund
Trust Bank Ltd.
Beanibazar Branch, Sylhet
A/C. No. 70170322001317

الجامعة المدنية أنغورا محمدفور

بيانى بازار، سلهت، بنغلاديش

التعريف الوجيز

اسم الجامعة: الجامعة المدنية أنغورا محمدفور، بيانى بازار، سلهت، بنغلاديش.

التاسيس: تأسست الجامعة فى ١٧ صفر المظفر عام ١٣٨١ هـ الموافق ١٥ ابريل ١٩٦١ م يوم الثلاثاء على الضفة الجنوبية لنهر كوشيارا بقرية أنغورا محمدفور. وهى تقع فى شبه المحافظة "بيانى بازار" من محافظة سلهت. قام بتأسيسها نخبة مخلصة من العلماء الغيارى على الدين والعلوم الإسلامية. على رأسهم: المؤسس الأعلى فضيلة الشيخ شهاب الدين رحمه الله تعالى غوبندسرى وسماحة الأستاذ مصدر على رحمه الله تعالى آقاخزانه وسماحة الأستاذ خليل الرحمن رحمه الله تعالى فاتن وسماحة الأستاذ مقدس علىرحمه الله تعالى آقاخزانه وسماحة الأستاذ عبد الحى رحمه الله تعالى مطهوره وسماحة الأستاذ عبد الوهاب حفظه الله تعالى ديولغرام وسماحة القارى ظهورالحق رحمه الله تعالى أنغارزور وسماحة الأستاذ مسلم الدينرحمه الله تعالى رانافنغ وسماحة الأستاذ بشير الدين رحمه الله تعالى أنغورا محمد فور وسماحة الأستاذ نمار رحمه الله تعالى صالح شهر وسماحة المستر ارجمند على رحمه الله تعالى أنغورا محمد فور.

المديرالحالى: سماحة الشيخ ضياء الدين حفظه الله تعالى.

عدد المدرسين: ٣٢ مدرسا.

عدد الطلاب: ١٠٠٠ طالب.

عدد الموظفين: ٨ موظفين.

عدد الطلاب المقيمين فى مجمع الطلاب :٧٠٠ طالب.

عدد المتخرجين : ١٥٠٠ متخرج و٥٠٠ حافظ.

االهيئة الإدارية : المجلس الاستشارى ، المجلس التنفيذى ، المجلس العام

-

مقدار الأراضى : حوالى 4 أكر.

منهج التعليم : منهج الدرس النظامى (مع إدخال التطويرات اللائقة والضرورية من العلوم العصرية)

مجلس التعليم : ألهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش وإداراة التعليم الدينية الأهلية بنغلاديش وتنظيم المدارس بمنطقة سلهت.

القرى التى تأسست منها الجامعة :

أنغورا محمد فور، غوبندسرى ، آقاخزانه ، أنغورا ، لوزارى ،صالح شهر ، أتر آقاخزانه وفول ملك - غاغوا.

قسم شؤون التعليم :

إن قسم التعليم للجامعة المدنية أنغورا محمد فورهو القسم الأصيل. ومنه ينظم جميع الأمور التعليمية؛ مثل قبول الطلبة، وإعداد المنهج التعليمي، وتسجيل حضور الطلبة، وتنظيم الامتحانات، ونشر النتائج، وتنمية الملكة العلمية للطلبة، والحِفاظ على جميع وثائق الطلبة، وتنفيذ قرارات المجلس العلمي للجامعة. هذا ينقسم على ثلاثة أقسام : ١. قسم الكتاب (الدرس النظامى) ٢. قسم تحفيظ القرآن الكريم و٣. قسم روضة الأطفال.

قسم الكتاب :

المنهج التعليمي لقسم الكتاب هومنهج الدرس النظامى السائد في بنغلاديش مع إدخال التحسينات اللائقة من العلوم العصرية . له خمس مراحل: (اثنتاعشرة سنة)

١. المرحلة الابتدائية ٢. المرحلة المتوسطة ٣. المرحلة الثانوية ٤. مرحلة الفضيلة 5. مرحلة التكميل فى الحديث.

قسم تحفيظ القرآن:

تهتم الجامعة أكبراهتمام بتحفيظ القرآن الكريم كاملا على أسلوب عربى عملا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : إقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواتها. في هذا القسم المستوى العالى لتحفيظ القرآن الكريم. يُعلِّم فيه الأساتذة المهرة المدرَّبون ويحفظ الطلاب القرآن الكريم على أيسر طريق وأقل مدة.

قسم روضة الأطفال: (إي. سي. إي أكاديمي) هذا القسم لتعليم الصغار من البنين والبنات. يدرس فيه ما يتعلق بمبادئ الإسلام، ثم اللغة الوطنية (البنغالية)، والرياضيات، واللغة الإنكليزية، وكتب المرحلة الأولى من المناهج التعليمية الحكومية.

أهم الأقسام الإدارية:(١) قسم الإدارة (٢) قسم شؤون التعليم (٣) قسم سكن الطلاب (٤) قسم المكتبة (٥) قسم البناء.

أقسام علمية ودعوية:(١) دار الإفتاء (٢) قسم النشر (٣) قسم المحاضرات العلمية (٤) قسم التدريب على اللغة العربية وآدابها (٥) قسم

عن طريق الخطابة والكتابة وإثارة الأعمال والأخلاق والعواطف فى المسلمين مثل الذى كان عليه السلف الصالح.

* نشر العقيدة الصحيحة المتوارثة عن النبى -صلى اللهعليه وسلم - عن طريق الرعيل الإسلامى الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من بعد.

* مكافحة الشرك والبدع والخرافات ومقاومة أى حركة فكرية باطلة يظهر ضد الإسلام ومقابلة تحديات العصربكل بسالة ووعى.

* التوكل على الله والبساطة فى العيش والجهاد للحق والتقيد بآداب الشرع الإسلامى والتقاليد الإسلامية والتزين بزى العلماء والانسام بسمة الصلحاء.

الجامعة المدنية أنغورا محمدفور:

هى حركة تعليمية وتربوية إصلاحية وفكرة معتدلة متناسقة، لا كمدرسة من المدارس الأهلية التقليدية الأخرى. إنها طبقت منهجا تعليميا يجمع بين القديم الصالح والجديد النافع من العلوم والمعارف مع إدخال تحسينات وتطويرات لائقة فى مناهجها التعليمى لكى يتخرج منها جيل مثقف سليم العقيدة راسخ العلم غيورعلى دينه متحمس لحماية الإسلام وعصبة مؤهلون من رجال الفكر والدعوة، خبراء بمتطلبات العصر بالأساليب العصرية فى التعليم والتربية والدعوة، متدربون على الحذاقة والمران فى أي عمل دعوى كان. وحتى يكون خريجو الجامعة متضلعين من مناهل العلوم الدينية والمعارف العصرية مع الوعى الصحيح لقضايا الإسلام والمسلمين وقادرين على آداء الرسالة الإسلامية الخالدة وتحقيق متطلبات المجتمع ومقاومة أى حركة فكرية باطلة يظهر ضد الإسلام وتحديات العصر بكل بسالة ووعى. ويدافعون عن الإسلام وأهله بكل جد وإخلاص وينقون المجتمعات البشرية من أدناس الجهل والخرفات وينشرون الدين القيم فى مشارق الأرض ومغاربها.

منهج الجامعة المدنية:

هوالشعوروالعاطفة والفكرالبناء اللتى لايستغنى عنها الطالب المعاصر إذا أراد أن يلعب دوره المطلوب فى المجتمع كداعية ناجح فى خصائصه وصفاته. وبيئة الجامعة ايضا كبيئة تتسع فيها آفاق فكر الطالب، تولد فى نفسه رؤية بعيدة المدى وتوحى إليه رسالة واضحة يستهين بحياته دون تطبيقها وتورث الطالب حياة جامعية عامرة فى بيئة علمية وروحية يستنير فى طرقاتها معالم الاستعداد والتقدم الى الأمام و الى الأمام للاستزادة من العلوم والمعارف وللتزود بأروع الأخلاق حتى تشجعه على مواصلة الدراسة والمغامرة فى درب العلم كى يصل الى الغاية المنشودة وعلى التقدم الى الأمام فى مواجهة الباطل وأنواع الضلال والخرافات ومكافحة جاهلية العصر الجديد وما الى ذلك مما يخالف عقيدتنا وشريعتنا الغراء . هذه ميزات تنفرد بها الجامعة المدنية عن جميع المدارس والجامعات الأهلية الأخرى. عاشت الجامعة المدنية أنغورا محمدفور منارة شامخة يستضئ بها العالم.

التدريب على اللغة البنغالية وآدابها (6) قسم التدريب على الخطابة (7) قسم الحاسوب (الكمبيوتر).

الجمعيات المساعدة:

(1) مجلس"الشهاب" (2) هيئة الطلبة "الهلال" (3) هيئة الأدب "ستونا" (4) مجلس"الشهاب" يو، كى (5) مؤسسة "اقرأ" يو، كى (6) مؤسسة "اقرأ" يو، اس، اى.

مصدر الدخل:

تبرعات الشعب المسلم هى موردها المالى الوحيد. ليست لها موارد ثابتة ولا إقطاعات وضيعات ولا تقبل أى معونة من الحكومة وانما تغطى ميزانيتها ومصاريفها تبرعات الشعب المسلم وإعانة المخلصين الغيارى على الدين القيم والعقيدة الصحيحة والعلوم الإسلامية من الأثرياء وذوى الخير من داخل بنغلاديش وخارجها.

صناديق الجامعة:

للجامعة خمسة صناديق:

(1) الصندوق العام.(2) صندوق الفقراء والأيتام.(3) صندوق البناء.(4) صندوق المسجد.(5) صندوق المكتبة العامة.مجموع تكاليف هذه الصناديق الخمسة السنوية حوالى عشرين مليون تاكا.

العقيدة والمنهج:

تتبع الجامعة من اول يومها عقيدة أهل السنة والجماعة وتسلك منهج السلف الصالح فى جميع شؤونها وتعنى عناية فائقة باحترام الأئمة المجتهدين وارباب العلم والفكر والتأدب معهم والاعتراف بعظمتهم ، وتختار سبيل الاعتدال والتوازن فى اتباع المذاهب واحترام جميع المذاهب الفقهية المعروفة لدى أهل السنة والجماعة ومدارس الفكر الإسلامية المختلفة ولا تثير الخلافات الفرعية الاجتهادية الا اذا مست الحاجة إلى ذلك بشكل ملح لإيضاح حقيقة من الحقائق. والجامعة المدنية تتبع المذهب الحنفى فى المسائل الفقهية الاجتهادية وتعتقد أن اتباع إمام معين للمذهب واجب على عامة المسلمين وتكره إتهاجات مخالفى المذاهب.

أهداف الجامعة:

* تعليم الكتاب والسنة على المستوى العالى وإعداد الطلاب متأهلين متمهرين فى العلوم الإسلامية والمعارف العصرية على متطلبات العصر.

* تخريج علماء متضلعين من مناهل العلوم والمعارف قادرين على اداء الرسالة الإسلامية الخالدة على نهج يتطلبه العصرومقتضياته متدربين على الحذاقة والمران فى أى عمل دعوى كان.

* تربية الطلبة على الأعمال والأخلاق الإسلامية وإثارة روح الدين فى حياتهم.

* نشر التوعية الدينية والصحوة الإسلامية بين المسلمين وتوجيه النفوس البشرية إلى السعادة الأبدية.

* القيام بخدمة الدين عن طريق الدعوة والتبليغ وصيانة الدين والدفاع عنه

Jamia Madania
Angura Muhammadpur

Name: Jamia Madania Angura Muhammadpur, Beanibazar, Sylhet.

Naming: Moulana Shaikh Tajammul Ali (rah.) a khalifa of Shaikul Islam Hussain Ahmad Madani rah. once a time when was sleeping, then he got instructed that madrasa's name would be Jamia Madania.

Location: Jamia is located at Angura Muhammadpur under Beanibazar Upozila in Sylhet the spiritual capital of Bangladesh and It is situated in the south bank of kushiara river.

Date of Establishment: Tuesday 17th Safar 1381 hijri, 15th April 1961 AD

Founder: A renowned educationist of the village Gobindasree of Beanibazar Upozila named shaikh moulana Shihabuddin (rah.) was the founder of this traditional Jamia with some other prominent ulama like moulana Musaddar Ali (rah.) Akhakajana, moulana Khalilur Rahman (rah.) Paton, moulana Muqaddas Ali (rah.) Akhakajana, moulana Abdul Hay (rah.) Mathiura, moulana Abdul Wahhab (D.B.) Deulgram, Qari Johurul Haq (rah.) Angarjur, moulana Muslim Uddin (rah.) Ranaping, moulana Boshir Uddin (rah.) Angura Muhammad-pur, moulana Nimar Ali (rah.) Shalesshor, mastar Arjumond Ali (rah.) Angura Muhammadpur.

Principal: Moulana Shaikh Zia Uddin (Hafijahullah).

Number of Teachers : 32.
Number of Students :1200.
Stuff : 10.
Number of residential students : 800.
Number of graduates students : 1580.
Number of Huffaz : 416.

Governing Council: Board of advisors, Board of executive, Board of general.

The amount of land :almost 4 acres.

Syllabus: Darse Nejami (modern refinement and supplemented).

Educational Board: Al-Haiatul Ulya Lil-jamiatil Qawmia Bangladesh, Azad Deeni Edarayc Taleem Bangladesh and Tanjimul Madaris Sylhet Divition.

Teaching Introduction: Jamia's Educational tour started at Safar in 1381 hijri. From the beginning it started from class One to Fazilath. In Shawal of 1405 hijriTakmilfil Hadith the highest class of Islamic education was started. With the grace of Allah hadith teaching is still continuing.

Infrastructure: Jamia's now two buildings are located in two localities. The academic building is on the southern bank of the river Kushiara, and all the educational activities are going on from this building. The dormitory of Jamia is half mile away of the academic building, residential pupils live here.

Consist of: Angura Muhammadpur, Gobindasree, Akakhajana, Angura, Lauzari, Salesshor, UttorAkakhajana, Fulmolik-Gagua.

Academic Information: Jamia's education is in three departments; Kitab department, Hifj department, and ACE Academy (the kids' department).

Kitab's department: It has got five departments; Ibtedayyah (primary), Mutawassita (secondary), Sanabia (higher secondary), Fazilath (Honors), Takmil (Masters). Takhassus fil ifta (Higher study in Islamic law).

Kitab's department has 12 classes. The subjects of these classes are: Tafsir, Ulumul Quran, Hadith, Usulul Hadith, Fiqh, Usululfiqh, Akayid, Sirat, Farayiz, History, Islamic Economics, Arabic literature, Rhetoric(Blagath), Sarf–Nahu (Arabic grammer), Logic, Bengali, English, Geography etc.

Department of hifz: Students practice hifzul Quran within a short time under supervision of hifz's teachers trained in Huffazul Quran Bangladesh.

A.C.E. Academy: It is three-year courses for kids. Besides basic teachings of Islam other essential subjects are: Bengali, Mathematics, English and General education.

Institutional Frameworks: Institutional administration has been mainly divided into five sections.

1. Administration
2. Educational sector
3. Dormitory
4. Library.
5. Building sector.

Fellow departments: There are more seven associates divisions.

1. Fatawa
2. Publications
3. Computer Training
4. Arabic Language and literature training
5. Bengali Language and literature training
6. Information and Research
7. Speech training.

Associate Tanzeem: There are more five associates divisions to run jamia's activities properly.

1. "As-Shihab" Council.
2. "Al-Hilal" Student Association.
3. "As-Shihab" Council UK
4. "Iqra" Foundation UK
5. "Iqra" Foundation USA.

Source of income: Seasonal donation, Liberally donation of pious Muslim, Zakat, Sadaqah, Fitrah, Regular one-time contribution of donor members, Various fees of students, Income from produced crops etc.

Expenditures Jamia's expenditures are five:

1. General Fund
2. Poor and Orphanage Fund
3. Building Fund
4. Mosque Fund
5. Library Fund.

The annual cost of five funds is more than two crores.

Belief: Followers of Ahlussunnah wal Jamaat.

Maslak: Jamia believes in the thought and ideology of Darul Uloom Deoband. Jamia cherishes the revolutionary consciousness of Shah Waliullah and social reforming motivation of Mujaddide Alaphe Sani. Jamia's role is always against all types of bidat (innovation) and superstition. Jamia is determined to root all kinds of polytheism and innovation, like Peer's worship, grave's worship etc.

Masrab: Jamia believes in practicing Tasawuf as a part of self purifying. It practisesself purifying in four schools of Tasawuf; Chishtia, Saberiya, Soharawardiya and Nakshbandiya.

Majhab: Jamia believes in following one Imam obligatory for the general Muslims. In this aspect jamia is follower of Hanafi Fiqh. However, it has due respect to other priests and dislike the role of people against mazhab.

Aims and objectives:

*To achieve Allah tala's satisfaction.
*To teach the Quran and Hadith on the ligjt of research work of Sahaba-e keram, aimmaye mujtahidin, akabire deen and salaf salihin.
*To train students on speaking and writing beside their regular learing.
* Coordination of knowledge with practice.
*To protect all kinds of evil power.
*To sprayed authentic knowledge and to remove polytheism, infidelity and to save the Society from all kind of misguidance and to build up a pure Islamic society.

Features:

*Classes: from kids classes totakmil class And Hifzul Quran.
*The Hifzul Quran Section: under ExperHafizul Quran within short time .
*Expert teachers for kinder garden section.
*Teaching by the dedicated, relentless and skilled teachers.
*Tablighi efforts beside accademic reeducation to make good manner and character.
*A friendly fair environment for students.
*Separate dormitory.
*The dormitory is all time supervised by the teachers .
*Unrestrained opportunity to practice bangle and Arabic language and literature.
*Computer training By the expert teachers.
*Regular publishing an Arabic and Bengali wall magazine.
*To Publish various bulletin on various occasion, periodical magazine With regular annual magazine "Al-Hilal".

Appendix: Jamia Madania Angura Muhammad-pur a traditional religiouns institution. For nearly six decades, Jamia is playing role to protect the interest of the Muslim Ummah. It is essential for everyone to support this institute with their dua (Prayer), advice and cooperation. May Allah accept all of us for deenikhedmat.

(Moulana Shaikh) Zia Uddin (Hafijahullah)
Principal

আল-হিলাল ছাত্র সংসদ

-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর। একটি শিক্ষাগার। একটি বিপ্লব। চেতনার এক অনুপম বাতিঘর। সেই ১৩৮১ হিজরি থেকে আজোবধি। সুদীর্ঘ ৬২টি বছর। কুশিয়ারার তীরে অবস্থানরত ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষানিবাস ইলমে ওহীর মধু বিলিয়ে আসছে চারিদিকে। তার ছড়িয়ে পড়া খোশবুতে মাতোয়ারা আজ দিগ থেকে দিগন্ত।

বয়স হিসেবে বলতে গেলে হাতেগোনা মাত্র ক'দিন। এরই মধ্যে আসন পেতে নিয়েছে খ্যাতির শীর্ষে। শেখর থেকে শিকড়ে। এ সফলতার প্রকাশ্য নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে জামিয়ার যুগান্তকরি নানানমুখী প্রয়াস। এগুলোর একটি কালজয়ী ছাত্রসংগঠন 'আল হিলাল ছাত্রসংসদ'।

যার দায়িত্ব চালিয়ে গেছেন অনেক রথি-মহারথি। স্বীয় আঙিনায় যারা আজ স্বমহিমায় আলো বিলাচ্ছেন। শত শুকরিয়া তাদের তরে।

কালের আবর্তন আর যুগের বিবর্তনে মহান এ দায়িত্বভার অযাচিত এসে অর্পিত হয় আমার মত আরও না লায়েক মূর্খ কয়েক জনের স্কন্ধে।

চেষ্টার সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শিকতা আর নানান ঝামেলা, ব্যস্ততায় পারিনি এই আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে। যতটুকু হয়েছে দয়াময়ের দয়া আর করুণার ফলে, আর যেটুকু ভুল-ভ্রান্তি সব আমি অযোগ্যের খামখেয়ালির কারণে। তাই প্রথমে আল-হিলালের শুভাকাঙ্ক্ষি শুভানুধ্যায়িসহ সকলের কাছে অপারগতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে রাব্বে কারীমের দরবারে গোজারিশ, যেন আখেরাতের জবাবদিহিতা থেকে নাজাত দান করেন।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ছাত্রসংসদের ১৪৪২-৪৩ হিজরি, মোতাবেক ২০২১-২২ ঈসায়ির অডিট রিপোর্ট তুলে ধরা হবে। এর আগে সংক্ষেপে জেনে নিই কালজয়ী এই ছাত্রসংগঠন সম্পর্কে।

আল-হিলাল ছাত্রসংসদ। চারিদিকে সত্যের বিস্তার ঘটাতে, শান্তির সুবাতাস বহাতে, মায়া, মুহাব্বাত, প্রেম, প্রীতি আর সৌহার্দপূর্ণ আচরণে সিক্ত সমৃদ্ধ এক সুশীল সমাজ গড়তে প্রয়োজন দক্ষ, কর্মঠ একদল নীরলস কর্মীবাহিনীর।

এমন প্রতিভাবান কর্মীবাহিনীকে গঠনের মানসেই জামিয়া প্রতিষ্ঠার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই আল-হিলালের যাত্রা শুরু। সুদীর্ঘ এ পথচলায় আজও আসেনি কোনো ক্লান্তি কোনো অবসাদ। ঘটেনি কোনো বিচ্যুতি কোনো পশ্চাত। বিপরীত প্রতিনিয়ত হচ্ছে উন্নতি এবং উন্নতি। সত্য আর ন্যায়ের বিজয়কল্পে দ্বীনের প্রতিটি সেক্টরে যোগ্য ব্যক্তিত্ব নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যেই ছাত্রসংসদের রয়েছে বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতা। ব্যতিক্রমধর্মী নানানমুখী কর্মপরিধির সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে-

১. প্রশিক্ষণ সভা :

ইলম আছে। বাকশক্তি নেই। তাহলে সে ইলম থেকে জাতি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন একটা নেই। স্বীয় যোগ্যতায় ইসলামের সত্যতাকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে হলে প্রয়োজন বাগ্মিতা। প্রাঞ্জল ভাষার ওপর দক্ষতা। সহজ, সাবলীল সুন্দর উপস্থাপনায় কোনো কথা সহজে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে কখনও বিষয়টিকে বক্তব্যের ভঙ্গিমায় তুলে ধরতে হবে। এজন্যই তো প্রতি বৃহস্পতিবার ৬ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আল-হিলালের মঞ্চায়নে অনুষ্ঠিত হয় আরবি, বাংলা বক্তব্যের প্রশিক্ষণমূলক সভা।

কখনও আবার বিষয়টিকে তুলে ধরতে হয় তর্ক-বিতর্কের আলোকে। তাই তো এই বৎসর প্রথম আল-হিলালের সাপ্তাহিক সভায় যোগ করা হলো আরেকটি আইটেম। বোদ্ধামহলে পরিচিত সেই অনুষ্ঠান 'টকশো'। আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের রহস্য ভেদ করা হয়ে থেকে এই আয়োজনের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণমূলক এই সভায় সকল ছাত্রের জন্য রয়েছে শত পার্সেন্ট উপস্থিতি, দেখা এবং শেখার সুযোগ। এছাড়াও রয়েছে জাতীয় ও আন্তার্জাতিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সভা, সেমিনার আর প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন।

২. পাঠাগার :

বই। একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতার সঙ্গী। মানব জীবনের আত্মার খোরাক। বই পাঠে জ্ঞান বাড়ে। মনীষীদের কথা–এক পৃষ্ঠা লিখতে প্রয়োজন হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নের চাহিদা আর প্রয়োজন মেটাতে ছাত্রসংসদের রয়েছে সমৃদ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠাগার। আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সমাহার এ পাঠাগারে রয়েছে দুই হাজারেরও উর্ধ্বে কিতাবাদি। নিত্যদিন বিলি হতে থাকে বই। সমৃদ্ধশীল এই পাঠাগারের বদৌলতে ছাত্ররা অনায়াসেই সাঁতার কাটছে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবহমান সমুদ্রে। মুক্তা আহরণ করছে অতল গভীরে থাকা সিন্ধু সেঁচে।

৩. প্রকাশনা বিভাগ :

কথায় আছে- প্রচারেই প্রসার। যত বেশি সুন্দর করে প্রচার করা হবে তত বেশি মান বাড়তে থাকবে। সরব প্রচারণার কারণে অনেক সময় তুচ্ছ একটা বিষয়ও হয়ে ওঠে গুরুত্ববহ। এই প্রচার বিভাগের মাধ্যমেই হলদে মিডিয়াগুলো ক্রমশ সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের বিষক্রিয়া। তিলকে তাল আর কালোকে সাদার পোশাকে আবৃত করে সমাজের সরলমনা লোকদের প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করছে।

ওদের টুঁটি চেপে ধরার লক্ষ্যেই ছাত্রসংসদের রয়েছে সমৃদ্ধ একটি প্রকাশনা বিভাগ। এখান থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক আরবি, বাংলা দু'টি দেয়ালপত্রিকা। 'আল ফুরকান' ও 'আল ফারুক'র অবদান আজ বিশ্বের কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে স্মারক, ম্যাগাজিন আর বুলেটিন তো আছেই। এই বিভাগটিকে আরও এক্টিভ আরও শক্তিশালী করতে যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বার্ষিক 'আল হিলাল'। যার সুনাম ছড়িয়ে আছে আজ তেপান্তরে।

রিপোর্ট :

কোনোকিছুকে সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সোর্সের। ব্যয়বহুল এ সংসদেরও রয়েছে অর্থনৈতিক কিছু সোর্স। যার প্রধান হচ্ছে ছাত্রদের মাসিক ফি এবং বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে উত্তোলনকৃত চাঁদা। সাথে সাথে গুণীজনদের সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ।

এক নজরে ১৪৪২-৪৩ হিজরি মোতাবেক ২০২১-২২ ঈসায়ির আয় ব্যয়ের হিসাব :

চলিত সনের মোট আয়–	২,৭৫,২০৯/
চলিত সনের মোট ব্যয়–	২,২৭,১৬৫/-
বর্তমান তহবিল–	৪৮,০৪৪/-
বিগত সনের তহবিল–	২,৪১,৬৭৬/-
উভয় সনের বর্তমান তহবিল–	২,৮৯,৭২০/-

শেষকথা :

এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পথে যারা সক্রিয় থেকে কাজ করেছেন কমিটির সেই সহযোদ্ধাদের তরে অফুরান ভালোবাসা। এর সাথে ক্লাস প্রতিনিধিসহ সকল ছাত্রভাইদের জন্য মোবারকবাদ।

দ্বীনদরদী দানবীর ভাই-বোনদের প্রতি বিনীত আহ্বান– ছাত্রসংসদের কার্যক্রমকে আরও বেগবান আরও গতিশীল করতে সম্প্রসারণ করুন আপনাদের স্নেহশীল ও দারাজ হাত।

বিনীত

জয়নুল ইসলাম জুমন

বিদায়ী সম্পাদক

আল-হিলাল ছাত্রসংসদ

১৪৪২-৪৩ হিজরি, ২০২১-২২ ঈসায়ী।

আল-হিলাল ছাত্র সংসদ

কর্মপরিষদ ১৪৪৩-৪৪ হিজরী ২০২২-২৩ ঈসায়ী

উপদেশক : মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা শায়খ জিয়া উদ্দিন সাহেব

ক্র.	পদবী	নাম	জামাত
১	সভাপতি	হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেব	শিক্ষক
২	সহ-সভাপতি	হযরত মাওলানা আসআদ উদ্দিন আল মাহমুদ সাহেব	শিক্ষক
৩	সহ-সভাপতি	হযরত মাওলানা বিলাল আহমদ ইমরান সাহেব	শিক্ষক
৪	সহ-সভাপতি	হযরত মাওলানা মুফতি জসিম উদ্দিন সাহেব	শিক্ষক
৫	কোষাধ্যক্ষ	হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব	শিক্ষক
৬	বার্ষিক মুখপত্র আল হিলাল সম্পাদক	হযরত মাওলানা জফির উদ্দিন সাহেব	শিক্ষক
৭	বার্ষিক মুখপত্র আল হিলাল সহ সম্পাদক	হযরত মাওলানা হাফিয ফরহাদ আহমদ সাহেব	শিক্ষক
৮	দেয়ালিকা পরিচালক (আরবী)	হযরত মাওলানা ইকবাল হোসাইন সাহেব	শিক্ষক
৯	দেয়ালিকা পরিচালক (বাংলা)	হযরত মাওলানা হাফিয ফরহাদ আহমদ সাহেব	শিক্ষক
১০	সাধারণ সম্পাদক	সাইফুল ইসলাম	তাকমীল ফিল হাদীস
১১	যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক	কামরুজ্জামান	তাকমীল ফিল হাদীস
১২	সহ- সাধারণ সম্পাদক	দেলওয়ার হুসাইন	তাকমীল ফিল হাদীস
১৩	সহ- সাধারণ সম্পাদক	তামিম আহমদ	ফযীলত ২য় বর্ষ
১৪	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	আব্দুল্লাহ আল রাহাত	তাকমীল ফিল হাদীস
১৫	অফিস সম্পাদক	সুলতান হাকীম	তাকমীল ফিল হাদীস
১৬	সাহিত্য সম্পাদক (আরবী)	সালমান আহমদ	তাকমীল ফিল হাদীস
১৭	সহ-সাহিত্য সম্পাদক (আরবী)	বুরহান উদ্দীন	ফযীলত ২য় বর্ষ
১৮	সাহিত্য সম্পাদক (বাংলা)	আব্দুর রহমান	তাকমীল ফিল হাদীস
১৯	সহ-সাহিত্য সম্পাদক (বাংলা)	আলীম উদ্দীন	ফযীলত ২য় বর্ষ
২০	পাঠাগার সম্পাদক	নাঈম উদ্দীন	ফযীলত ১ ম বর্ষ
২১	সহ- পাঠাগার সম্পাদক	আব্দুল আলীম	ফযীলত ১ ম বর্ষ
২২	সহ- পাঠাগার সম্পাদক	নূরে আলম	সানবী ২য় বর্ষ
২৩	সদস্য	লুৎফুর রহমান	তাকমীল ফিল হাদীস
২৪	সদস্য	আবু তালহা	ফযীলত ২য় বর্ষ
২৫	সদস্য	যায়েদ আহমদ	ফযীলত ১ ম বর্ষ
২৬	সদস্য	মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত	সানবী. ৩য় বর্ষ
২৭	সদস্য	খালিদ সাইফুল্লাহ	সানবী. ২য় বর্ষ
২৮	সদস্য	জুনাইদ আহমদ	সানবী ১ম বর্ষ
২৯	সদস্য	জাবের আহমদ	মুতা. ৪র্থ বর্ষ
৩০	সদস্য	হুমাইদ মাহমুদ চৌধুরী	মুতা. ৩য় বর্ষ
৩১	সদস্য	রাসেল আহমদ	মুতা. ২য় বর্ষ
৩২	সদস্য	শরিফুল ইসলাম	মুতা. ১ম বর্ষ
৩৩	সদস্য	ইমদাদ উল্লাহ	ইব. ৫ম বর্ষ
৩৪	সদস্য	আব্দুল ওয়াদুদ	ইব.৪র্থ বর্ষ
৩৫	সদস্য	আব্দুল মুমিন	হিফজ

ব্যক্তিগঠন, ইসলামী শিক্ষা ও
সমাজব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন!

কার্যনির্বাহী পরিষদ

২০২২-২৩ ঈসায়ি, ১৪৪৩-৪৪ হিজরী

উপদেষ্টা : শায়খ জিয়া উদ্দীন দা. বা.

ক্রমিক	পদ	নাম	জামাত
০১	সভাপতি	হাফিয মাওলানা আব্দুল খালিক ক্বাসিমী	শিক্ষক
০২	সহ-সভপতি	মাওলানা জফির উদ্দিন	শিক্ষক
০৩	সহ-সভপতি	হাফিয মাওলানা ফরহাদ আহমদ	শিক্ষক
০৪	সহ-সভপতি	মাওলানা রুহুল আমিন	শিক্ষক
০৫	সাধারণ সম্পাদক	আরশাদ জাফরী	তাকমীল ফিল হাদীস
০৬	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	হুসাইন আহমদ	ফযীলত ২য়
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	মুবিনুল হক্ব	ফযীলত ১ম
০৮	অর্থ সম্পাদক	মুস্তাফিজুর রহমান মাহবুব	ফযীলত ২য়
০৯	প্রচার সম্পাদক	ইসমাঈল আহমদ	সানবিয়্যাহ উলিয়া ২য়
১০	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মাহবুবুর রহমান	তাকমীল ফিল হাদীস
১১	সাহিত্য সম্পাদক	মাহদী হাসান খান	ফযীলত ১ম
১২	পাঠাগার সম্পাদক	রিয়াজুল ইসলাম	সানবিয়্যাহ উলিয়া ১ম
১৩	অফিস সম্পাদক	শিহাব উদ্দীন	সানবিয়্যাহ আম্মাহ ২য়
১৪	সদস্য	সিদ্দিক উদ্দীন	তাকমীল ফিল হাদীস
১৫	সদস্য	আযহাদ আহমদ	ফযীলত ২য়
১৬	সদস্য	আফফান মীম আব্দুর রহমান	ফযীলত ১ম
১৭	সদস্য	সানজিদ হাসান	সানবিয়্যাহ উলিয়া ২য়
১৮	সদস্য	মুহসিন আহমদ	সানবিয়্যাহ উলিয়া ১ম
১৯	সদস্য	হাসান আহমদ	সানবিয়্যাহ আম্মাহ ২য়
২০	সদস্য	রশীদ আস সানী	সানবিয়্যাহ আম্মাহ ১ম
২১	সদস্য	জাফরুল ইসলাম	মুতাওয়াসসিতাহ ৩য়
২২	সদস্য	সাহেল আহমদ	মুতাওয়াসসিতাহ ২য়
২৩	সদস্য	আব্দুস সামাদ	মুতাওয়াসসিতাহ ১ম
২৪	সদস্য	জাহিদুল ইসলাম	ইবতেদায়ি ৫ম
২৫	সদস্য	আবু তাহের সিদ্দিক	হিফজ

শায়খুল হিন্দ কাফেলা (৩৯ তম ব্যাচ)

১৪৪৪ হিজরি মোতাবেক ২০২৩ ঈসায়ী তাকমীল ফিল হাদীস [মাস্টার্স] সমাপনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ [ভর্তিক্রমানুসারে]

সাইফুল ইসলাম
পিতা: হাফিজ মোঃ ফখর উদ্দিন
গোবিন্দশ্রী, গোবিন্দশ্রী
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৮৫৭২৫০৬৩৯
রক্তের গ্রুপ: AB+

সিদ্দিকুর রহমান নাহিদ
পিতা: মৃত ছার উদ্দিন
আঙ্গুরা মোহা. পুর, ফাড়িরবাজার
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৩০৩৬৭৮২৭৫
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ সুলতান আহমদ
পিতা: আব্দুল হান্নান
আঙ্গুরা মোহা. পুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৩৪৪৬২৫৩৩
রক্তের গ্রুপ: B+

আরশাদ আহমদ
পিতা: মরহুম খলিলুর রহমান
শালেশ্বর, শালেশ্বর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৫১৪৪৯৭০৮
রক্তের গ্রুপ: O+

আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা: হা. মাও. মুহাম্মাদ আলী রহ.
আগতালুক, সীমা বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৩৭১৩৩২১৩
রক্তের গ্রুপ: B+

মো: শাহেদ আহমদ
পিতা: ডা: ইব্রাহীম আলী
ঘোষগ্রাম (দাঁতারী), ডৌবাড়ী
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৭৮১৯৯৫৪৬২
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ আরিফ উদ্দিন
পিতা: মো: সুরমান আলী
শিলঘাট কান্দিবাড়ী, ঢাকাদক্ষিণ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৪৪১৭১১২১
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ সুলতান আহমদ
পিতা: মরহুম হাজি উসমান আলী
কান্দিগ্রাম, গাছবাড়ি বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৯১৯০৩১৪২
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ মাহবুবুর রহমান
পিতা: আব্দুল হক
খাদিমান, গঙ্গাজল
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭৮৯-৬৮৬৮১১
রক্তের গ্রুপ: O+

নূর উদ্দিন
পিতা: মাস্টার আবুল কালাম
কুকড়াপশী, সাচনা বাজার
জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
০১৭৯৭২৮৬১০৯
রক্তের গ্রুপ: B+

কালীমুল্লাহ মাহফুজ
পিতা: আবু বকর
বাণীগ্রাম, গাছবাড়ী বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৩৬৩৬৭৯৯০
রক্তের গ্রুপ: O-

হাফিজ শাহিন আহমদ
পিতা: হাফিজ আব্দুল জব্বার
বাঘা, দৌলতপুর
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৭১০৫৭৯৬৯
রক্তের গ্রুপ: O+

শিহাব উদ্দিন
পিতা: আফতাব উদ্দিন
সাচনা, সাচনা বাজার
জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
০১৮২৯৬৩৫২৩৮
রক্তের গ্রুপ:B+

আছার উদ্দিন
পিতা: সিরাজুল ইসলাম
বড়বন্দ (বারহাল), সুরইঘাট
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৪০৪৩৮২০৯
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ সাদিকুর রহমান
পিতা: মাও. আব্দুস সালাম
কাশির চক, বারঠাকুরী
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭০৬১২৮৮৯০
রক্তের গ্রুপ: A+

আব্দুল্লাহ আল আফজাল
পিতা: আব্দুল জব্বার
কোনাগ্রাম, বারহাল
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭৫৯৪৭৩৭৭৪
রক্তের গ্রুপ: AB+

সাইফুর রহমান
পিতা: আব্দুল মালিক
আগ্রীপাড়া, লখাইর গ্রাম
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৬২৮৯৮৪২৪
রক্তের গ্রুপ: O+

আতিকুর রহমান সজীব
পিতা: তিজার উদ্দিন
ঘাগটিয়া, নোয়াপাড়া, বাদাঘাট
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭৩৫০৯৬৩৮২
রক্তের গ্রুপ:

রেজওয়ান আহমদ (রুমন)
পিতা: মাওলানা ছালেহ আহমদ
শিলঘাট (টিকরপাড়া), ঢাকাদক্ষিণ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৩০৫৬৭৩২৩০
রক্তের গ্রুপ: O+

কামারুজ্জামান কামরুল
পিতা: মুহাম্মদ জমশেদ মিয়া
মাহারাম টিলা, বাদাঘাট বাজার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭৯৯৪৬২৪৪৬
রক্তের গ্রুপ: AB+

লোকমান হামিদী
পিতা: হাফিজ আব্দুল হামিদ
নয়াখেল, সুরইঘাট
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৬৬৭৯০৩৪৯
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ শাব্বির আহমদ
পিতা: ছিদ্দেক আলী
গৌড়করণ, ইসলামগঞ্জ বাজার
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
০১৭৭২০০১৮৪৬
রক্তের গ্রুপ: B+

ক্বারী মইনুল ইসলাম
পিতা: মো.ইসহাক মিয়া
খালদার, পাঁচগাঁও
রাজনগর, মৌলভীবাজার
০১৩২৫১০৬৮২৮
রক্তের গ্রুপ: AB+

আদনান আহমদ
পিতা: নাজিম উদ্দিন
পাখিয়ালা, বড়লেখা পৌরসভা
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৩২১৩১৯৫৮৬
রক্তের গ্রুপ: O-

খাইরুর রশীদ
পিতা: মাও. সালেহ আহমদ সালিক
হাতিডহর, ব্রাহ্মণগ্রাম
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭৮২৫০৫৭৩৪
রক্তের গ্রুপ:AB+

হাফিজ আব্দুর রাহমান
পিতা: শামছ উদ্দীন
চরিপাড়া (মাঝর্ডি), রহিমিয়া মাদরাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭০৭-৬৩২০৮১
রক্তের গ্রুপ: AB+

হাফিজ দেলওয়ার হুসাইন
পিতা: আব্দুন নূর
(মুলাগুল) সাউদ গ্রাম, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৫৮৬৯০৮৪০
রক্তের গ্রুপ:O+

লুৎফুর রাহমান
পিতা: মোঃ আব্দুল মালিক
ভালুকমারা, (মুলাগুল) রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৬৮৬৪২৫০৭
রক্তের গ্রুপ:B+

মো: জায়েদ আহমদ
পিতা: মরহুম রিয়াছদ আলী
বাউসী (দিঘলটিকি), ফুলবাড়ী
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৩১৮৩৫০০৮
রক্তের গ্রুপ: O+

সালমান আহমদ
পিতা: মাও. জয়নুল আবেদীন
হেমু হাখরগ্রাম, হরিপুর
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৭৯৩৩৭৬১৩১
রক্তের গ্রুপ:

আশিকুর রহমান
পিতা: মাও. মুশাহিদ আলী
দুর্লভপুর নয়াগ্রাম, কানাইঘাট
কানাইঘাট, সিলেট
০১৬৪১৭৮৩০৪৭
রক্তের গ্রুপ: A+

ইকবাল আহমদ
পিতা: মরহুম সফর আলী
বীরদল ছোটফৌদ, বীরদল বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৮৭১৪৩৭১২
রক্তের গ্রুপ: AB+

লোকমান আহমদ
পিতা: আব্দুল মজিদ
কাশির চক, বারঠাকুরী
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৬৩৩২৪৯২৫৯
রক্তের গ্রুপ: O+

মুফিজুর রাহমান
পিতা: মরহুম বশির আহমদ
পূর্ব-কালাইরাগ, দয়ার বাজার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
০১৯১৭৫৯৯৯২৫
রক্তের গ্রুপ: A+

হাফিয আবদুর রহমান
পিতা: হাফিয সিদ্দিকুর রহমান
পূর্ব সমনিয়াপাড়া, সূর্যপুর বাজার
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
০১৭৪৮৭৭৪৪২৪
রক্তের গ্রুপ: B+

তাওহীদুল ইসলাম
পিতা: তাজুল ইসলাম
খাগটিয়া, নোয়াপাড়া, বাদাঘাট
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭৭৮৮১০৯২৫
রক্তের গ্রুপ: B+

সুহেল আহমদ
পিতা: শফিকুল হক
মুটওঞ্জা, দরবস্ত
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৬১৬৪৩৮৫৯৯
রক্তের গ্রুপ: A+

ক্বারী শফিকুর রহমান
পিতা: মরহুম বশীর উদ্দীন
উত্তর ডিমাই, নয়া বাজার
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৬১৯৮৩৪৮৪৪
রক্তের গ্রুপ: O+

কারীমুল ইসলাম
পিতা: নুর ইসলাম
নবাবপুর, শ্রীপুর (উত্তর)
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৩২৩৫৯৩৭১১
রক্তের গ্রুপ: O+

মোবাশ্বির আহমদ
পিতা: মনফর আলী
উজিরপুর, খাগাউড়া
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৪০৪৬৯১৭৪
রক্তের গ্রুপ: A+

হাফিজ সিদ্দিক আহমদ
পিতা: মাও. আব্দুল মালিক
মজলী, গঙ্গাজল
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭৩২৬০৫০৩৯
রক্তের গ্রুপ: O-

মুহাম্মাদ মিসবাহ উদ্দিন
পিতা: হারিছ আলী
কান্দলা, (মুলাগুল), রহিমিয়া মাদরাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৫৭৩৫২৩৬৫
রক্তের গ্রুপ: O+

ক্বারী অলিউল হাসান (অলি)
পিতা: মো: আদর উল্লাহ
টুক দিরাই, দিরাই চাঁদপুর
দিরাই, সুনামগঞ্জ
০১৭৩৫৫১৭৬০৪
রক্তের গ্রুপ: AB+

হা. মোহাম্মদ শুয়াইব আহমদ
পিতা: মরহুম মখলিছ আলী
কোনাচর, শ্রীবহর
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭০৭১৭৮৭৯৯
রক্তের গ্রুপ: A+

হামিদুর রহমান
পিতা: মখলিছুর রহমান
সাদকপুর, সিকন্দরপুর
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৮৭৭২৬৮৬৪৭
রক্তের গ্রুপ: A+

মিনহাজুল ইসলাম
পিতা: মাও: খলিলুর রহমান
সহিদাবাদ, শরিফগঞ্জ
জকিগঞ্জ,সিলেট
০১৭১৬৩৯৪৫৪১
রক্তের গ্রুপ: B+

আব্দুল হালীম তাওহীদ
পিতা: আব্দুল হান্নান
জলসী, কপলা বাজার
দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ
০১৭৯৪৪৫৩৮৮০
রক্তের গ্রুপ: O+

ফুজায়েল হক খুবাইব
পিতা: মরহুম শফিকুর রহমান
মইনা, রাজাগঞ্জ
কানাইঘাট, সিলেট
০১৬৪১২০৩৪৩৮
রক্তের গ্রুপ: B-

হাফিজ আহমদ রায়হান মামুন
পিতা: আলহাজ মাওলানা আলাউদ্দীন
ভেলোপাড়া, হরিপুর
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৭৪৪১৭৪০৫৫
রক্তের গ্রুপ: AB+

মোহাম্মদ ফারহান চৌধুরী
পিতা: আব্দুর রহমান চৌধুরী
তালবাড়ী পূর্ব, কল্যাণী নয়াবাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭১৮৪৬৭৩০১
রক্তের গ্রুপ: B-

আব্দুল মতিন
পিতা: মো: নুরুল হক
দুধের আউটা, (উত্তর) শ্রীপুর
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭০১৪৪৫০৪৭
রক্তের গ্রুপ: B+

শাহীন আহমদ
পিতা: ফখরুল ইসলাম
কাকরদিয়া, তেরাদল বাজার
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৯৯৫৯৭৮৮৭
রক্তের গ্রুপ: O+

মুহাম্মাদ শাহিদুর রাহমান
পিতা: মাহমুদ হুসাইন
বাউরভাগ ২য় খণ্ড, সুরইঘাট বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭৯৫৯৫৯৮২
রক্তের গ্রুপ: A+

হাফিজ জাহেদ আহমদ
পিতা: আব্দুল মালিক
বীরদল আগকুপা, মুকিগঞ্জ বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭২৩৯২২৯২৫
রক্তের গ্রুপ: A+

ক্বারী আব্দুল ওয়াদুদ আনছার
পিতা: মো:আব্দুল হাই জিতু মিয়া
চরবাড়া (মাঝের গাঁও), লক্ষী বাউর
ছাতক, সুনামগঞ্জ
০১৭৭৫৭০৭৬৪৭
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিয সুলতান হাকিম
পিতা: আছাব আলী
ঘাটেরচটি (যাত্রাপুর) চিকনাগুল
জৈন্তাপুর,সিলেট
০১৭৯২৯০৪৪৮৭
রক্তের গ্রুপ: A+

আব্দুল্লাহ মাসউদ
পিতা: মাওলানা শামসুল ইসলাম
গয়লাপুর, সাদিমাপুর
বিয়ানিবাজার, সিলেট
০১৭৩০৪৭৯৪৭২
রক্তের গ্রুপ:

ক্বারী মো: আবু হানিফ
পিতা: মো: অহেদ আলী
পুরান খালাস, কাউকান্দি বাজার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭১২১৪৭৫৬৫
রক্তের গ্রুপ: B+

মুহাম্মাদ আবু রায়হান
পিতা: মুহাম্মাদ আবুল কাশেম
বেলক্কা, তাড়াইল
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ
০১৬০১৮৬০৯৩১
রক্তের গ্রুপ: A+

বাহরুল ইসলাম
পিতা: হাফিজ ফখরুল ইসলাম
বিজয় পাড়ওয়া, চড়ার বাজার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
০১৭৭৯৫০৬২৪৪
রক্তের গ্রুপ:

হাফিজ জাকারিয়া আহমদ
পিতা: মো: জমির হুসেন
দাবাধরণীর মাটি, জুলাই
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৮৭৩৬১০০৪
রক্তের গ্রুপ: B+

ক্বারী তামিমুর রহমান সোহাগ
পিতা: মরহুম গিয়াস উদ্দিন
উজান রামনগর, জয়নগর বাজার
সদর, সুনামগঞ্জ
০১৭৫২৩৬৩৯৭৮
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ হুসাইন আহমেদ
পিতা: হেলাল উদ্দিন
লেংগুড়া, গোয়াইনঘাট
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৪০২৭৭৫৩৮৪
রক্তের গ্রুপ:

ইমরান হাসিব
পিতা: আব্দুল হাসিব
হিজলরটুক, বাহাদুরপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৬০৯২৯০৩৫
রক্তের গ্রুপ:

ক্বারী মারুফ আহমদ হানাফী
পিতা: মহাজন খলিলুর রাহমান
উমাগড়, উমরগঞ্জ বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৯৮৪০৯৩৮৩
রক্তের গ্রুপ:

আখতার হুসাইন জাকির
পিতা: ইরশাদ হুসাইন
লামনী, হাদারপার বাজার
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৮২১০৭৭৭৯১
রক্তের গ্রুপ: A+

আব্দুল্লাহ আল রাহাত
পিতা: মুজিবুর রহমান
সুপাতলা, বিয়ানীবাজার
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৮৮৩১০০৮৪১
রক্তের গ্রুপ: O+

কামরুল হাসান
পিতা: মাও. বশির আহমদ
আলীনগর, আলীনগর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৮৯৩৩৪৯৪৯২
রক্তের গ্রুপ: B+

ক্বারী নাজমুল হাসান
পিতা: অলী আহমদ
আলীনগর, আলীনগর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৬০১৮২০৭৪৬
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ জামিল আহমদ
পিতা: মাওলানা খলিলুর রাহমান
লামা দলইকান্দি, গাছবাড়ী বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৪৭-৫১১৯৩৩
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ রেজওয়ান আহমদ
পিতা: মো: ফারুক আহমদ
মুলাগুল সাউদ গ্রাম, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৪১০৪০৬২৪
রক্তের গ্রুপ: O+

মো: মিনহাজ উদ্দীন
পিতা: মো: আব্দুল্লাহ
তুরালি কান্দি, ডৌবাড়ী
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৭৭৯৬৯৪৩০৪
রক্তের গ্রুপ: B+

ক্বারী মোঃ রুম্মান আহমদ
পিতা: মো: জমির উদ্দিন
দক্ষিণ বাঘা, মাঝের মহল্লা
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৫৩৯১৪৩৭৮
রক্তের গ্রুপ: A+

ক্বারী মোঃ ইমরান আহমদ
পিতা: মো. নঈম উল্লাহ
বাগেরখাল, হরিপুর বাজার
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৭৩৮৮৯৭২২৫
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ সাইদুর রহমান
পিতা: রফিক উদ্দিন
ভালুকমারা, মুলাগুল, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৫৮০৪১২৮৯৩
রক্তের গ্রুপ: O+

ক্বারী সাজিদুর রাহমান
পিতা: মরহুম আলাল উদ্দিন
নোয়াখালী, নোয়াখালী বাজার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
০১৩০৯-১৬৯৭৮৫
রক্তের গ্রুপ: O+

মুহাঃ আসআদ আহমদ মাশুক
পিতা: জাহের মিয়া
মোদেরগাঁও, বাদাঘাট বাজার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৩০০৫৯২০০২
রক্তের গ্রুপ: B+

মো: নুর উদ্দীন আহমদ
পিতা: মো: সেলিম
নুরুল্লাহ নতুন হাটি, জানীগাঁও
সদর, সুনামগঞ্জ
০১৭৩১৩৮৯০৪১
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিজ মুহাম্মদ হুসাইন
পিতা: মরহুম আফতাব উদ্দীন
পারকুল, রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন
কানাইঘাট, সিলেট
০১৮৪৩৪১৫৫৬৩
রক্তের গ্রুপ: A+

ক্বারী মো: ফেদাউর রহমান
পিতা: মো. মঈন উদ্দিন
নুরুল্লা নতুনপাড়া, জানিগাঁও
সদর, সুনামগঞ্জ
০১৭৯৭৬৫৯৭১৪
রক্তের গ্রুপ: O+

মুহাম্মাদ বিলাল আহমদ
পিতা: হাজী আব্দুস সালাম
ফতেহগঞ্জ, রাজাগঞ্জ
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭০৭৬৩০৩৩
রক্তের গ্রুপ: A+

ক্বারী জাকওয়ান ইকবাল
পিতা: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
উত্তর বাগেরখাল, হরিপুর বাজার
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৭০৫৩৬৩৮১৭
রক্তের গ্রুপ: B+

ছোলাইমান আহমদ
পিতা: ইমদাদুর রহমান
চন্দগ্রাম, রামধা বাজার
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭০৪৪৩৯৬৯১
রক্তের গ্রুপ: B+

হাফিজ সুফিয়ান আহমদ
পিতা: হা. মাও. জালাল উদ্দিন রহ.
বায়মপুর (লক্ষিপুর), কানাইঘাট
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৮৬৭৯০৬৩১
রক্তের গ্রুপ: O+

জাহিদুল ইসলাম মাশহুদ
পিতা: মোহা: আলী আহমদ
সোনাপুর, বীরদল বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭৮৪৯৮১৯১
রক্তের গ্রুপ: O+

ক্বারী হাফিজ আব্দুল্লাহ-মাহফুজ
পিতা: মাও. আব্দুস সুবহান রাহি.
পুকাশ, গোয়াইনঘাট
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৭৭১৮৫৭১৯৪
রক্তের গ্রুপ: O+

হাফিয আব্দুল মাজিদ
পিতা: আব্দুল মান্নান
বাঘা এখলাছপুর,পরগনা বাজার
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৫৪১৮৬০৬৫
রক্তের গ্রুপ: B+

ক্বারী ফয়েজ আহমদ
পিতা: মো: ইসহাক আলী
দক্ষিণ বুড়দেও, থানা বাজার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
০১৩১২৬৯৫৮০১
রক্তের গ্রুপ:

হাফিয আবুল হাসান
পিতা: ফয়জুর রাহমান
বীরদল হাওর পশ্চিম, বীরদল
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৬০৭৮৯৩৬৯
রক্তের গ্রুপ:

মো: কামরুল হোসাইন
পিতা: মো: মাসুক আলী
উত্তর জাঙ্গাইল, রনিখাই কামালবস্তি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
০১৭০৯২৮৭৫৯৪
রক্তের গ্রুপ:

হাফিজ তাহের আহমদ মাসুম
পিতা: মারুফ উদ্দীন
টেকাহালী, পুরাতন বাজার
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭৯৪৯৫৫৬৯৫
রক্তের গ্রুপ: O+

জাফর ইসলাম
পিতা: আদিছ উল্লাহ
ভাওরাটুল, বাহাদুরপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭০৬৯৮১৭১৯
রক্তের গ্রুপ: B+

মোঃ আব্দুর রহমান জুয়েল
পিতা: মরহুম মো: বশির আহমদ
বনপুর, রণিখাই কামালবস্তি
কোম্পানী গঞ্জ, সিলেট
০১৭৬৫২৯২৫৬১
রক্তের গ্রুপ: O+

মো. গিয়াস উদ্দীন আল মামুন
পিতা: মরহুম মো.বদরুল হক
বড়দেশ সরদারি পাড়া, বড়দেশ বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭৯৯৭৮৯৬৪
রক্তের গ্রুপ: O+

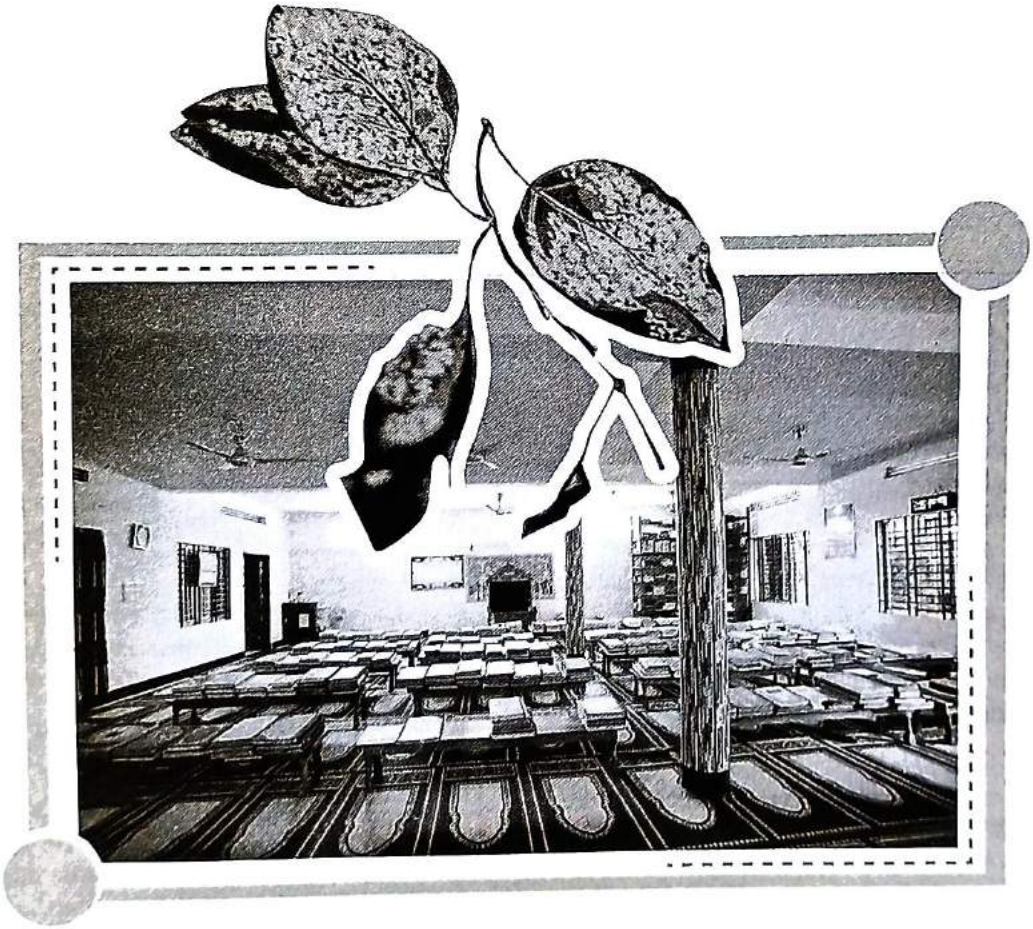

তাহফীযুল কুরআন সমানপনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

মো.সায়েম আহমদ
পিতা: মো: সোহেল আহমদ(নানু)
আঙ্গুরা মোহা: পুর, আঙ্গুরা মোহা: পুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭২৭১১৬৭১৬
রক্তের গ্রুপ:

আহবাব আহমদ
পিতা: নাজিম উদ্দিন
পাখিয়ালা, বড়লেখা পৌরসভা
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫৭৪৬১৯৭
রক্তের গ্রুপ:O+

ফয়জুল্লাহ মোহাম্মদ লুকমান
পিতা: মাও.আব্দুর রাজ্জাক
ভাটপাড়া, সাপমারী
শেরপুর , শেরপুর
০১৩২৪৯৯৪১৪২
রক্তের গ্রুপ:B+

আব্দুল মুমিন
পিতা: নুরুল হক
ভালুকমারা রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭০৯০২৮৪৫৫
রক্তের গ্রুপ: B+

জুবায়ের আহমদ মাজেদ
পিতা: মহাজন খলিলুর রাহমান
উমাগড়, উমরগঞ্জ বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭২৪৪৬৮৭৬৮
রক্তের গ্রুপ: A+

সুহায়েল আহমদ
পিতা: শাহাব উদ্দীন
ছত্রপুর, গাছবাড়ী বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৩২০৩১৬৯৫৪
রক্তের গ্রুপ: O+

মো: শাহাব উদ্দিন
পিতা: মজনু মিয়া
জীবনপুর, দয়ার বাজার
কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট
০১৩১৭৪৩১৬৯৮
রক্তের গ্রুপ: B+

নুরুল আমিন
পিতা: বিলাল আহমদ
সাউদ গ্রাম, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট , সিলেট
০১৭৪১২১৫২১৪
রক্তের গ্রুপ: O+

তরিকুল ইসলাম (সালমান)
পিতা: হা: মাও. নেছার আহমদ
বড়দল পুরানহাটি (মাস্টার বাড়ী)
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০১৭১৬১০৪৫৯৭
রক্তের গ্রুপ: A+

মো: জহিরুল ইসলাম মাহিন
পিতা: বিলাল আহমদ
দেউলগ্রাম, চারখাই
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৩৮৮৮৭৩৪০
রক্তের গ্রুপ:

আবু তাহির সিদ্দিক
পিতা: মাশুক আহমদ
গণিকান্দি, সীমাবাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৩১৬৪০৪৯৫৯
রক্তের গ্রুপ: O+

মো: সালেহ আহমদ
পিতা: মরহুম মলিক মিয়
লামাপাড়া, রাজাগঞ্জ
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭২৩০৮৬৭২৯
রক্তের গ্রুপ:

মোহাম্মদ আলী
পিতা: লুৎফুর রহমান
লামাপাড়া, রাজাগঞ্জ
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭০৬৪৯৬৭০৭
রক্তের গ্রুপ:

মাহফুজুর রাহমান
পিতা: মাওলানা মকবুল হোসাইন
কান্দিগ্রাম, গাছবাড়ী বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭১৫২৫০৭৬০
রক্তের গ্রুপ: B+

তোফায়েল আহমদ
পিতা: বশির আহমদ (দুদু মিয়া)
সাউদ গ্রাম, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৩৭৬১০৮৯৮
রক্তের গ্রুপ: O+

আব্দুল আজিজ তালুকদার
পিতা: মো.তাজ উদ্দিন
ঘোগারকুল পশ্চিমপাড়া, রণকেলী উত্তর
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭১৫৫৪৩৯৫১
রক্তের গ্রুপ:

মাহমুদুল হাসান
পিতা: আব্দুল হামিদ
মেহেরপুর, মেহেরপুর
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৭৪৫৮৮৩১৬৬
রক্তের গ্রুপ: A+

মো: তানবীর হুসেন
পিতা: মুজিবুর রহমান
কদুপুর, খাটকাই
গোলাপগঞ্জ,সিলেট
০১৭৬৬০৬৯৫৫১
রক্তের গ্রুপ:

রাইহান আবেদীন মাবরুর
পিতা: মাও. জাইনুল আবেদীন
উপর শ্যামপুর, হরিপুর বাজার
জৈন্তাপুর, সিলেট
০১৩২৩৭৯০১২২
রক্তের গ্রুপ: B+

মো: ইকবাল আহমদ
পিতা: মরহুম আতাউর রহমান
খালপার, তালবাড়ী
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭৪২১৬০৭১
রক্তের গ্রুপ: O+

লায়েছ আহমদ
পিতা: মনজুর আহমদ
খালপার, তালবাড়ি
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৮২৭৪০৪৭৫
রক্তের গ্রুপ: B+

আকরাম হুসাইন
পিতা: মৃত আব্দুল হাই
তেলিগুল, বড়লেখা
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭৩৫৪৪০৬৮৬
রক্তের গ্রুপ:

মো: মিছবাহুজ্জামান তুহিন
পিতা: আমির উদ্দিন
ইসলামপুর, শাহবাজপুর
বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭৭৩৮৬৯০০৫
রক্তের গ্রুপ:

রশিদ আহমদ
পিতা: মাও: ইউনুছ আহমদ
খাদিমান, গঙ্গারজল
জকিগঞ্জ, সিলেট
০১৭২৬৯৮৩৩৬০
রক্তের গ্রুপ:

মো. মাহদী হাসান
পিতা: শফিকুল ইসলাম
সাউদগ্রাম, রহিমিয়া মাদ্রাসা
কানাইঘাট, সিলেট
০১৮৩৫৯৭৬৯০৫

হামিদুর রহমান
পিতা: মরহুম আজির উদ্দিন
রনকেলী ইয়াগুল
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
০১৪০২২৭৯৮১৫
রক্তের গ্রুপ: O+

মো. রাকিব আলী
পিতা: মো: আব্দুল গফুর
(জুমগাঁও) বাঁশতলা বাংলা বাজার
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ
০১৭৮৮০৫৭৫৭০
রক্তের গ্রুপ:

মো: রুহুল আমীন রাছেল
পিতা: মখলিছুর রহমান
নিজ বাউরভাগ পূর্ব, মানিকগঞ্জ বাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৯২১২৫৯১৪৬
রক্তের গ্রুপ: O+

মো. জাহেদ আহমদ
পিতা: আতাউর রহমান
লামাদুমকা, ডৌবাড়ি
গোয়াইনঘাট, সিলেট
০১৬০১৪৪৩৮৯৯
রক্তের গ্রুপ:

মো: আবু রায়হান
পিতা: মো. নিজাম উদ্দিন
গনিকান্দী, সীমাবাজার
কানাইঘাট, সিলেট
০১৭৭৮২১৯৪১৮
রক্তের গ্রুপ: AB+

মারুফ বিল্লাহ
পিতা: মরহুম ইউনুছ আলী
মশাদিয়া, কালাউক
লাখাই, হবিগঞ্জ
০১৭৭৭৪৩৪০০০
রক্তের গ্রুপ:

মো: উসমান হাসান
পিতা: ফাহাম আহমদ
কসবা, শ্রীধরা,
বিয়ানীবাজার, সিলেট
০১৭৪৮০০০১৯৬
রক্তের গ্রুপ:

স্বাগতম
WELCOME

বিশেষ আবেদন

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর আজ দীর্ঘ প্রায় বাষট্টি বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে দ্বীনি ইলমের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসীর সহযোগিতা এবং শিক্ষকবৃন্দের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমতের কারণে অল্প দিনেই সর্বত্র জামিয়ার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

যার ফলে ছাত্রসংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জামিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিশাল পরিবার। শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দের বেতন-ভাতা ও আবাসিক হোস্টেলের সার্বিক খরচ বাবত বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় দুই কোটি টাকারও বেশি। জামিয়ার স্থাবর সম্পত্তি বা স্থায়ী আয়ের কোনো উৎস নেই। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং এদেশের সর্বস্তরের দ্বীনদরদী মুসলমানের মুক্তহস্তে দানের মাধ্যমে এ যাবত পরিচালিত হয়ে আসছে জামিয়া। বেতন-ভাতা ও হোস্টেল-খরচ ছাড়াও জামিয়ার রয়েছে আবাসিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নতুন মসজিদের উন্নয়ন ও সংস্কার-চাহিদা।

অতএব ওয়াজিব, নফল সদক্বা-খায়রাত ও সাধারণ দান-অনুদানের মাধ্যমে জামিয়ার আর্থিক সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য সর্বস্তরের দ্বীনদরদী মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি সশ্রদ্ধ আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত
জিয়া উদ্দীন
মুহতামিম
০১৮১৯-৬৫৩৭১৯